সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ

সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম প্রকাশ—চৈত্র ১৩৬৪

প্রকাশক : শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ব্লক ও মুদ্রাকর : শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদশিল্পী :
রোহিণী মুখোপাধ্যায়

বাঁধাই :
ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

ছয় টাকা

আমার লোকান্তরিতা কন্যা

আমার জয়ন্তী-মা'র উদ্দেশে

ছু'ফোঁটা চোখের জলের সঙ্গে

এই গ্রন্থ

সারস্বত মন্দিরে নিবেদিত হল

গ্রন্থকারের নিবেদন

১

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'হিরণকুমার বসু স্মৃতি-বক্তৃতা' প্রদানের জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে আমি ১৯৫৭ সনের ৪ঠা, ৫ই ও ৭ই মার্চ 'বাংলা সাহিত্যে সনেট' শীর্ষক তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। সেই বক্তৃতামালাকে বর্তমান গ্রন্থের প্রাথমিক খসড়া বলা যেতে পারে। আমার লিখিত ভাষণ তিনটি ঈষৎ-সংশোধিত আকারে 'সনেটের আলোকে মধুসূদন ও রবীন্দ্রমানসের পুনর্বিচার'-শিরোনামায় 'শনিবারের চিঠি'তে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে প্রদত্ত বক্তৃতা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। বিদগ্ধজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নিজের বক্তব্যকে বিশদীভূত করবারও চেষ্টা করেছি। তার ফলে গ্রন্থের কলেবর দুই-পঞ্চমাংশ বর্ধিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নবম ও দশম পর্বদুটি এবং তৃতীয় অধ্যায়ের নবম পর্বটি নূতন যোজনা। অন্যান্য ক্ষেত্রেও বক্তব্য পুনর্বিন্যস্ত এবং নূতন তথ্য ও যুক্তিপ্রমাণাদি সংযোজিত হয়েছে। এসব কারণে প্রাথমিক খসড়ার সঙ্গে বর্তমান রূপের আয়তন ও গুণগত যে পার্থক্য দেখা দিয়েছে তাতে গ্রন্থখানিকে নবলিখিত বলাই সমীচীন মনে করি।

বাংলা সাহিত্যে সনেট-কলাকৃতির সর্বাঙ্গীণ আলোচনা এই প্রথম করা হল বলে দাবি করা অন্যায় হবে না। এর পূর্বে সনেট সম্পর্কে আলোচনা যে না হয়েছে এমন নয়; তন্মধ্যে প্রিয়নাথ সেনের 'সনেট পঞ্চাশৎ' প্রবন্ধের মুখবন্ধ এবং 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে মোহিতলালের 'সনেট' প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রিয়নাথ সেনের প্রবন্ধটি ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। ওয়াটস্-ডানটন-বিরচিত সনেটের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা তরঙ্গ-তত্ত্বের আলোকেই তিনি ইতালীয় সনেটের রহস্য-সন্ধান করেছেন; আর মোহিতলাল একান্তভাবেই অনুসরণ করেছেন উইলিয়াম শার্পের। সনেট-বিচারে এই তরঙ্গ-তত্ত্ব ইংরেজি সমালোচকগণের মধ্যে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে আমি বর্তমান গ্রন্থে তার আলোচনা করেছি। স্বভাবতই প্রিয়নাথ-মোহিতলালের

বিচারও এই বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট মধুসূদনের 'কবি-মাতৃভাষা' রচিত হয় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ আর দু' বৎসরের মধ্যেই বাংলায় সনেট-রচনার শতাব্দীকাল উত্তীর্ণ হবে ; কিন্তু সনেট-কলাকৃতির ছান্দসিক বিচার-বিশ্লেষণ অধিকদূর অগ্রসর হয়নি।

ইংরেজি সাহিত্যে সনেট-সমালোচনা-গ্রন্থের অভাব নেই। 'এনসাইক্ল-পিডিয়া ব্রিটানিকা'র 'সনেট'-প্রবন্ধের শেষে যে গ্রন্থপঞ্জি দেওয়া আছে তার পরেও কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯৩৬ সনে মুদ্রিত Enid Hamer-সম্পাদিত The English Sonnet নামক সংকলন-গ্রন্থ এবং ১৯৫৬ সনে মুদ্রিত J. W. Lever-রচিত Elizabethan Love Sonnet নামক সমালোচনা-গ্রন্থখানি বিশেষ মূল্যবান। আমি এই দুখানি গ্রন্থের পূর্ণসুযোগ গ্রহণ করেছি।

কলাকৃতি হিসাবে ইতালীয় সনেট পেত্রার্কার হাতেই চরমোৎকর্ষ পেয়েছিল। পেত্রার্কার আবির্ভাবের পরে সার্ধ-ষট্‌শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে সনেট সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ বিভিন্ন দেশে হয়েছে ; কিন্তু 'সনেট-দর্শন' অর্থাৎ সনেট-কলাকৃতির তাত্ত্বিক বিচার—Philosophy of the Sonnet Form—সম্পর্কে কোনো আলোচনা কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। পেত্রার্কার কবিমানসের বিশ্লেষণ করে আমি তাঁর সৃষ্ট কলাকৃতিকে একটি দার্শনিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি ; এবং যে-সৃষ্টিরহস্য এই বিশিষ্ট কলাকৃতির রূপায়ণে ক্রিয়াশীল হয়েছে আমি তার নামকরণ করেছি 'আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব'। আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধে তাকে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত করে তোলাই সনেট-কলাকৃতির স্বরূপ-লক্ষণ। বলাই বাহুল্য, শিল্পমাত্রেরই সামান্য-লক্ষণে এই আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা', অর্থাৎ সর্বজনীন ভাবকে ব্যক্তি-বিশেষের উপলব্ধিসীমায় আকর্ষণ করে তাকে পুনরায় সাধারণীকৃত করে তোলাই শিল্পসৃষ্টির ধর্ম। আমি এই অর্থে আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব ব্যবহার করি নি। নবজন্মোত্তর পৃথিবীতে মানুষের মানসবিশ্লেষণে প্রাণচেতনার বহু বিপরীতকোটিক ধর্ম আবিষ্কৃত হয়েছে। ভাবের এই প্রতীপধর্মিতার

দ্বন্দ্বকে সনেট-কলাকৃতির বাহ্য ও আভ্যন্তর সঙ্গতির মধ্যে বিলসিত করে তোলাকেই আমি আসক্তি-মুক্তি-লীলা বলেছি। উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য স্পষ্টতর হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের তিনটি কবিতাকে গ্রহণ করা যাক্। 'ক্ষণিকা'র 'অনবসর', 'বলাকা'র 'শা-জাহান', এবং 'কড়ি ও কোমলে'র 'পূর্ণমিলন'। 'অনবসরে' কবির ভাবাবেগ নির্দ্বন্দ্ব; একজনকে হারানোর বেদনা বহুজনকে পাওয়ার আনন্দের কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে। শা-জাহানে হৃদয়াবেগের দ্বন্দ্বটি স্পষ্টোচ্চারিত। কবিতার প্রথমার্ধের মূল সুরটি হল, 'ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া।' কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের সূত্রপাত হয়েছে এর বিপরীত প্রতিপাদ্যকে ঘোষণা করে—'মিথ্যা কথা, কে বলে যে ভোল নাই' বলে। শা-জাহানে তাই ভাবের প্রতীপধর্মিতা বর্তমান, কিন্তু কলাকৃতিতে তার আনুরূপ্য নেই। 'পূর্ণ মিলনে' ভাবের প্রতীপধর্মিতা সনেটের বিশিষ্ট কলাকৃতিতে শিল্পরূপেও প্রমূর্ত হয়ে উঠেছে। এর অষ্টক-বন্ধে 'ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মত' দেহমিলনের আশ্লেষস্বপ্ন বাঙ্‌ময়; কিন্তু ষট্‌ক-বন্ধে এই মর্ত্য-বন্ধনের চরম ব্যর্থতা চূড়ান্ত হাহাকারে পর্যবসিত। ভাবের এই প্রতীপধর্মিতার ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে আবর্তন-সন্ধিতে। মিলের বিচিত্র-বিন্যাস ভাবের বিলসনে কি ভাবে সহায়ক হয়ে উঠেছে তার আলোচনা করেছি ১৯৫-'৯৬ পৃষ্ঠায়। মর্ত্যপ্রেমাসক্তির বন্ধন এখানে ঈশ্বরাসক্তিতে মুক্তির সন্ধান পেয়েছে। ভাবের সঙ্গে শিল্পের আনুরূপ্য তাই সার্থক। প্রতীপধর্মী ভাবের শিল্পগত এই আনুরূপ্য সনেটের মিশ্রসঙ্গতিতেই সুপরিস্ফুট। কলাকৃতির বিশিষ্ট প্রকরণের মধ্যে ভাবের এই দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ সঙ্গতি, এই বন্ধনরচন ও বন্ধনমোচনের লীলাকেই আমি আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব বলেছি।

সনেটের এই স্বরূপ-লক্ষণ অর্থাৎ আবর্তন-সন্ধিতে প্রতীপধর্মী ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় কলাবিলসন অনুপস্থিত বলে আমি শেক্‌স্‌পীয়রীয় অর্থাৎ ইংলণ্ডের 'স্বদেশী সনেট'কে সনেট আখ্যা প্রদানে সম্মত হই নি। ইংরেজি সাহিত্যের তথাকথিত রোমাণ্টিক রীতির সনেটকল্প রচনাবলীকে আমি সনেট-সমাজে ব্রাত্যের আসন দিয়েছি। একথাও বলেছি যে, উল্লেখযোগ্য মাত্র দু' একজন ছাড়া ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা কবিগণের কেউই এই ব্রাত্য-রীতির অনুসরণ করেন নি। শিল্প-

ক্ষেত্রে রূপ ও রীতির বিবর্তন যেমন অবশ্যম্ভাবী তেমনি অত্যাবশ্যকও বটে। কিন্তু কলানুশীলনে অদীক্ষিত শিল্পীর অনবধানতাকে বিবর্তনের দোহাই দিয়ে স্বীকৃতি দান করা সমীচীন নয়। ব্রাত্য-রীতির সনেটকল্প রচনার কাব্যবিচারের ভিত্তি স্বতন্ত্র। এই রীতিতেও অসংখ্য রসোত্তীর্ণ কবিতা রচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদের বিচার সনেট হিসাবে নয়, চতুর্দশ চরণের গীতিকবিতা হিসাবে। গীতিকবিতা হিসাবেও শেক্‌স্‌পীয়রের সনেটকল্প রচনাবলীর আমি উচ্চপ্রশংসা করতে পারি নি। পেত্রার্কান প্লেটোনিজমে অনুরাগী কাব্যরসিকের পক্ষে শেক্‌স্‌পীয়রীয় বিবর্ধনবাদ এবং জৈব স্তরে অবনমিত প্রেয়সী-প্রণয়াসক্তির প্রশংসাপরায়ণ হওয়া দুঃসাধ্য।

এই গ্রন্থের নামকরণ ‘পেত্রার্কা, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ’-ও করা যেতে পারত। পেত্রার্কা শুধু ইতালীয় তথা য়ুরোপীয় নবজন্মেরই প্রাণপুরুষ নন, তিনি আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকাব্যেরও আদিপুরুষ। তাঁর কণ্ঠে নবজন্মোত্তর জীবনসংগীত যে কলাযন্ত্র-সহযোগে উদ্‌গীত হল তাই হল নবযুগের গীতি-কাব্যের নববাহন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় নবজন্মের কবিপুরুষ মধুসূদনও পেত্রার্কান সনেটকে তাঁর অন্তরঙ্গতম আত্মপ্রকাশের মুখ্য কলাকৃতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মধুসূদনের গীতিকাব্যলক্ষ্মীর বাহন তাই সনেট। আমি বলেছি ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’তেই মধুসূদনের কবিজীবনের পূর্ণাহুতি হয়েছে। নবজন্মের কবিপুরুষ হিসাবে তাঁর কৃত্য ছিল দ্বিধাবিভক্ত। প্রাচীন জ্ঞান ও বিদ্যার পুনরুজ্জীবন, আর নবমানবতাবাদের স্তবগান। মেঘনাদবধের মধ্যে তিনি মহাকাব্য-যুগের মানব-মহিমাকে নবজীবনের আলোকে প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন, আর ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী’তে তাঁর কণ্ঠে নবজাগ্রত মানবতার জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে। মধুসূদনের সাহিত্যসাধনায় মহাকাব্য ও গীতি-কাব্য পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। এতদিন মুখ্যত মেঘনাদবধ মহাকাব্যের কবি হিসাবেই তাঁর প্রতিভার বিচার-বিশ্লেষণ হয়েছে। স্বভাবতই তা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। আমরা সনেটের আলোকে মধুপ্রতিভার পুনর্বিচারের চেষ্টা করেছি। কেননা এই কাব্যগ্রন্থেই তাঁর মানসলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কেও কয়েকটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সেখানে

রয়েছে। তাই আমি চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সাহায্যেই তাঁর মেঘনাদবধের উপরও নূতন আলোকপাতের চেষ্টা করেছি।

মধুসূদনের কবিমানসের স্বরূপ-সন্ধানে তাঁর ইংরেজি পত্রাবলীর চেয়ে আমি তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সাক্ষ্যকেই অধিকতর নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করেছি। মধুসূদনের ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা সমানধর্মা ছিল না। মাইকেল এম্. এস্. ডাট, বার-অ্যাট-ল, আর 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদনে' আকাশ-পাতাল ব্যবধান। একজন লক্ষ্মীর করুণাপ্রার্থী, আরেকজন সরস্বতীর বরপুত্র। এম্. এস্. ডাটের ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ঘটেছে বিদেশী ভাষা ইংরেজিতে, আর শ্রীমধুসূদনের কবিসত্তার উন্মীলন হয়েছে মাতৃভাষা বাংলায়। তাই কবি শ্রীমধুসূদনের মানসলোকের সাক্ষ্য হিসাবে যখনই মাইকেলের ইংরেজি বুলির উপর নির্বিচারে নির্ভর করা হয়েছে তখনই মধুসূদনকে বুঝবার পথে দেখা দিয়েছে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর আলোকেই তাই মধুমানসের বিশ্লেষণকে আমি অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করেছি। মেঘনাদবধ-কেন্দ্রিক বিচারে মনে হয় রাবণই মধুসূদনের আদর্শ পুরুষ, কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মহাভারতের বীরনায়ক অর্জুনই তাঁর আদর্শ হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ মেঘনাদবধের বিদ্রোহী মধুসূদন 'চতুর্দশপদী'তে প্রাচীন ভারতের বীরমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তাঁর মানসলোকের এই পরিণতির প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁর সাহিত্যকীর্তিকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে পুনর্বিচার করার প্রয়োজন আছে। আমি সেই পথই অনুসরণ করেছি। দেখবার চেষ্টা করেছি, মধুসূদন 'চতুর্দশপদী'তে য়ুরোপক্ষেত্র থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কি ভাবে কতটা ভারতপথিক হয়ে উঠতে পেরেছেন।

সনেট-কলাকৃতি হিসাবে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র বিস্তৃত ছান্দসিক বিচার-বিশ্লেষণ এই প্রথম করা হল। এই প্রসঙ্গে মধুসূদন সম্পর্কে কয়েকটি প্রচলিত ধারণার উপরও আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন থেকে মহাকাব্য এবং বিহারীলাল থেকে গীতিকাব্যের সূত্র টানা হয়ে থাকে। ১৩০১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথই প্রথম 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে বিহারীলালকে আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের কবিগুরু বলে ঘোষণা করেন। ষাট-বৎসরেরও অধিক কাল ধরে এই রবীন্দ্র-প্রত্যয়ই সমালোচনা-সাহিত্যে

নির্বিচারে গৃহীত হয়েছে। এই প্রত্যয় যে ঐতিহাসিক বিচারে অভ্রান্ত নয়, এবং আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের বংশ-লতিকায় বিহারীলাল নন, মধুসূদনই যে আদিপুরুষ, আমি সেকথা যুক্তিপ্রমাণের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছি। বিহারীলাল ও রবীন্দ্রনাথের উপর মধুসূদনের এই প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস নূতন করে লেখার প্রয়োজন হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

৩

তৃতীয় অধ্যায়ে সনেটের আলোকে রবীন্দ্র-মানসের পুনর্বিচার করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সনেট ও সনেটকল্প রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় তিন শত। রবীন্দ্র-কাব্যমালঞ্চের এই 'ছোটো ফুল'গুলির স্বতন্ত্র সংকলন যেমন বাঞ্ছনীয়, তেমনি রবীন্দ্র-রচিত সনেট-সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনাও একান্ত প্রয়োজনীয়। বর্তমান গ্রন্থে 'কড়ি ও কোমল'-এর সনেটগুচ্ছই আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপিত হয়েছে. তাঁর সনেটকল্প রচনাবলী অর্থাৎ ভঙ্গ-সনেটগুলির বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়নি।

রবীন্দ্র-সনেটের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-মানসে পেত্রার্কার প্রেমসাধনা ও কাব্যসাধনার প্রভাবের কথাই বিশেষ ভাবে পর্যালোচনীয়। নবজন্মোত্তর বাংলা গীতিকাব্যের মহত্তম কবির সৃষ্টিতে পেত্রার্কার জীবন ও কাব্যের প্রভাব কি ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছিল সে সম্পর্কে এর পূর্বে কোনোই আলোচনা হয়নি।

বর্তমান গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের সনেট-সাহিত্যের আলোচনার সার্থকতা চতুর্বিধ। প্রথম: রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশে ঘনপিনদ্ধ কলাকৃতির পরিশীলনের তাৎপর্য-নির্ণয়; দ্বিতীয়: রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনায় সনেটকল্প রচনাবলীর বিবর্তন ও বিচিত্র রূপায়ণের সৌন্দর্যবিচার; তৃতীয়: সনেট-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-মানসলোকের অনাবিষ্কৃত মহলের রহস্যান্বেষণ; এবং, চতুর্থ: রবীন্দ্রমানসে আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্বের স্বরূপ-সন্ধান। বর্তমান আলোচনায় এই সিদ্ধান্তই করা হয়েছে যে, চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই যেমন মধুসূদনের কাব্যসাধনার পূর্ণাহুতি হয়েছিল, তেমনি কড়ি ও কোমলের সনেটগুচ্ছেই রবীন্দ্রনাথের স্বয়ংপ্রভ কবিজীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে। এই সনেটগুচ্ছেই তরুণ-কবির মর্মলোক সর্বপ্রথম নিঃশেষে নির্বারিত হল। কাজেই কড়ি

ও কোমলের সনেটগুচ্ছের সরণি বেয়েই তরুণ-রবীন্দ্রনাথের মানসমন্দিরের মণিকুট্টিমে উপনীত হওয়া যেতে পারে, সেখানে পৌঁছবার অন্য পথ নেই।

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পৃথিবীর মানুষ, অথচ তাঁর মধ্যে প্রাচীন ঋষির সাধনাও উজ্জীবিত হয়েছে। এই আধুনিকে ও প্রাচীনে মিলে রবীন্দ্রমানসে দুটি পুরুষের নিত্যলীলা। একজন মৃৎসত্ত, আরেকজন চিৎসত্ত পুরুষ। মৃৎসত্ত পুরুষের 'মর্ত্যের মধুরতম আসক্তি' আর চিৎসত্ত পুরুষের 'আকাশের নির্মলতম মুক্তি'র কড়ি ও কোমলেই তাঁর জীবনসংগীত উদ্‌গীত। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে কবিমানসের এই মৃৎসত্ত পুরুষ আর চিৎসত্ত পুরুষের প্রতীপ-ধর্মিতার যে শিল্পসঙ্গতি বিরচিত হয়েছে রবীন্দ্র-কাব্যলোকে তার এমন ঘনিষ্ঠ ও একাত্ম প্রকাশ আর কোথাও পরিলক্ষিত হবে না।

তাছাড়া, কড়ি ও কোমলের সনেটগুচ্ছেই রবীন্দ্রনাথের মানসলক্ষ্মীর কমলাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তরুণ কবির সেই অপূর্ব ক্রবাদুর-প্রেমের আসক্তি-মুক্তি-লীলার সার্থক শিল্পরূপ হিসাবে এই সনেটগুচ্ছের মূল্য অপরিসীম। স্বভাবতই এই সনেটগুচ্ছের উৎসমূলে কবিপ্রেমের প্রেরণা-স্বরূপিণী তাঁর মানসলক্ষ্মীর কথাই এই আলোচনায় মুখ্যস্থান অধিকার করেছে। শুধু তাই নয়, কবির মানসলক্ষ্মীই তাঁর মর্মলোকের অনিঃশেষ লীলার নিত্য-প্রবাহিণী রসতরঙ্গিণী। তাই মানসলক্ষ্মী সম্পর্কে কবিচেতনার বিবর্তন ও পরিণতির সংকেতেই কবিমানসের স্বরূপ-নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব, সৌন্দর্যতত্ত্ব ও জীবনদেবতাতত্ত্বের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার স্থান এ নয়; কড়ি ও কোমলের সনেট-প্রসঙ্গে আমি যাকে 'রাবীন্দ্রিক প্লেটোনিজম' বলেছি, পেত্রার্কা ও দান্তের প্লেটোনিজমের সঙ্গে তার ঐক্য ও পার্থক্যের ইঙ্গিত দিয়েই এই আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। প্লেটোনিক প্রেমের আলোকে রবীন্দ্র-কাব্যবিচারের সূত্রপাত এখানে হল; পরবর্তী গ্রন্থ 'কবিমানসী'তে তার পূর্ণাঙ্গ বিচার-বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

৪

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নেতৃত্বে সিণ্ডিকেটের সদস্যগণ আমাকে 'হিরণকুমার বসু বক্তা' মনোনীত করে সম্মানিত করেছিলেন, তার জন্যে তাঁদের সবার উদ্দেশে আমার

কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি। বক্তৃতার প্রথম ও শেষদিনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত, এবং দ্বিতীয় দিনে সভাপতির আসনে বসেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শ্রীগোপাল হালদার। সভায় বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাহিত্যরসিক, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন কলেজের সাহিত্য-বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীগণ তাঁদের উপস্থিতি দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে একটি কথা সগৌরবে স্মরণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সাহিত্যানুরাগ সর্বজন-বিদিত। আমার বক্তৃতার দ্বিতীয় দিনে তাঁর অনিঃশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও দেড়ঘণ্টাধিক-কাল ধরে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত থেকে তিনি আমার প্রতি যে সস্নেহ পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন সেকথা আমি চিরদিন মনে রাখব।

এই গ্রন্থরচনায় অনেকের কাছেই আমি নানাভাবে প্রেরণা ও সাহায্য পেয়েছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্যের এই তিনজন বিশ্রুতকীর্তি অধ্যাপকের সঙ্গে সনেট সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। ডক্টর দে শুধু পণ্ডিতই নন, তিনি স্বয়ং একজন বিশিষ্ট সনেট-রচয়িতা। সনেট-সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা আমার বিশেষ কাজে লেগেছে। পরিভাষা-রচনায় ডক্টর সুকুমার সেন, ছন্দের সূক্ষ্ম-বিচারে অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, মধুসূদন-প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী এবং রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি নানাদিক দিয়ে লাভবান হয়েছি। আমার গ্রন্থরচনার প্রতিটি স্তরে কবি শ্রীসজনীকান্ত দাস আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমাকে নিত্যসচেতন রেখে অগ্রজ-কৃত্য পালন করেছেন। অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু মহাশয়ের সস্নেহ আনুকূল্য আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে আমার দীক্ষাগুরু, বঙ্গবাসী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান আচার্য কবি-অধ্যাপক শ্রীশ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের আশীর্বাদ ও উপদেশ আমাকে নূতন নূতন আলোর সন্ধান দিয়েছে। স্নাতকোত্তর স্তরে আমার পালি-সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্র-নাথ মিত্র, বঙ্গবাসী কলেজে আমার ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীরাজকুমার

চক্রবর্তী, শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীমণিভূষণ ভট্টাচার্য, এবং স্নাতক শ্রেণীতে আমার বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীহেরম্ব চক্রবর্তী এই গ্রন্থরচনায় আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দান করেছেন।

পূর্বাচার্যগণের নিকট জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে আমার ঋণের শেষ নেই। মধুসূদন-প্রসঙ্গে সাহিত্যাচার্য মোহিতলাল এবং রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে কবি-সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এবং রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা আমি প্রভাবিত হয়েছি। কিন্তু এই গ্রন্থরচনায় আমি সবচেয়ে বেশি ঋণী অধ্যাপক ফাদার পি. জে. ফালোঁর কাছে। বাংলা-সাহিত্যপ্রেমী এই বিদেশী-বন্ধু প্রভাসাঁল সাহিত্য, ক্রবাদুর প্রেম এবং ইতালীয় সনেটসাহিত্যে অনুপ্রবেশে আমাকে প্রতিপদে সাহায্য করেছেন। ইতালীয় ভাষায় আমার অনধিকার সত্ত্বেও তাঁর কণ্ঠে আমি ইতালীয় বাক্‌স্পন্দ এবং ছন্দ-সংগীতের আস্বাদন পেয়েছি। তাঁর সাহায্যেই আমি পেত্রার্কার একটি সনেট মূল ইতালীয় ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছি। এই বিদেশী-বন্ধুর কাছে আমি চিরঋণী।

বিদেশী সনেট এবং ছন্দ-শাস্ত্র সম্পর্কে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন ডক্টর দে, অধ্যাপক ফালোঁ, অধ্যক্ষ শ্রীপ্রশান্তকুমার বসু, অধ্যাপক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, অধ্যক্ষ শ্রীফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়, এবং অধ্যাপক শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ রায়। গ্রন্থব্যবহারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং বঙ্গবাসী কলেজের গ্রন্থাগারিক ও কর্মিগণের নিকট আমি অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি।

আমার অভিন্নহৃদয় কবিবন্ধু, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীঅশোকবিজয় রাহা তাঁর কবিদৃষ্টির আলোকে আমার চিন্তাকে আলোকিত করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য সুহৃৎসম্মিত পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতি ভবনের অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রীর কাছে আমি নানা তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি। ফরাসি-সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীনগেন্দ্রনাথ চন্দ্রের কাছে অনেক বিদেশী শব্দের উচ্চারণ জেনে নিয়েছি। আমার প্রীতিভাজন অধ্যাপক-

বন্ধুদের মধ্যে শ্রীবিভূতি চৌধুরী, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅজিত ঘোষ, শ্রীতারাচরণ বসু, শ্রীশান্তিগোপাল সিংহ রায়, শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীননীলাল সেন, শ্রীপৃথ্বীশ নিয়োগী, ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু ও শ্রীশচীনন্দন সিংহ আমাকে অনুক্ষণ উৎসাহ যুগিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে আমার অগণিত ছাত্রছাত্রীগণের উৎসাহের কথাও গর্বের সঙ্গে স্মরণ করি। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক শ্রীমান ব্রজেন্দ্রলাল সাহা, অধ্যাপক শ্রীমান নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃতি ভবনের উজ্জ্বলতম প্রাক্তন-ছাত্র ডক্টর শ্রীমান সুশীলকুমার গুপ্ত, এবং স্নাতকপরীক্ষার্থী শ্রীমান পার্থ বসু আমাকে নানা তথ্য ও উপকরণ-সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। শ্রীমান সুশীল গুপ্ত-সংকলিত ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক উইলকিন্সের একটি উদ্ধৃতি আমি সাতাশ পৃষ্ঠায় ব্যবহার করেছি।

গ্রন্থ-প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে বেঙ্গল পাবলিশার্সের যুগল-কর্ণধার শ্রীমনোজ বসু ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। মুদ্রণ-কার্যে বন্ধুবর শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত, শ্রীমতী মালবিকা দত্ত ও শ্রীঅশোক ঘোষ সর্বভাবে সহযোগিতা করেছেন। তথাপি আমার অনবধানে কয়েকটি মুদ্রণ-প্রমাদ রয়ে গেছে। যেমন, 'এলিজাবেথান'-এর বানান কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'ই এল আই'-এর বদলে 'ই এল ই' হয়ে গেছে, এবং ছিয়াত্তর পৃষ্ঠায় 'নিমচাঁদ' 'নিমাইচাঁদ' হয়ে বসেছেন।

গ্রন্থরচনায় বিদগ্ধজনের কাছে আমার ঋণ স্বীকার করেছি; কিন্তু এই গ্রন্থে প্রকাশিত মতামতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার নিজের, ভুলভ্রান্তির জন্যেও আমিই দায়ী। আমার অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও যদি বিদ্বজ্জনের কিঞ্চিৎ পরিতুষ্টি বিধান করতে পারি তাহলে এই চেষ্টাকে সার্থক মনে করব। এই গ্রন্থপাঠের পর বাংলার তরুণ কবিসমাজ বিশুদ্ধ সনেট-রচনায় উৎসাহিত হলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

বঙ্গবাসী কলেজ
চৈত্র, ১৩৬৭

জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রথম অধ্যায়

॥ সনেটের জন্মকথা ঃ পেত্রার্কা ও লরা

১

সনেট-রসিক ক্যাপেল্ লফ্‌ট্ আধুনিক কাব্য-সাহিত্যে সনেট-আবিষ্কারকে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। লিরিক বা গীতিকাব্যের লীলাভূমি ইংলণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে গীতিকাব্যের চরম দুর্দিনে ইংরেজি সাহিত্যে ইতালীয় সনেটকেই আদর্শ কলা-কৃতি বা art-form হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক এমিল লেগুই বলেছেন, ষোড়শ শতকে সনেটের মাধ্যমেই ইংরেজি সাহিত্যে গীতিকাব্যত্ব পুনঃপ্রবিষ্ট হল :

It was by the sonnet that lyricism again entered English poetry.[১]

আধুনিক কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে সনেটের এই মর্যাদা এবং গীতিকাব্য হিসাবে সনেটের এই মূল্যায়ন যুক্তিগ্রাহ্য কি না সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে সনেটের রূপ ও স্বরূপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। 'সনেট' নামকরণটি এসেছে ইতালীয় সোনেত্তো sonetto শব্দ থেকে। Suono অর্থাৎ ধ্বনি শব্দেরই ক্ষুদ্রার্থবাচক রূপ sonetto। কাজেই সোনেত্তোর অভিধেয় অর্থ হল 'একটি ক্ষুদ্র ধ্বনি'। প্রাচীন ফরাসি ও প্রভাঁসাল ভাষায় এই অর্থেই sonet শব্দটি son শব্দের ক্ষুদ্রার্থবাচক রূপ। বলাই বাহুল্য ইতালীয় suono এবং প্রভাঁসাল son উভয়েরই উৎপত্তি লাতিন sonus থেকে। Sonus-এর অর্থ একটি ধ্বনি বা গীতোচ্ছ্বাস। এই প্রসঙ্গে য়ুরোপীয় সংগীতের 'sonata' এবং ইতালি ভাষার আদিযুগের 'sonare' শব্দটির কথাও স্মর্তব্য।

সোনারে Sonare মানে যন্ত্রে গান বাজানো। Sonare থেকেই Sonorous শব্দের উৎপত্তি। ইতালি ভাষায় Canzone, Sonetto ও Ballata আদিতে ছিল সংগীত-জগতের পরিভাষা। যে-পদ শুধু কণ্ঠে গাওয়া হত তাকে বলত কান্‌ৎসোনে Canzone, বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে পদ গাওয়ার নাম ছিল সোনেত্তো Sonetto, আর নৃত্যসহযোগে গাওয়াকে বলা হত ব্যালাতা Ballata। অবশ্য মহাকবি দান্তের সময় থেকেই এই তিনটি শব্দ কাব্যলোকে কবিতার তিনটি প্রকারভেদ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[২] তবে সংগীতে কান্‌ৎসোনের সঙ্গে সোনেত্তোর যে পার্থক্য, কাব্যে সাধারণ লিরিকের সঙ্গে সনেটেরও সেই পার্থক্য।

সনেট জাতিতে ইতালীয়, গোত্রে পেত্রার্কান। কাজেই পেত্রার্কান সনেটকে আদর্শ ও বিশুদ্ধ সনেটরূপে গ্রহণ করেই সনেটের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করা সর্বতোভাবে সমীচীন। ইতালিতে একই ছন্দঃস্পন্দে গ্রথিত, একাদশাক্ষরা, চতুর্দশপদী একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতিকবিতার নাম সনেট। বিশিষ্ট মিলবন্ধনে সনেটের পদ্যবন্ধ দৃঢ়পিনদ্ধ। চতুর্দশপদে সমাপ্তব্য বলে সনেটের ভাবরূপ সংহত ও ঘনীভূত।

পদ্যবন্ধ হিসাবে সনেটের চতুর্দশপদ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অষ্টচরণে অষ্টক বা octave, আর দ্বিতীয় ভাগে ষট্‌চরণে ষট্‌ক বা sestet। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। আসলে অষ্টকাংশ দুটি সংবৃত চতুষ্ক বা enclosed quatrain-এর মিলবন্ধনে মিলিত, আর ষট্‌কাংশ দুটি ত্রিপদিকা বা ত্রিক অর্থাৎ tercet-এর মিলবন্ধনে রচিত। এই সংবৃত চতুষ্ক-যুগল ও অ-সংবৃত বা বিবৃত ত্রিক-যুগলের গ্রন্থিবন্ধনেই সনেটের ছন্দোরহস্য বিধৃত। চতুষ্ক অর্থাৎ চার চরণের পদ্যবন্ধ মিলবন্ধন বা মিত্রাক্ষরতায় সংবৃতও হতে পারে, বিবৃতও হতে পারে। উদাহরণের সাহায্যে কথাটা স্পষ্ট হবে :

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে, ক
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে চ
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ী! কত ব্যথা লাগে চ
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে— ক

এখানে চতুষ্কটি সংবৃত। দ্বিতীয় আর তৃতীয় চরণে এক মিল : চচ :, আর চতুর্থ চরণে প্রথম চরণের মিল পুনরাবৃত্ত হয়ে চতুষ্কটিকে সংবৃত করেছে। পক্ষান্তরে,

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;— ক
তা সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলা করি, চ
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ ক
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি। চ

এখানে চতুষ্কটি বিবৃত, অর্থাৎ মিলবন্ধন পদান্তর-পর্যায়ে বিন্যস্ত : কচকচ। সনেটে চতুষ্কযুগলের মিলবন্ধন সাধারণত সংবৃতিধর্মী। এবং প্রথম চতুষ্কের মিলবন্ধন দ্বিতীয় চতুষ্কে একই পর্যায়ে পুনরাবৃত্ত হয়। অর্থাৎ সনেটের অষ্টকে থাকে মাত্র দুটি মিল, ঃঃ কচচক : কচচক ঃঃ। এর ফলে দুটি চতুষ্ক পৃথক হয়েও পরস্পর সম্পৃক্ত ও ঐক্যগ্রথিত হয়। প্রথম চতুষ্ক সংবৃত হওয়ার পরে ছন্দ ও ভাব উভয় দিক দিয়েই সামান্য যতি বা বিরতিবোধের সৃষ্টি হয়, কিন্তু একই মিলের পুনরাবির্ভাবে সেই ক্ষণিক বিরতিবোধ বৃহত্তর সঙ্গতিতে গ্রথিত হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় চতুষ্কে প্রথম চতুষ্কের মিলবিন্যাসের পুনরাবর্তনের রহস্যটি সনেটবিচারে বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য। ন্যায়শাস্ত্র যেমন যুক্তিপরম্পরায় গ্রথিত হয় সনেট-শিল্পের বাঙ্‌নির্মিতি সে পর্যায়ের নয়। অন্ত্যানুপ্রাসের পুনরাবির্ভাবে এখানে যুক্তিক্রমকে ছাপিয়ে ওঠে শিল্পের আবেদন, এবং বিশিষ্ট রীতিতে বিন্যস্ত মিলের সমাবর্তনে সমগ্র অষ্টক-বন্ধে বিলসিত ভাবকল্প

একটি নিটোল শিল্পসম্পূর্ণতা লাভ করে। সনেট-কলাকুশলী একজন সমালোচক বলেছেন :

The second sub-stanza of the four lines is carried back to the first by the integral rhyme-scheme ; the progressive logic of syntax is overborne by the emotional suggestions of rhyme ; and a stasis results wherein the imagination hovers over one intense experience compounded equally of thought and feeling.[৩]

ভাব ও ভাবনার সমসংযোগে রসায়িত সুনিবিড় কবি-অভিজ্ঞতাকে রসিকচিত্তে সঞ্চারিত ক'রে দেওয়ার মধ্যেই অষ্টক-বন্ধের দুটি মিলের পৌনঃপুনিক আবর্তনের সার্থকতা।

চতুষ্কযুগল দিয়ে এই অষ্টক রচনার পরে আসে ত্রিকযুগল গ্রন্থনের পালা। ত্রিক-বন্ধ পদ্য তিনের সমবায়ে গঠিত বলে অযুগ্মধর্মী ও অ-সংবৃত। প্রথম ও তৃতীয় পদে মিল হলেও মধ্যপদ থাকে মুক্ত। যেমন=তপত। কিন্তু মুক্তির ক্ষেত্রেও যুগলের মিলনে ঘটে মিলের রাখীবন্ধন। ষট্‌ক-বন্ধে তাই হয় দুটি, নয় তিনটি মিল থাকে। দুটি হলে মিলের গঠন হবে হয়=তপত-তপত=, নয়=তপত-পতপ=, নতুবা=ততপ-ততপ। এই শেষোক্ত মিলবন্ধনের ফলেই একজাতীয় ফরাসি সনেটের উদ্ভব হয়েছে যার অষ্টক-বন্ধের পরে আসে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক। ষট্‌কের মিল তিনটে হলে মিলের গঠন হবে হয়=তপন-তপন, নয়=তপন-নপত, অথবা=তপন-নতপ। ইত্যাদি। কিন্তু যে ভাবেই মিলবন্ধন হোক না কেন, ষট্‌ক-বন্ধের মিলের মিলনলীলা অষ্টক-বন্ধ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অষ্টকে যেন ভাবের আসক্তি পাকে পাকে ভাষাকে জড়িয়ে ধরছে, আর ষট্‌কে চলছে মিলের অটুট বন্ধন খুলতে খুলতে ছন্দের মুক্তিলীলা। এই আসক্তি ও মুক্তি, এই বন্ধনরচন ও বন্ধনমোচনই সনেটের মিলরচনার মূল রহস্য। আর এখানেই পাওয়া যাবে সনেট সম্পর্কে একটি

মৌলিক প্রশ্নের উত্তর : সনেট কেন চতুর্দশপদী ? বলাই বাহুল্য, দুটি চতুষ্ক এবং দুটি ত্রিক মিলে সনেট গড়ে ওঠে। তাই অষ্টকের সঙ্গে ষট্‌ক যুক্ত হয়ে চতুর্দশ পদেই সনেটের গড়ন সম্পূর্ণ হয়। পূর্বেই দেখানো হয়েছে, এই অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যে একটি অখণ্ড সঙ্গতি বিদ্যমান থাকলেও সে সঙ্গতি সরল নয়, মিশ্র বা জটিল। চারটি সূক্ষ্ম স্তরে সনেট বিন্যস্ত। প্রথম চতুষ্ক, দ্বিতীয় চতুষ্ক, প্রথম ত্রিক, দ্বিতীয় ত্রিক। এই চারটি স্তর সনেট-দেহের অঙ্গসন্ধির মত। কিন্তু এই চারটি স্তরও মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে আছে। অষ্টক আর ষট্‌ক। তাই আদর্শ সনেটে অষ্টক আর ষট্‌কের মধ্যস্থলেই থাকে সনেট-দেহের মুখ্য অঙ্গসন্ধি। ইতালি ভাষায় একে বলা হয়েছে volte বা turning। বাংলায় একে বলা যেতে পারে বক্রায়ণ বা আবর্তন-সন্ধি। এই আবর্তন-সন্ধির মধ্যেই বিশুদ্ধ সনেটের মুখ্য বৈশিষ্ট্য। পূর্বেই বলা হয়েছে সনেট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। স্বভাবতই একটি অখণ্ড ভাব ভাবনা বা অনুভূতি, অথবা কবিমানসে অধিবাসিত বহির্জগতের একটি ঘটনা বা বিষয়ই সনেটের আলম্বন। মুখ্য-অঙ্গসন্ধিতে আবর্তনকে অক্ষুণ্ণ রেখে কবিমানসের সেই ভাব, ভাবনা বা অনুভূতির অখণ্ড ঐক্যের প্রকাশেই সনেট-রচনার সফলতা। সনেটের কাঠামোতে যে মিশ্র-সঙ্গতি বিরাজমান, তারই স্তরে স্তরে সমভাবে ভাবকে সঞ্চালিত করে দেওয়ার মধ্যেই স্রষ্টার কৃতিত্ব। আরম্ভ-পদ থেকে সমাপ্তি-পদ পর্যন্ত কোথাও এর দৌর্বল্য বা শৈথিল্য যেমন ক্ষমার্হ নয়, তেমনই কোন একটি বিশেষ অংশে ভাবের বা ধ্বনিপ্রবাহের আত্যন্তিক শক্তিঘনতাও বাঞ্ছিত নয়। সেইজন্যেই বিশুদ্ধ সনেটের সমাপ্তিতে মিত্রাক্ষর পদযুগ্মক-রচনা ইতালিতে সমর্থন পায় নি। এখানেই দ্বিপদী বা চতুষ্পদী কবিতা অথবা 'এপিগ্রাম' থেকে সনেট স্বতন্ত্র। প্রাচীন অর্থেই হোক আর আধুনিক অর্থেই হোক, এপিগ্রামের

গুরুত্ব তার উপসংহারে। সনেটের গুরুত্ব তার সর্বদেহে, প্রতিটি পদ ও প্রতিটি মিলরচনায় তার মাধুর্য ও ঐশ্বর্য।

সনেটে অষ্টক-বন্ধের সঙ্গে ষট্‌ক-বন্ধের শিল্পসম্পৃক্তি কি ভাবে বিরচিত হয়, কেন মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট সমাপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়, এবং সনেটদেহে অভিব্যক্ত ভাবের বিলসনে অষ্টক-বন্ধের নিগূঢ় যোগসূত্রটি কি ভাবে গ্রথিত হয়ে আছে তার বিশ্লেষণ করে লেভার বলেছেন :

In the sestet, the act of correlation replaces the completed act of intuition....What is almost always desirable is that a rhyming couplet should not appear at the end, which throws the structure out of balance by suggesting logical deduction instead of rational correlation. The function of the sestet is not to supersede the intuitive knowledge of the octave but to gather up its truth and apprehend it in the region of conscious thought. It supports the octave as the cup supports the accorn; and both processes are 'organic', whether intuitive or rational; not 'mechanical', as in logical analysis or deduction. Accordingly the significance of the octave is expounded in the six lines divided in complementary halves, and the integrated quality of the rhyme-scheme, which only progressively impresses itself upon the reader's consciousness, knits up the experience line by line into the poet's total interpretation of life.[৪]

সনেটের অষ্টক-ষট্‌কের সম্পর্ক লেভারের ভাষায় অনেকটা বিশদীভূত হয়েছে। এই পরস্পর-সাপেক্ষতা বা correlation যে যান্ত্রিক বা mechanical অর্থাৎ বাইরে থেকে জুড়ে দেওয়া তুটি অংশের মতই নয়, তা যে প্রাণি-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতই organic, অর্থাৎ কাব্যের প্রাণাবেগের আভ্যন্তরিক প্রেরণাবশেই

উৎসারিত দুটি নিত্যসম্পৃক্ত অংশের মত, সেকথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু সনেটদেহে ভাবের সেই বাঙ্ময় আত্ম-প্রকাশের ভারসাম্য সর্বদাই অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী মুখ্য অঙ্গ-সন্ধিতেই সুরক্ষিত থাকে। কাজেই অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী বক্রায়ণ বা আবর্তন-সন্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে সনেটের স্বরূপ-নির্ণয় সম্পূর্ণ হতে পারে না। শব্দশাস্ত্রের একটি উপমার সাহায্যে এই আবর্তন-সন্ধির পরিচয় এবং অষ্টক-ষট্‌কের সম্পৃক্তি বা সঙ্গতি-নির্ণয়ের চেষ্টা করা যেতে পারে। সমগ্র সনেটকে যদি একটি বাক্যরূপে কল্পনা করা যায় তা হলে সনেটকে বলতে হবে একটি মিশ্র বাক্য বা complex sentence। যৌগিক বাক্য বা compound sentence-এর মত এর অষ্টক ও ষট্‌ক পরস্পর-নিরপেক্ষ নয় ; মিশ্র বা জটিল বাক্যের অন্তর্গত বাক্যযুগলের মতই এই দুটি অংশে পরস্পর-সাপেক্ষতা বিদ্যমান।

অষ্টক-ষট্‌কের এই সাপেক্ষতার স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্যে ইংরেজি-সমালোচনা-সাহিত্যে কবি থিওডোর ওয়াট্‌স-ডানটনের একটি কবিতা প্রায়ই উদ্ধৃত হয়ে থাকে। ওয়াট্‌স-ডানটন সমুদ্রতরঙ্গের উচ্ছ্বাস ও পতনের সঙ্গে অষ্টক-ষট্‌কের তুলনা করে বলেছেন :

A sonnet is a wave of melody :
From heaving waters of the impassioned soul
A billow of tidal music one and whole
Flows in the "Octave"; then returning free,
Its ebbing surges in the "Sestet" roll
Back to the deeps of Life's tumultuous sea.

কবিতাটি কাব্য হিসাবে সুন্দর। সমুদ্রতরঙ্গের জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে সনেটের ছন্দ-সংগীতের উত্থান-পতনের রহস্যটি আশ্চর্য সৌন্দর্যে উপমিত হয়েছে। Impassioned soul থেকে ভাবের তরঙ্গোচ্ছ্বাস উত্থিত হয়ে জীবনের উত্তাল সমুদ্রে আবার বিলীন

হয়ে যাওয়ার কল্পনাটিও তাৎপর্য-মণ্ডিত। কিন্তু কবির এই সুন্দর উপমাটি পরবর্তী ইংরেজ সমালোচকদের মনে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। 'Voice of the Sonnet'-এর এই উত্তরাংশে কবি অষ্টককে জোয়ারের সঙ্গে এবং ষট্‌ককে ভাঁটার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই কল্পনাকেই অনুসরণ করে উইলিয়াম শার্প পেত্রার্কার অষ্টক ও ষট্‌ককে ঝটিকার আগমন-নির্গমনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছিলেন :

The Petrarcan (sonnet)...is like a wind gathering in volume and dying away again immediately on attaining a culminating force.[৫]

ভেরিটি এই একই কথার পুনরুক্তি করে বলেছেন :

The marked pause at the close of this movement necessarily makes a climax : the sonnet reaches its high-water point of thought and rhythm, and then falls gradually away.[৬]

এমন কি, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, ১৯৩৬ সনে ইংরেজি সাহিত্যের বিখ্যাত ছান্দসিক Enid Hamer ইংরেজি সনেটের যে সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, তার ভূমিকাতেও একই বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনিও বলেছেন :

The good Petrarcan sonnet often rises smoothly to a climax at the end of the octave, and has a swift, tumultuous, or sinuous cadence in the sestet, which has been compared with the breaking of a wave.[৭]

ইংরেজ সমালোচকদের এই অন্ধ পুচ্ছানুগ্রাহিতা সত্যই বিস্ময়কর। আসলে এই বিভ্রান্তির হেতুটি বড়ই কৌতুকাবহ। সে কৌতুক-কাহিনীর মর্মোদ্ঘাটন করেছেন কবি ওয়াট্‌স-ডানটন স্বয়ং। কেম্ব্রিজ এনসাইক্লোপিডিয়ার পুরনো সংস্করণে সনেট সম্পর্কে

লেখাটি তাঁরই। সে লেখা পরে তাঁর 'Poetry and the Renaissance of Wonder' গ্রন্থে "সনেট" প্রবন্ধরূপে সংকলিত হয়েছে। ওয়াট্স-ডানটন বলেছেন, তাঁর মতে অষ্টক-ষট্‌কের সম্পৃক্তি-রচনার প্রকারভেদে সনেট মুখ্যত চতুর্বিধ। প্রথম জাতের সনেটে ছন্দঃস্পন্দ ও ভাবের বলবত্তর অংশ থাকে ষট্‌ক-বন্ধে, অর্থাৎ সে পর্যায়ে যেন আগে ভাঁটা, পরে জোয়ার। দ্বিতীয় জাতের সনেট তার বিপরীত। সেখানে অষ্টকে জোয়ার, ষট্‌কতে ভাঁটা। তৃতীয় জাতের সনেটে ষট্‌ক-বন্ধ অষ্টক থেকে মোটেই পৃথক নয়, একই ভাবের প্রবাহ শেষ চরণ পর্যন্ত অবিরাম ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে বহমান। অর্থাৎ সেখানে আবর্তন-সন্ধি অনুপস্থিত। চতুর্থ পর্যায়ে ষট্‌ক যেন কবিতার শেষে আলাদা জুড়ে দেওয়া। তা যেন কবিতার পুচ্ছাংশ। প্রভাঁসাল বা ফরাসি কাব্যের 'Envoy' বা সংগীতের 'Coda'র মত। বলাই বাহুল্য, তৃতীয় পর্যায়ের সনেট নিকৃষ্ট, চতুর্থ নিকৃষ্টতর।

ওয়াট্স-ডানটন বলেছেন, এই চার পর্যায়ের সনেটের উদাহরণ হিসাবে তিনি চারটি সনেট রচনা করেন—'4 sonnets on the sonnet'। তার মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের উদাহরণটি বিশেষভাবে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং বিভিন্ন সংকলন-গ্রন্থে sonnet's voice শিরোনামায় উদ্ধৃত হয়। তারই উপরে অন্ধ নির্ভরতার ফলে ইংরেজি সমালোচনায় এই বিস্ময়কর বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু সনেট-রচনায় সর্বক্ষেত্রেই ছন্দঃস্পন্দ ও ভাবের বলবত্তর অংশ অষ্টক-বন্ধে সীমাবদ্ধ থাকবে এমন হতেই পারে না। তা হলে ষট্‌ক-বন্ধ অপ্রধান ও দুর্বল হয়ে পড়বেই। বস্তুত পেত্রার্কান সনেটের প্রবণতা হল এই যে, সনেটের আরম্ভের চেয়ে তার সমাপ্তি হবে অধিকতর সঙ্গতিময়। এমন হওয়া চাই যাতে কবিতাটির প্রভাব পাঠক-মনে অনিবার্য হয়ে ওঠে : The end should invariably

be more harmonious than the beginning, i.e., it should be dominantly borne in upon the reader. পেত্রার্কার অজস্র সনেটও এর সমর্থন-হিসাবে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাই উইলিয়াম শার্প তাঁর ভুল বুঝতে পেরে পেত্রার্কার সনেট সম্পর্কে তাঁর উক্তি সংশোধন করে পরে বলেছেন, ঝটিকার আগমন-নির্গমনের পরিবর্তে তাঁর বলা উচিত—

The Petrarcan sonnet is like an oratorio, where the musical divisions are distinct, and where the close is a grand swell, the culmination of the foregoing harmonies.[৮]

এই আত্ম-সংশোধনীর পরেও কিন্তু তিনি নিজের উক্তির অসামঞ্জস্য থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। কেন না জোয়ার-ভাঁটার উপমা নিয়ে তিনি একটি স্বকপোলকল্পিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, সনেট যদি প্রেম বা হৃদয়ের কোন কোমল আবেগের বাহন হয় তা হলে জোয়ারে তার আরম্ভ আর ভাঁটাতে তার সমাপ্তি। কিন্তু যদি কোন তীব্র আবেগ বা চিন্তার দীপ্তি তার আলম্বন হয় তা হলে ভাঁটার টান আবর্তন-সন্ধি পর্যন্ত পৌঁছে ষট্‌ক-বন্ধ জোয়ারের প্রবল জলোচ্ছ্বাসে কল্লোলিত হয়ে উঠবে। শার্পের এ সিদ্ধান্তও তাঁর মনগড়া এবং পেত্রার্কার প্রেমকাব্যই তার সুস্পষ্ট প্রতিবাদ।

আসলে সনেট সম্পর্কে এ জাতীয় কোন পূর্বসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। কবি-প্রজাপতির আপন সৃষ্টি-নিয়মেই শিল্পলোক বিরচিত হয়। আদিতে সনেট ছিল প্রেমকাব্য, কিন্তু গত ছ-সাত শতাব্দীর সৃষ্টি-পরিক্রমায় সনেট কবিমানসের সার্বভৌম ক্ষেত্রেই আপন অধিকার বিস্তার করেছে। একজন সমালোচক সত্যই বলেছেন, সনেট যেন মানব-হৃদয়ের বর্ণমালা: 'The sonnet might almost be called the alphabet of the human

heart'। কবির স্বানুভূত উপলব্ধির প্রকাশ-হিসাবে সনেট কাব্যশ্রেণীতে লিরিক বা গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের মৌলিক পার্থক্য হল চতুর্দশ পদের অনুশাসনে, মিলের লীলায়িত বন্ধনে, এবং ভাবের জটিল বিন্যাসে। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে এত বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও অনুশাসনকে কেউ কেউ অত্যন্ত কৃত্রিম বলেছেন। সনেট-বিমুখ একজন ইতালীয় বক্রোক্তিকার সনেটের চতুর্দশ পদের দৈর্ঘ্যকে প্রক্রাস্টেসের লৌহশয্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন। এতিকার সেই নিষ্ঠুর দস্যুর ছিল একটি লৌহশয্যা। যে-সব হতভাগ্য তার হাতে বন্দী হত তাদের সে শুইয়ে রাখত সেই লৌহশয্যায়। যে হতভাগ্য শয্যার মাপে হত লম্বা, পায়ের দিক দিয়ে তার বাড়তি অংশটুকু সে কেটে বিছিন্ন ক'রে দিত, আর যে হত ছোট তাকে সে পিটিয়ে শয্যার মাপে লম্বা করে দিত। প্রক্রাস্টেস তার বন্দীদের যে বিড়ম্বনা ঘটাত, সনেটের লৌহশয্যার মাপে ভাবকে মেলাতে গিয়ে কবিদেরও নাকি তাই করতে হয়। যেখানে ভাব অষ্টকে বা দশকেই সমাপ্ত হওয়া সমীচীন সেখানে টেনে-বুনে তাকে চতুর্দশ পদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়, আর যেখানে সনেটের মাপে কিছুতেই ভাবকে সংবরণ করা সম্ভব হয় না সেখানে তার অঙ্গচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অক্ষম রচয়িতার প্রেরণা-শূন্য প্রয়াসের ফলে অনুরূপ ব্যর্থ সনেট যে অজস্র রচিত হয় নি এমন নয়, কিন্তু রচয়িতার ব্যর্থতা দিয়ে কোন কলাকৃতির উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচার চলতে পারে না। ব্যর্থতা শুধু চতুর্দশ পদের জন্যেই আসে না, মিল-রচনাও সনেট-শিল্পেরএকটি প্রধান কলাকৃত্য। অন্ত্যানুপ্রাস-রচনা যাঁদের ভাব-প্রকাশের অন্তরায়, সনেট তাঁদের জন্যে নয়। অলংকার ও শব্দশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলনের ফলে যাঁদের হাতে শব্দের ঘটকালি পদে পদে রাজযোটক হয়ে ওঠে তাঁরাই সনেট-কাব্যের কুশলী কলাকোবিদ।

তা ছাড়া গীতি-বা-চিত্রধর্মী স্বতঃস্ফূর্ত লিরিকের সঙ্গে সনেটের শিল্প ও ভাবের মিশ্র-সঙ্গতির মৌলিক পার্থক্যও লক্ষণীয়। সনেটে কবির ভাবাবেগ আত্মসমীক্ষণের উত্তাপে সংহত ও ঘনীভূত হয়ে আসে। সেই ঘনীভূত ভাবের উপাদানকে সনেটের বিশিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করে কবি তাঁর শিল্পবিগ্রহ রচনা করেন। সাধারণ গীতিকবিতার মত শব্দের ধ্বনি এবং অন্ত্যানুপ্রাসের সংগীত সনেটে তো রয়েছেই, অর্থালংকারের সৌন্দর্যলোকও সেখানে সমুদ্ভাসিত। কিন্তু শুধু ছবি ও গান, অথবা বর্ণ ও সুরের মধ্যেই সনেটের শিল্পসৌন্দর্য বিলসিত নয়, সনেট-শিল্পী স্বরূপত কাব্যলোকের ভাস্কর। কঠিন ধাতু বা পাষাণের উপাদান দিয়েই ভাস্কর যেমন শিল্পলোকের কোমল লাবণ্য সৃষ্টি করেন, এবং তাঁর শিল্পসঙ্গতির মধ্যেই যেমন বর্ণ ও সুরের ঝরনাধারা নেমে আসে, চতুর্দশপদীর কঠিন কাঠামোতে তেমনই সনেট-ভাস্কর তাঁর ভাববিগ্রহকে কোমল লাবণ্যে নয়নাভিরাম করে তোলেন ; এবং তাঁর শিল্পের আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি থেকেই সৃষ্ট হয় বর্ণ ও সুরের সৌন্দর্য ও মাধুর্য।

সনেটের এই আভ্যন্তরীণ সঙ্গতি যেমন সূক্ষ্ম, তেমনই জটিল। একটি উপমার সাহায্যে বক্তব্য স্পষ্ট হতে পারে। আমরা পূর্বেই বলেছি, সংগীতশাস্ত্রে কান্‌ৎসোনের সঙ্গে সোনেতোর যে পার্থক্য, কাব্যশাস্ত্রে সাধারণ লিরিকের সঙ্গে সনেটেরও সেই পার্থক্য। কান্‌ৎসোনেতে হৃদয়াবেগকে ভাষায় প্রকাশ করে মুক্তকণ্ঠে গেয়ে যাওয়া। সোনেতোয় কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে মিলছে যন্ত্রসংগীত। সাধারণ লিরিক কবিকণ্ঠের গান। প্রাণের আবেগের সঙ্গে কণ্ঠের মাধুর্য মেলাতে পারলেই সে গান সার্থক। কিন্তু সনেটে কণ্ঠসংগীতকে অধিকন্তু যন্ত্রসংগীতের সঙ্গেও মেলাতে হবে। কবি শুধু গাইবেনই না, সঙ্গে সঙ্গে একটি যন্ত্রেও সুরের সূক্ষ্ম সঙ্গতি রচনা করে চলবেন। সে যন্ত্র আবার একতারা বা গোপীযন্ত্রের মত সহজ-

বাদ্য নয়, বহুতন্ত্রী-সমন্বিত সনেটের বীণাযন্ত্র। কণ্ঠ ও যন্ত্রের এই দুঃসাধ্য সঙ্গতিই সনেটের সঙ্গতি। এই মিশ্রসঙ্গতি বা complex harmony-র এক কোটিতে আছে কাব্যের আত্মা, আরেক কোটিতে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব। সনেটের এই দ্বিকোটিকতাকে বিখ্যাত সনেটকার ডি. জি. রসেটি মুদ্রার উভয় পৃষ্ঠের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 'The House of Life' গ্রন্থের যে ভূমিকা-সনেটে তিনি সনেটকে 'মুহূর্তের স্মরণস্তম্ভ'—A Sonnet is a moment's monument—বলেছেন তারই ষট্‌ক-বন্ধে সনেটের এই মিশ্র-সঙ্গতির ইঙ্গিত রয়েছে :

A sonnet is a coin : its face reveals
The soul,—its converse, to what power 'tis due—

রস ও রূপের এই মিশ্র-সঙ্গতিতেই সনেটের লীলাবিলাস।

২

আমরা বলেছি, সনেট জাতিতে ইতালীয়, গোত্রে পেত্রার্কান। আদি বা বিশুদ্ধ সনেট পেত্রার্কার[১] নামেই চিহ্নিত, পেত্রার্কা কিন্তু এর জন্মদাতা পিতা নন। মধুসূদন ঠিকই বলেছেন,

কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ;

পেত্রার্কার পূর্বেও কাব্যের খনিতে এই ক্ষুদ্র মণির অস্তিত্ব ছিল। মোটামুটিভাবে বলা যায়, কাব্যবন্ধ হিসাবে সনেটের উদ্ভব ত্রয়োদশ শতাব্দীতে। ১৩৩২ খ্রীষ্টাব্দে Antonio da Tempo নামে পাদুয়ার একজন বিদগ্ধ বিচারক দেশজ কাব্য সম্পর্কে একখানি গ্রন্থ রচনা

করেন। তাতে তিনি ষোড়শবিধ সনেটের তালিকা দিয়েছেন, তা ছাড়া গৌণ আরও বহু রূপবৈচিত্র্যের উল্লেখ সে গ্রন্থে রয়েছে। প্রথম সার্থক সনেট-রচয়িতা হিসাবে বলোঞা-নিবাসী গিদো গিনিচেলির (Guido Guinicelli of Bologna) নামই সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। তবে এই প্রসঙ্গে সিসিলীয় সারস্বতগোষ্ঠীর Guittone d' Arezzo-র দাবিও ভুললে চলবে না ; সম্ভবত তিনিই প্রথম সচেতনভাবে সংবৃত চতুষ্কযুগলের ব্যবহার করেন। ১৮৭৮ সনে D' Ancona তাঁর 'Poesia Popolare' গ্রন্থে প্রমাণ করতে চান যে, সনেট মূলত পদান্তরপর্যায়ে বিন্যস্ত দুই মিলের অষ্টপদী স্ত্রাম্বত্তো-(Strambotto)-বন্ধের সঙ্গে ষট্পদী রিস্পেত্তো-বন্ধের স্তবকযুগলের মিলনেই উদ্ভূত হয়েছে। কিন্তু ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিজারিও তাঁর 'La Poesia Siciliana' গ্রন্থে এই মতের বিরোধিতা করে প্রমাণ করেন যে, সনেট একটি অষ্টপদী এবং একটি ষট্পদী স্ত্রাম্বত্তো-যুগলের মিলনেরই ফল।[১০] এ সম্বন্ধে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আজও সম্ভব হয় নি। কিন্তু এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, কাব্যের কলাকৃতি হিসাবে সনেট একদিনে হঠাৎ আবির্ভূত হয় নি ; দীর্ঘদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়েই তার উদ্ভব হয়েছে। এবং সনেটের আদি বিবর্তন প্রসঙ্গে প্রভাঁসের ক্রবাদুরদের প্রেমসংগীত আর আরবি গজলের প্রভাবের কথাও অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে।

য়ুরোপীয় ইতিহাসের মধ্যযুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃতির নবজন্মের পূর্ব পর্যন্ত দক্ষিণ-য়ুরোপের দেশজ ভাষাসমূহের উদ্বর্তন-বিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, গ্রীকো-রোমক সভ্যতার প্রাচীন প্রজ্ঞাভূমি থেকে বিচ্যুত হবার পর ধীরে ধীরে দেশজ ভাষাসমূহের উদ্ভব হতে লাগল। দক্ষিণ-য়ুরোপে পোর্তুগাল

থেকে কালাব্রিয়া বা সিসিলি পর্যন্ত যে ভাষা লোকমুখে ব্যবহৃত হতে লাগল, তাদের রোমান্স-ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। সাধারণভাবে লাতিন এবং ট্যুটনিক ভাষার মিশ্রণে রোমান্স-ভাষাগোষ্ঠীর উদ্ভব। পোর্তুগাল, স্পেন, প্রভাঁস, ফ্রান্স ও ইতালির কথ্যভাষা একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত, পার্থক্য শুধু আঞ্চলিকতায়। এই সব দেশজ ভাষাসমূহের প্রতিষ্ঠাকাল খ্রীষ্টীয় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। তন্মধ্যে প্রভাঁসাল ভাষাই সবচেয়ে প্রাচীন। তার উদ্ভব নবম শতাব্দীতে। প্রাচীন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পূর্বাংশের নাম প্রভাঁস। উত্তরে দোফিন, পূর্বে আল্‌পস ও ইতালি, পশ্চিমে রোন এবং দক্ষিণে ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী ভূভাগের নাম প্রভাঁস। এই প্রভাঁসকে বলা হয় আধুনিক য়ুরোপের 'কবি-মাতৃভূমি'। প্রভাঁসে একাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে ত্রুবাদুর নামে এক গায়ক-কবিসমাজের উদ্ভব হয়, যাঁরা প্রেমসংগীত রচনা করে দেশে দেশে গেয়ে বেড়াতেন। কাব্যে এবং সংগীতে এঁরা ছিলেন সমানভাবে দক্ষ। তাঁদের অনেকেই ছিলেন অভিজাতবংশীয়; প্রচুর সম্পদ ও স্বাধীনতার অধিকারী। কেউ কেউ আবার কাব্য এবং সংগীতকেই জীবিকা-হিসাবে বরণ করেছিলেন। এই ত্রুবাদুরদের প্রেমসংগীত মধ্যযুগীয় য়ুরোপের কাব্যসাহিত্যে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে। বলাই বাহুল্য, আদিম প্রভাঁসাল সাহিত্য ছিল পরকীয়া প্রেমপিপাসারই কাব্যরূপ। সম্ভোগাখ্য নিষিদ্ধ-রতিই ছিল তার স্থায়ী ভাব। ধর্মচেতনাও ওর সঙ্গে যুক্ত ছিল, কিন্তু তা ছিল মূলত পেগান। অর্থাৎ মদন-মহোৎসব-লীলাই ছিল নিম্নস্তরের ত্রুবাদুর কাব্য-গীতিকারদের ঈপ্সিত লক্ষ্য। কিন্তু পরবর্তী যুগে পরিশোধিত ত্রুবাদুর প্রেম কামগন্ধহীন 'নিকষিত হেমে' রূপান্তরিত হয়েছে। এই পরিশোধিত ত্রুবাদুর-প্রেম রক্তমাংসের প্রেম নয়, মানস-

সুন্দরীর উদ্দেশে ভক্তের আত্মনিবেদনই সে প্রেমের মর্মকথা। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেম, লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেম ত্রুবাদুর-প্রেমেরই দোসর। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীমতী ডরোথি এল. সেয়ার্স [Dorothy L. Sayers] তাঁর অনূদিত দান্তের ডিভাইন কমেডির পারগেটরি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন :

Let us begin by reminding ourselves that Dante was nurtured upon the poetic doctrine of Courtly Love. That doctrine, arising out of the conditions of a feudal society, did not, strictly speaking, represent an attitude to sex. It did not (directly at any rate) determine your behaviour to your wife, or to your trull. In its origin, it was a devotion --part amorous and part worshipful --to a particular lady who in rank and culture was your acknowledged superior, and who was addressed normally as "madonna", but frequently also, among those Provencal poets with whom the cult started, by the masculine title "midons--my liege."

[Dante: The Divine Comedy: Purgatory; ॥ ভূমিকা, পৃ° ৩২ ॥ পেঙ্গুইন ক্লাসিকস, ১৯৫৪]

প্রভাঁসের ত্রুবাদুররা দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্সের তৎকালীন কথ্যভাষা Langue d'oc-এই তাঁদের প্রেমসংগীত রচনা করেছেন। 'ত্রুবাদুর' শব্দের অর্থ হল সন্ধান করা বা আবিষ্কার করা। তাঁরা যে সব গীতিকবিতা রচনা করতেন তার বহুবিচিত্র স্তবকবন্ধ তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁদের একটি বিশিষ্ট কলাকৃতির নাম ছিল Canso ; অবশ্য দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমস্ত প্রেমকাব্যকেই সাধারণ ভাবে বলা হত Canso। ইতালীয় ভাষায় ক্যান্সোই কান্ৎসোনে হয়েছে। ত্রুবাদুরদের

ক্যান্‌সো গঠিত হত পাঁচটি কি ছটি দীর্ঘস্তবক বা কবলায় (cobla), আর সবশেষে থাকত একটি হ্রস্বস্তবক বা তর্‌নাদা। প্রত্যেকটি কবলা ছ থেকে দ্বাদশ চরণে গঠিত হত; আদ্যোপান্ত একই ছন্দঃস্পন্দ ; এবং সব কটি স্তবকে মিলবিন্যাসের রীতি ছিল একই ধরনের। সনেটের আদিবিবর্তনে ত্রুবাদুরদের কবলা ও তর্‌নাদায় বিভক্ত এই প্রেমসংগীতের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে থাকা স্বাভাবিক। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে কবি এজরা পাউণ্ডের অনুমান-সিদ্ধান্তের মধ্যে :

The first Italian who can be said to have advanced the art of poetry is Guido Guinicelli of Bologna [১২৪০—১২৭৬] ...So far as I can discern he was the first writer to discover that a certain form of canzone stanza is complete in itself. This form of stanza, standing alone, we now call the 'sonnet.' If Guido did not invent this form, he is, at least the first who brought it to perfection.[১১]

পাউণ্ডের শেষের কথাটি সত্য নয়। গিদোর সনেটে অষ্টকবন্ধ বিবৃত ও পদান্তরপর্যায়ে মিলিত। তা ছাড়া গিদোর পূর্বেও তাঁরই মত বিবৃত অষ্টকবন্ধে সনেট আরও অনেকে লিখেছেন। উদ্ধৃত অংশে পাউণ্ড বলেছেন যে, কান্‌ৎসোনের একটি স্তবকই সনেটে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু মনে হয় প্রভাঁসের একটি কব্‌লার সঙ্গে তর্‌নাদা অথবা ইতালীয় কান্‌ৎসোনের একটি স্তবকবন্ধের সঙ্গে তারই অন্তিম হ্রস্ব-স্তবক বা Voltc-র মিলনেই সনেট চতুর্দশপদী হয়েছিল। অষ্টক-ষট্‌কবন্ধের স্বাতন্ত্র্য এবং আবর্তনসন্ধির তাৎপর্য তা হলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরবি প্রভাবের কথাও বিস্মৃত হলে চলবে না। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীতে আরব সাম্রাজ্য ভূমধ্যসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ এই উভয় মহাদেশেই মরক্কো ও পোর্তুগাল পর্যন্ত

বিস্তৃত ছিল। বিশেষ করে হারুন-অল-রশিদের পুত্র আল-মামুনের রাজত্বকালে বাগদাদ ছিল জ্ঞান ও সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যচর্চার মূলসত্র। সেদিন বাগদাদ থেকে এশিয়ার আলো ছড়িয়ে পড়েছে আফ্রিকা ও দক্ষিণ-য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে। আধুনিক য়ুরোপের কাব্যসাহিত্যে গীতিকবিতা প্রাচ্যেরই দান। য়ুরোপের প্রাচীন প্রজ্ঞাভূমি অর্থাৎ গ্রীকো-রোমক সাহিত্যে মহাকাব্য ও নাটকেরই প্রাধান্য। আধুনিক য়ুরোপ অবিমিশ্র ও বিশুদ্ধ গীতিকবিতার প্রকৃত আস্বাদন পেল আরবের কাছ থেকেই। প্রাচীন য়ুরোপের মাত্রিক কাব্য যে আধুনিক কালে আক্ষরিক-কাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে তার মূলেও আরবের প্রভাব বিদ্যমান। তা ছাড়া আরবি গজলের মিল-বিন্যাস এবং মিলের মালা গেঁথে স্তবক-গ্রন্থনরীতিও আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকবিতাকে প্রভাবিত করেছে। দান্তের Terza Rima যেমন তির্যক মিলবিন্যাসে প্রাচ্যরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত, তেমনি পেত্রার্কার সনেটও আরবি গজলের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। গজলও প্রেমসংগীত। হ্রস্বতম গজলও চতুর্দশপদী। সাতটি মুক্তবন্ধ যুগ্মকে তার ছন্দ-বিভঙ্গ। যুগ্মকের প্রথম চরণ মুক্ত। পদান্তরপর্যায়-বিন্যাসেই গজলের দ্বিতীয় চরণে সপ্তপদী মিলবন্ধন গ্রথিত। সিসিলির সারস্বত-কুঞ্জে গজলের অনুপ্রবেশ ঐতিহাসিক সত্য হলেও সিসিলি-প্রভাঁস-ইতালির ত্রিভুজ-সম্পর্ক দুর্নিরীক্ষ্য। বিগত শতাব্দীর শেষভাগে Simonde De Sesmondi 'ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দক্ষিণ য়ুরোপের সাহিত্য' নামে একখানি উল্লেখযোগ্য বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। তাতে তিনি বলেছেন,—ইংরেজি ভাষায় অনূদিত চতুর্থ সংস্করণ থেকেই উদ্ধার করছি :

From the history of Sicily, we may deduce the effects produced by Arabian influence on the Italian, or as it was

then considered, with no less certainty than that with which we trace its connection, in the country of Barcelona, and in the kingdom of Castile, with the first efforts of the Provencal and Spanish poets.[১২]

আরবীয় সাহিত্য শুধু বাগদাদ থেকেই আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকবিতাকে প্রভাবিত করে নি। স্পেনে এবং সিসিলিতেও খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রাব্দীর শেষভাগে, নবম ও দশম শতকে আঞ্চলিক আরবি সাহিত্য গড়ে ওঠে। স্পেনীয় আরব এবং সিসিলীয় আরবদের সেই গীতিকাব্যসাহিত্য আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকবিতার বিচিত্র ছাঁচ রচনায় বিশেষ প্রেরণা দিয়েছে। স্পেনীয় মুয়াশ্‌শা (Muwashshah marked by internal rhymes with a rhyming refrain) প্রভাঁসে এক সময় সমাদৃত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে এ কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে, কাব্যে মিলবিন্যাসের রীতিও প্রাচ্য-দিগন্তেরই সৃষ্টি। E. R. Curtius তাঁর 'European Literature and the Latin Middle Ages' গ্রন্থে বলেছেন :

Rhyme as foreign to the Romans as to the Germanic peoples, hesitantly taken up not bound by rule and consistency, finally developing into an ordered and miraculous splendor—is the great new creation of the Middle Ages··· The manifold possibilities of the rhymed stanza represent a whole new system of forms. পৃ° ৩৯০॥

প্রাচীন পৃথিবীতে ছন্দিত বাণীই কবিকণ্ঠের বাণী, কিন্তু কাব্যে অক্ষরের সঙ্গে অক্ষরের মিলনে যে নতুন স্পন্দন ওঠে, পুনরাবৃত্তির সঙ্গে প্রত্যাশা মিলে স্মৃতির সঙ্গে বাসনার যে গ্রন্থিবন্ধন হয়, সে আবিষ্কার প্রাচ্যের মানুষই প্রথম করেছে। সে আবিষ্কার হয়েছে আরবে, ভারতে। তারই তরঙ্গ পৌঁছেছে সিসিলির কোলে। সেখান

থেকে গিয়েছে প্রভাঁসে। তাই ছন্দ ও মিলের মিলনে আধুনিক য়ুরোপের যে নতুন গীতিকাব্য সেখানে রচিত হয়েছে তাতে সিসিলীয় আরবদের দান অবশ্য-স্মরণীয়।

বস্তুত ইতালি ভাষার প্রথম কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে সিসিলিতেই দ্বিতীয় ফ্রেডরিকের (১১৯০-১২৫০) রাজসভায়। এই কবিগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন সিসিলীয়, এবং অর্ধেকের মত তাসকান বা ফ্লোরেন্তাইন। এই সময়ে তাসকানি, সিসিলি, ফেরেরা এবং নেপল্‌স্‌-এর মধ্যে ভাষাগত প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে, অবশেষে দান্তের তাসকান বা ফ্লোরেন্তাইন অঞ্চলের ভাষাই ইতালীয় সাধু ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায়। পেত্রার্কাও ছিলেন জন্মসূত্রে ফ্লোরেন্তাইন। ফ্রেডরিকের রাজসভার কবিদের মধ্যে প্রথম থেকেই সনেটের চর্চা চলতে থাকে। Giacomo da Lentino তাদের আদি রচয়িতা। কিন্তু তাঁর অষ্টকবন্ধ ছিল বিবৃত চতুষ্কযুগলের দ্বারা গঠিত। Guittone d' Arezzo-র হাতেই সংবৃত চতুষ্কের সৃষ্টি হল। ডি. জি. রসেটি প্রাক্‌-পেত্রার্কান ইতালীয় কবিদের কাব্যের সঙ্গে ইংরেজি-পাঠকের পরিচয় করিয়েছেন তাঁর 'The Early Italian Poets' গ্রন্থে। দান্তের পূর্ববর্তী কবিবৃন্দ এবং দান্তে ও তাঁর চক্রের কবিগোষ্ঠীর কাব্যরস তাঁর সার্থক অনুবাদে ধরা পড়েছে। অবশ্য সনেট-রচয়িতা হিসাবে দান্তেই প্রথম প্রতিভাবান কবি। দান্তে (১২৬৫-১৩২১) বেয়াত্রিচের জন্যে তাঁর প্রেমকে অমর করে গেছেন তাঁর 'Vita Nuova' বা 'নবজীবন' গ্রন্থে। মহাকবি আঠারো বৎসর বয়সে এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন এবং সাতাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেমস্বপ্নের কথা এতে লিপিবদ্ধ করে যান। দান্তের 'নবজীবন' গদ্য-পদ্যময় একখানি চম্পূকাব্য। পদ্যাংশ প্রধানত সনেটে লেখা হলেও অন্যান্য পদ্যবন্ধও

তাতে রয়েছে। গ্রন্থখানি কবির আত্মবিশ্লেষণ; বেয়াত্রিচের প্রতি তাঁর প্রেমের বিচিত্র ভাষ্য কবিতাগুলির গদ্যটিপ্পনীতে বিধৃত। দান্তে যে ভাবে তাঁর সনেটগুলির ভাবগ্রন্থির বিশ্লেষণ করেছেন তাতে দেখা যায়, অষ্টক ও ষট্‌কবন্ধে লেখা হলেও অষ্টক ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধির প্রতি তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন না।[১৩] অর্থাৎ দান্তের হাতেও সনেট তার পূর্ণস্বরূপে আবিষ্কৃত হয় নি। দান্তে পৃথিবীর মহত্তম খ্রীষ্টীয় মহাকবি সন্দেহ নেই; কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর Divina Commedia বা 'দিব্যসংগীত'। 'দিব্যসংগীতে' তিনি মানবাত্মার যে মহামন্দির রচনা করে গিয়েছেন Vita Nuova বা 'নবজীবন' তার সিংহদ্বার মাত্র। এ কথা সত্য যে রোমান্স-ভাষাসমূহে, বিশেষত প্রভাঁসাল ভাষায় ত্রুবাতুরদের প্রেমসংগীতে যে কৃত্রিমতা ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছিল দান্তে তাঁর প্রেমকাব্যকে তা থেকে মুক্ত করে আত্মিক আকুতির গভীরতায় পৌঁছে দিয়েছেন। এ. সি. ওঅর্ড বলেছেন :

> It is true that the more profound spirituality of Dante gives the love element in his poetry an unfathomable profundity—a significance beyond the grasp of purely human relations, but no one questions that it is a truly divine significance.[১৪]

এখানেই দান্তের সঙ্গে পেত্রার্কার মৌলিক পার্থক্য। দান্তের প্রেম স্বর্গের সংগীত, পেত্রার্কার প্রেম মানুষের ভালবাসা। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তে এবং লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেম-স্বপ্নকে আমরা ত্রুবাতুর-প্রেমের দোসর বলেছি। জীবনে যাঁর সঙ্গে কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই, সম্ভোগমিলনে যাঁকে কখনই পাওয়া যাবে না, শুধু দূর থেকে যাঁকে দেখে জীবনের পরম পিপাসাকে তাঁরই উদ্দেশে সমর্পণ করে জীবনকে ধন্য বলে মনে হবে,

সেই মানস-সুন্দরীর স্বপ্নই উভয়ের প্রেমকে অনুরঞ্জিত করেছে। কিন্তু দান্তে তাঁর প্রেমস্বপ্নকে দিব্যজীবনের সঙ্গে গ্রথিত করেছেন। বেয়াত্রিচে শেষ পর্যন্ত তাঁর পারলৌকিক অভিসারের মূর্তিমতী প্রেরণা : 'a symbol and an assurance of his own ultimate identification with the Divine'. লরাও পেত্রার্কার মানস-সঙ্গিনী ; কিন্তু পেত্রার্কার যাত্রা মর্ত্যলোকে, মরজীবনের কান্নাহাসির গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম-তীর্থে। দান্তে ও পেত্রার্কার মধ্যে অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ের ব্যবধান। দান্তের মৃত্যুকালে পেত্রার্কা সপ্তদশবর্ষীয় যুবক। অথচ দুজনের মধ্যে দুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন যুগের বিচ্ছেদ। উইল ডুরাণ্ট তাঁর স্বকীয় বাগ্‌ভঙ্গিতে বলেছেন, 'an abyss divided their moods'।[১৫] দান্তের বাণীতে মধ্যযুগের খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস যেন শেষবারের মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আর পেত্রার্কার মধ্যে ভাষা পেয়েছে আধুনিক মানুষের প্রথম বলিষ্ঠ কণ্ঠ। ইতালীয় তথা য়ুরোপীয় রেনেসাঁস বা নবজন্মের প্রাণপুরুষ হলেন পেত্রার্কা। 'He was the father of the Renaissance'।[১৬] জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে ও সঙ্কল্পে এক আশ্চর্য বিরাট পুরুষ ছিলেন পেত্রার্কা। প্রাচীন জ্ঞানের সর্ববিধ শাস্ত্রচর্চায় তাঁর কবিমানস পরিশীলিত। অথচ জ্ঞানান্বেষণে তিনি ছিলেন আজীবন বিদ্রোহী। প্রাচীন প্রজ্ঞাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, কিন্তু অন্ধ আনুগত্য এবং তর্কশাস্ত্রের অবরোহ-সিদ্ধান্তের দ্বারা সত্যানুসন্ধান ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। অ্যারিস্টটলের বেদীতে তিনি বসালেন প্লেটোকে ; স্বীকৃতি নয়—সমীক্ষণ, আনুগত্য নয়—প্রজ্ঞার আলোকে অনুবীক্ষণই হল তাঁর মূলমন্ত্র। তাই আধুনিক পৃথিবীতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রথম ঋত্বিক হলেন পেত্রার্কা। মানুষের দৃষ্টিকে অতিপ্রাকৃত থেকে তিনিই ফিরিয়ে আনলেন প্রাকৃত জীবনের ইন্দ্রিয়বেদ্য প্রত্যক্ষতার স্তরে। তিনিই বললেন, স্বর্গ এবং স্বর্গের

দেবতা নয়, —মানুষ এবং মানুষের পৃথিবীই মানুষের বেশি আপনার। এই মর্ত্যপ্রেম ও মানবতাবাদের মন্ত্র প্রথম তাঁর বিদ্রোহী-কণ্ঠ থেকেই উচ্চারিত হল। দীর্ঘ ও দুর্গম ছিল তাঁর জীবনের পথ। বহু বৎসর তিনি এভিগ্ননে কাটিয়েছেন Papal ধর্মাধিকরণের অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাবার জন্যে। প্রায় সারা য়ুরোপটাই তিনি পরিক্রমা করেছেন দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের মত। রাষ্ট্রসম্রাট এবং ধর্মসম্রাটদের সঙ্গে ছিল তাঁর প্রজ্ঞার প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সর্বভাবেই পেত্রার্কা ছিলেন আধুনিক যুগের মানুষ। অসন্তোষ, বিষাদ এবং অতৃপ্তি—আধুনিক মানুষের এই তিনটে মনোধর্মও ছিল তাঁর অন্তরের নিত্যসঙ্গী। বস্তুত, চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক সভ্যতার উষালগ্নে মানবের নবজীবনের তোরণদ্বারে পেত্রার্কা যেন বন্ধনমুক্ত প্রমিথিউস : যে অগ্নিশিখার আলোকে প্রোজ্জ্বল হবে নবজীবনের তিমিরাভিসার তারই প্রথম অগ্নিহোত্রী তিনি।

'The first humanist and at the same time the first lyric poet of the modern school.'

তাঁর জীবনসাধনায় যেমন মানবতাবোধের নবজন্ম হল তেমনই নবমানবতার আত্মপ্রকাশ সার্থক হল সনেটের বাণীরূপের মধ্যে। তাঁর ব্যক্তিত্বের মন্থনদণ্ডে মধ্যযুগীয় য়ুরোপের গীতিকবিতার সংগীত-সমুদ্র মন্থনের ফলে কৌস্তুভের মত ভেসে উঠল সনেট-রত্নটি। পূর্বসূরিদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছিলেন, কিন্তু মণিকার যেমন হীরকখণ্ডকে আকৃতি-সৌষ্ঠব দিয়ে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে তোলে পেত্রার্কাও তেমনি ইতালির চতুর্দশপদী গীতিকবিতাকে সনেটের পূর্ণ সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেলেন। তাঁর হাতের পরিমার্জনেই সনেটের কলাকৃতি শিল্পসুষমায় ভাস্বর হয়ে উঠল,

এবং ভারতীর কণ্ঠাভরণে এই ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডটি বিচিত্রমুখে মণিদীপ্তি বিচ্ছুরিত করে সারস্বতমাত্রেরই কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।

পেত্রার্ক যেমন একদিকে ছিলেন জীবন-যজ্ঞশালায় বিদ্রোহী বিশ্বামিত্র, অন্য দিকে তেমনই তিনি ছিলেন সারস্বত-সত্রের সংযমসুন্দর চারুশিল্পী। তাঁর সৌন্দর্যের সহজাত সূক্ষ্ম-চেতনা কাব্য ও সংগীত-শাস্ত্রের চর্চায় পরিশীলিত ছিল। কণ্ঠ ও যন্ত্রের ধ্বনিসংগীতে তাঁর অধিকার ছিল প্রগাঢ়, ভাল lute বাজাতে পারতেন। তা ছাড়া শব্দ ও শব্দগুচ্ছ এবং ছন্দঃস্পন্দের শ্রুতি ছিল তাঁর অসামান্য। চিদ্‌বৃত্তির মত তাঁর হৃদ্‌বৃত্তিও ছিল সূক্ষ্ম ও সুকুমার। অনুভূতিতে যা ধরা দিয়েছে তাকে যথাযথ বাণীরূপে সাকার করে তুলবার প্রেরণা ছিল তাঁর ক্লান্তিহীন। কাব্যপ্রকাশের প্রথম উচ্ছ্বাসকে বার বার পরিমার্জিত করে সূক্ষ্ম চারুতায় পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর কবিমানস কিছুতেই পরিতৃপ্ত হত না।[১১] তাই তাঁর সনেটের কলাকৃতিতে এসেছে পরিশীলিত কবিকর্মের সৌকুমার্য। কোমল স্বরধ্বনির ঐশ্বর্যে ইতালীয় বাগ্‌দেবী মঞ্জুভাষিণী। সে ঐশ্বর্যের সুমিত প্রয়োগে পেত্রার্ক ছিলেন বাণীর বরপুত্র। একটি সংবৃত যুগল-চতুষ্ক এবং একটি যুগল-ত্রিকবন্ধে যেমন তিনি আত্ম-প্রকাশের সংহত রূপটিকেই বরণ করে নিলেন, তেমনই শিল্পের সুচারু বন্ধনে কাব্যপ্রকাশের আবেগকে বেঁধে আবার শিল্পের নিয়মেই তাকে মুক্তি দিলেন সহৃদয়-সামাজিকের অসীম চিত্তাকাশে। সংস্কৃতির পরিশীলনে আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংযমই তাঁর স্বভাবধর্ম ছিল, তার সঙ্গে শিল্পের সংযম মিলিত হয়ে মণিকাঞ্চন-যোগ রচনা করেছে। এবং তারই ফলে তাঁর হাতে দেখা দিয়েছে সনেটের মিশ্রসঙ্গতি। ইতালীয় সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক E. H. Wilkins বলেছেন :

The undying fame of Petrarch's Italian lyrics rests upon their blending of an inner with an outer beauty—the inner beauty of a sensitive, imaginative, and refleeting response to finely discriminated shadings of emotions, the outer beauty of a verbal and rhythmical artistry that has never been surpassed.

ভাষার সঙ্গে ছন্দের, মিলের সঙ্গে সংগীতের, সর্বোপরি ভাবের সঙ্গে শিল্পের এই দুর্লভ সঙ্গতির ফলে পেত্রার্কার হাতে নবজীবনের যে কাব্যরূপ গড়ে উঠল, য়ুরোপীয় নবজন্মের অভ্যুদয়দিগন্তের দিকে যাঁরাই দৃষ্টিপাত করেছেন তাঁরাই সেই কাব্যরূপের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেন নি। রেনেসাঁস বা নবজন্মের প্রাণপুরুষ যিনি তাঁর কণ্ঠে নবজীবনের গান যে কলাকৃতি পেল তাই হল নতুন দিনের ভাবপ্রকাশের নববাহন। তাই সনেট হল আধুনিক গীতি-কবিতার একটি সার্থক শিল্পরূপ।

৩

ইতালিক্ষেত্রে য়ুরোপের সাংস্কৃতিক নবজন্মের পর ইতালি য়ুরোপীয় সারস্বতবৃন্দের মানসতীর্থ হয়ে উঠল। সংস্কৃতি-চর্চা ও শিল্পানুশীলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতালীয় আদর্শ অনুসৃত ও অনুকৃত হতে লাগল। কাব্যলোকে আধুনিক গীতিকবিতার সার্থক বাহন হিসাবে বিভিন্ন দেশে সনেটেরই সমাদর হল সব চেয়ে বেশি। স্পেনে সনেটের প্রবর্তক হলেন বস্‌কান্‌। য়ুরোপে এক সময় সনেট-রচনা এত সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল যে, আবেগপ্রবণ স্পেনীয় জাতির কাব্যরসিক সমাজে একটি কৌতুক-বাক্য প্রায় প্রবচনের মতই প্রচলিত হয়েছিল: 'যে একটিও সনেট লিখতে পারে

না সে নির্বোধ, অবশ্য যে তুটি লেখে সে উন্মাদ।' পোর্তুগালে সনেটকে নিয়ে যান কামোয়েন্স্, ফ্রান্সে ক্লেমাঁ মারো (১৪৯৬-১৫৪৪)। এঁর হাতেই সনেটে ফরাসি প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অবশ্য প্লেইয়াদ্ কবিগোষ্ঠীই সমবেতভাবে সনেটের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ দেখান এবং তাঁদের মধ্যে পিয়ের দ্য রঁসার-এর বৈশিষ্ট্যে ফরাসি সনেট নিজস্বতা পায়। তবে দ্যু ব্যালের অলিভ সনেটগুচ্ছ (১৫৪৯-৫০) ইতালির বাইরে সনেট-পরম্পরার প্রথম উৎকৃষ্ট নিদর্শন। জর্মনিতে সনেট প্রবেশ করে ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু রোমান্টিক যুগেই তার সুন্দরতম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। শ্লেগেল, গ্যয়টে, আর্নিম, হাইজ, আইখেনদর্ফ ও রেডউইশ হলেন উল্লেখযোগ্য জর্মন সনেটকার।

ইংরেজি সাহিত্যেও সনেটের আবির্ভাব ঘটে ষোড়শ শতাব্দীতে। সার্ টমাস ওয়াট (১৫০৩-১৫৪২) এবং হেন্‌রি হাওয়ার্ড, আর্ল অব সারে (১৫১৭-১৫৪৭)—এঁরা দুজনেই ইংরেজি সাহিত্যের আদি সনেটকার। টমাস ওয়াট ইতালিতে কূটনৈতিক কার্যে ব্যাপৃত হয়ে সেখানকার সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং ইংলণ্ডে সনেট-রচনার রীতি প্রবর্তন করেন। ওয়াট পেত্রার্কার মিলবন্ধনই মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেছিলেন, তবে ষট্‌কবন্ধের শেষে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মক বা Rhymed Couplet-এর দিকেই ছিল তাঁর প্রবণতা। সারে কিন্তু তিনটি বিবৃত চতুষ্কের পরে একটি যুগ্মক দিয়ে সনেটরচনার রীতি ইংলণ্ডে প্রবর্তন করে দিলেন। পদের দৈর্ঘ্য নিয়ে ইংরেজি সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছু কিছু হয়েছে। আলেকজান্দ্রাইন বা ষট্‌পর্বের দ্বাদশাক্ষর পদ মধ্যে মধ্যে প্রাধান্য পেলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজি সনেটে আয়াম্বিক পঞ্চপর্বের দশাক্ষর পদই স্থায়ী হয়েছে।

প্রাথমিক স্তর পেরিয়ে যাবার পর এলিজাবেথীয় যুগে বহু সনেট

এবং সনেটকল্প রচনা ইংরেজি সাহিত্যে হয়েছিল। এবং সে যুগেই কলাকৃতি হিসাবে সনেটের চরম বিকৃতি ঘটে। সে যুগের সনেট শেক্‌স্‌পীয়রের নামে নামাঙ্কিত। তথাকথিত শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেট অষ্টক-ষট্‌ক পদ্ধতি সম্পূর্ণই বর্জন করে, এবং তিনটি বিবৃত চতুষ্কের পর একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে তার রূপসৃষ্টি হয়। তার মিল-বিন্যাস মোটামুটিভাবে এই ধরনের : ক চ ক চ ; গ জ গ জ ; ত প ত প ; ম ম॥ স্পেন্সার আবার তিনটি বিবৃত চতুষ্কের মধ্যে এক ধরনের মিলের বেণীবন্ধনের চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মিলবিন্যাস ছিল : ক চ ক চ ; চ জ চ জ ; জ ত জ ত, ম ম॥ স্পেন্সার 'ইংলণ্ডের পেত্রার্কা' বলে অভিহিত হলেও মিলবিন্যাসের দিক দিয়ে তাঁর উত্তরসূরিদের কাছে বিশেষ সমর্থন পান নি। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেট ইংরেজি সাহিত্যে আজও অনুকৃত হয়। বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ইংরেজ সনেটকার রুপার্ট ব্রুক শেক্‌স্‌পীয়রেরই অনুগামী। পূর্বেই বলা হয়েছে, আসলে শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতির সনেটের প্রবর্তক শেক্‌স্‌পীয়র নন, সারের হাতেই এই রীতি প্রথম গড়ে ওঠে। ষোড়শ শতকের ডেনিয়েল ড্রেটন প্রমুখ অনুল্লেখযোগ্য কবিরা এই 'সহজ'-রীতির 'রোমান্টিক সনেট' নিয়েই কাব্যের পসরা সাজিয়েছিলেন। শেক্‌স্‌পীয়র এই প্রচলিত রীতিকেই গ্রহণ ক'রে তাঁর সনেট-পরম্পরা রচনা করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মিলটন ইংরেজি সনেটের এই দুর্গতি থেকে সনেটকে উদ্ধার করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দান্তে-পেত্রার্কার ইতালীয় রীতি অর্থাৎ অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের পুনঃপ্রবর্তনের প্রয়াসী হন। কিন্তু তাঁর সনেটে অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধি অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট। তাই ইংরেজি সাহিত্যে 'মিলটনীয় সনেট' নামে সনেটের আরেক প্রকারভেদ করা হয়েছে, তাতে দুটি মিলের দুটি সংবৃত চতুষ্ক এবং দুটি কি তিনটি মিলের ত্রিকযুগলের দ্বারা সনেট-কাঠামো তৈরি হয়। কিন্তু তাতে

সনেটের মুখ্য অঙ্গসন্ধি অর্থাৎ আবর্তন-সন্ধি প্রায়ই অনুপস্থিত। মিলটনের কয়েকটি সনেটে অষ্টকবন্ধের পরে ভাবযতি আবিষ্কৃত হয়েছে বটে, কিন্তু তা কবির সচেতন শিল্পপ্রয়াসের ফলেই গড়ে উঠেছে মনে হয় না। অন্তত তাঁর একাধিক কবিতায় আবর্তন সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষিত হয় নি। কিন্তু 'প্যারাডাইস লস্টে'র মহাকবি আটাশ বৎসরে মাত্র চব্বিশটি সনেট রচনা করেই যশস্বী হয়েছেন; তার কারণ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ মহৎ ভাবের বাহন হিসাবে সনেট তাঁর হাতেই ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম পূর্ণমর্যাদা পেল। 'In his hands the thing became a trumpet, when he blew soul-animating strains'. মিলটনের পরে ইংরেজি সাহিত্যে ফরাসি-প্রভাব দেখা দেয়। কাজেই পরবর্তী যুগের সনেট ইতালি-ফরাসি যুগ্মপ্রভাবেই রচিত হয়। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর নিষ্ঠাবান ইংরেজ সনেটকারগণ সনেটের পেত্রার্কান গোত্রটি রক্ষার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। এ যুগে ওয়ার্ডসওয়ার্থই পরিমাণে ও গুণে শ্রেষ্ঠ সনেটকার। সবশুদ্ধ ৫৫৩টি সনেট তিনি একাই লিখেছেন। ইংরেজি সাহিত্যে উনবিংশ শতাব্দীতে জন কীটস, ব্রাউনিং-জায়া এলিজাবেথ ব্যারেট এবং ডি. জি. রসেটিও কুশলী সনেটশিল্পী।

এই প্রসঙ্গে একথা বলা প্রয়োজন যে, ষোড়শ শতকের চতুর্থ দশকে ইংলণ্ডে প্রথম সনেট-কলাকৃতির প্রবর্তন হয়। সেই থেকে গত চারশ বৎসরের কিঞ্চিদধিক কালের মধ্যে ইংরেজি সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা কবিদের প্রায় সবাই ইতালীয় তথা পেত্রার্কান রীতিকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। ষোড়শ শতকে ওয়াট ও সিড্‌নি, ষোড়শ-সপ্তদশের সন্ধিলগ্নে ডান্, সপ্তদশে মিলটন, অষ্টাদশে গ্রে ও কূপার, উনবিংশ শতকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, লী হান্ট, এলিজাবেথ ব্যারেট, ম্যাথু আর্নল্ড, ডি. জি. রসেটি,

ক্রিশ্চিনা রসেটি ও সুইনবার্ন এবং উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে টমাস হার্ডি, এনড্রু ল্যাং ও রবার্ট ব্রিজেস—এঁদের সবারই শ্রেষ্ঠ সনেট পেত্রার্কান রীতিতে রচিত। এই চারশ বৎসরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন আদিযুগে সারে ও শেক্‌স্‌পীয়র এবং উনিশ ও বিশ শতকে কীটস ও রুপার্ট ব্রুক। স্পেন্সার তাঁর নিজস্ব রীতির স্রষ্টা, আর কীটস যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বদেশী রীতির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন, কিন্তু পেত্রার্কান রীতিকেও তিনি বর্জন করেননি। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, সনেট-রচনায় কলাকোবিদ কবিমাত্রেই ক্ল্যাসিকাল্ তথা পেত্রার্কান রীতিকেই বরণ করেছেন, রোমান্টিক তথা দেশী রীতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে উৎসাহিত হন নি।

তথাপি শিল্পক্ষেত্রে কলাকৃতির বিবর্তন সমর্থনযোগ্য। কাব্য-কৌশল-কলায় কুশলী কলাকারমাত্রেই নব নব রূপসৃষ্টিতে আনন্দ পেয়ে থাকেন। তাতে শিল্পলোকে নব নব রীতি ও রূপবৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটে। ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে বলা যায় যে, মার্গসংগীতকে ভেঙে ভেঙেই পরবর্তী যুগে নব নব ঢং ও সুরের সৃষ্টি হয়েছে। কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসেও বিভিন্ন দেশে ক্লাসিক্যাল সনেট থেকে চতুর্দশপদী কবিতার নানা রূপ ও রীতির উদ্ভব হয়েছে। সনেটকল্প এই সব কলাকৃতি প্রতিভাবান কবির হাতে উৎকৃষ্ট কাব্যের বাহনও হয়েছে। কিন্তু সংগীতশাস্ত্রে মার্গসংগীতের যে আসন বিভিন্ন ধরনের সনেট ও সনেটকল্প রচনাবলীর মধ্যে পেত্রার্কান সনেটেরও সেই আসন। ইংরেজি সাহিত্যে শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতি যে এতটা মর্যাদা পেয়েছে তার প্রধান কারণ সেগুলির রচয়িতা হলেন শেক্‌স্‌পীয়র। আর, একথা সর্বকালে সর্বদেশেই স্বীকৃত যে, শেক্‌স্‌পীয়রই ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ সারস্বত-প্রতিভা। তাই শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেটের কলাকৃতি

ও কাব্যমূল্য সম্পর্কে একটু বিচার-বিশ্লেষণ সনেট-সমালোচনার ক্ষেত্রে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক।

ইংরেজি সাহিত্যে সনেট-রচয়িতা হিসাবে শেক্‌স্‌পীয়রের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ও প্রশস্তিবাচন যেমন প্রচুর হয়েছে নিন্দাও তেমনি নিতান্ত অল্প হয়নি। শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেটের কলাকৃতির প্রশংসায় উইলিয়ম শার্পের উক্তিই সবচেয়ে বলিষ্ঠ :

The Shakespearean sonnet is like a red-hot bar being moulded upon a forge till—in the closing couplet—it receives the final clinching blow from the heavy hammer.

তিনটি বিবৃত চতুষ্কের পরে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট-রচনার শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিকে এখানে শার্প দক্ষতার সঙ্গেই বিশ্লেষণ করেছেন, কিন্তু পেত্রার্কান সনেটের সূক্ষ্ম ও সুকুমার কলাবিলসনের সঙ্গে এই ব্রাত্য রীতির যে কোনোদিক দিয়ে তুলনাই হয় না সেকথা শার্পের ওকালতিতে চাপা পড়ে গেছে। আর যাই হোক্, কর্মকারের হাতুড়ি পিটিয়ে পেত্রার্কার 'Small lute' বাজানো কিছুতেই সম্ভব নয়!

শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেটের কাব্যোৎকর্ষ নিয়ে সুভাষিত সদুক্তি মালার অন্ত নেই। লেগুই বলেছেন, এই সনেটগুচ্ছ এলিজাবেথীয় গীতিকাব্যের মহার্ঘতম মুক্তাবলী ; কয়েকটি তো গীতিকবিতা হিসাবে অনতিক্রম্য।[১৮] এমার্সনের মতে, তাঁর নাটকের মতই এগুলিও অননুকরণীয়।[১৯] কিন্তু ইংরেজ সাহিত্যরসিকদের মধ্যেও অনেকেই আছেন যাঁরা সে সম্পর্কে বিপরীত মত পোষণ করেন। Ashcroft Noble শেক্‌স্‌পীয়রীয় সনেট সম্পর্কে বলেছেন, 'the rank they hold is such that to ignore them is impossible, and to treat them adequately not less so'। ডক্টর জনসনের বিখ্যাত উক্তির পুনরুদ্ধার করা নিষ্প্রয়োজন, তাঁর মতে ইংরেজি

ভাষায় হলন্ত-শব্দের এত বৈচিত্র্য, এবং মিল হিসাবে তাদের দাবি এত দুর্লঙ্ঘ্য যে, মাত্র চারটি বা পাঁচটি মিলে চতুর্দশপদী একটি কবিতা লেখা ইংরেজি ভাষায় অসম্ভব। সেই জন্যেই 'the fabric of a sonnet has never succeeded in ours, which, having greater variety of termination, requires the rhymes to be often changed'। কিন্তু জনসনের এই উক্তি যে সমর্থনযোগ্য হতে পারে না, ওয়ার্ডসওয়ার্থ একাই সাড়ে পাঁচ-শ'র বেশি স্বল্পমিলের সনেট লিখে তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন। শেক্স্পীয়রের সনেট সম্বন্ধে মার্ক পেটিসনের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি সত্যান্বেষী। পেটিসন প্রথমেই একটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। সনেট একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। কিন্তু শেক্স্পীয়রের সনেটের সে স্বয়ংসম্পূর্ণতা নেই। মূলতঃ তাঁর সনেটগুলি সনেট-পরম্পরা বা Sonnet Sequence-এর এক-একটি স্তবকবন্ধে পর্যবসিত হয়েছে। সনেটের ধ্বনি ও অর্থ অর্থাৎ বাগর্থসম্পৃক্তির যে সঙ্গতি, শেক্স্পীয়রের সনেটে তা কদাচিৎ রক্ষিত হয়েছে : 'Shakespeare required freedom, and when free, he spoke English such as no other Englishman ever had skill to utter. But the Sonnet's narrow bounds demand condensation'! শেক্স্পীয়রের পক্ষে সে ঘনীকরণ কখনই সম্ভব হয় নি। তৃতীয়ত, সনেটে শেক্স্পীয়র চলতি ফ্যাশনেরই অনুকরণ করেছেন। বিষয়বস্তুতে যেমন 'reigning fashion of ingenious distortions' তাঁর রচনায় অনুকৃত হয়েছে, মিলবন্ধনেও তেমনই ডেনিয়েল-অনুসৃত চোদ্দ পদে সাতটি মিলের রীতিই তিনি চোখ বুজে গ্রহণ করেছেন।[২০]

পেটিসনের এ বিশ্লেষণ যুক্তিগ্রাহ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু এর পরেও শেক্স্পীয়রীয় সনেটের কাব্যমূল্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলবার

থাকে। শেক্‌স্‌পীয়রের নামাঙ্কিত সনেটের সংখ্যা ১৫৪। তার মধ্যে প্রথম একশ ছাব্বিশটি কবির জনৈক যুবকবন্ধুর উদ্দেশে লেখা। পরের ২৬টি জনৈকা অসিতাঙ্গী রমণী বা Dark Lady বা Black Woman-এর উদ্দেশে এবং শেষ দুটি, প্রচলিত রীতিতে কামদেবতা কিউপিডের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রথমাংশের কবির যুবকবন্ধু তাঁর প্রাণবঁধু, প্রেমাস্পদ ও পৃষ্ঠপোষক। প্রথম সতেরোটি সনেটে কবি তাঁর সুন্দর বন্ধুকে বিবাহে অনুপ্রাণিত করছেন। বিবাহের উদ্দেশ্য, সম্ভব হলে অন্ততঃ দশটি সন্তানের মধ্যে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। বন্ধুর উদ্দেশে লেখা বাকি সনেটগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে নানা ঘটনা ও বিষয় অবলম্বনে রচিত। ধীরে ধীরে বন্ধুসান্নিধ্য আসঙ্গলিপ্সায় পর্যবসিত হয়েছে। যুবকবন্ধুটি সুন্দর কিন্তু রমণীর মতই কমনীয়কান্তি। প্রথমে তাঁর উপস্থিতিতে কবির কণ্ঠে কথা হারিয়ে যায়, তিনি শুধু লিখেই নিজের মনোভাব প্রকাশে সমর্থ। দেশ-ভ্রমণের ফলে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি হয়, অন্যান্য কবিরা তাঁর বন্ধু-ভর্তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্যে চক্রান্তজাল বিস্তার করে; কিন্তু বিরহী কবি অনুক্ষণ বন্ধু-চিন্তায়ই নিমগ্ন। অবশেষে যুবকবন্ধু কবির রক্ষিতাকে অপহরণ করে নিয়ে যান, কিন্তু তবু কবির অনন্ত ক্ষমা। প্রাণবঁধুর ছবি বুকে নিয়ে তিনি প্রবাসভ্রমণে বহির্গত হলেন। তারপর অনতিদীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে পুনর্মিলন এবং অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ খণ্ডনের জন্যে আত্মপক্ষ সমর্থন। যে অসিতাঙ্গীকে ছাব্বিশটি সনেট কবি নিবেদন করেছেন সেই রমণী বিশ্বাসঘাতিনী, স্বৈরাচারিণী, সৌন্দর্যহীনতার ফলে অনাকর্ষণীয়া, তবু তিনি অপ্রতিরোধনীয় ভাবে কবির নিত্যবাঞ্ছিতা প্রিয়বল্লভী।[২১]

আর যাই হোক, বিষয়বস্তু হিসাবে সনেটগুলি মহৎ অনুভূতির প্রেরণা নিয়ে আসে নি। এগুলি অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত মনের অন্ধ গলিঘুঁজির ক্লিন্ন ও ক্লেদাক্ত পরিবেশে ঊনমানবের কলুষিত আত্মাকে

বহন করে চলেছে। ইংলণ্ডের তৎকালীন সমাজের যে-চিত্রই ওতে থাক, আর রসমোক্ষের দিক দিয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক ভাষ্যই ওর করা হোক, তা যে পেত্রার্কান সনেটের সুচারু কলাকৃতির যোগ্য নয় সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বলেছিলেন, 'With this key Shakespeare unlocked his heart'; তার উত্তরে ব্রাউনিঙের বক্রোক্তি আমরা ভুলতে পারি নে, এই যদি শেক্‌স্‌পীয়রের রুদ্ধদ্বার হৃদয়ের পরিচয় হয় তা হলে যে পরিমাণে তিনি হৃদয়ের দ্বার মুক্ত করেছেন সে পরিমাণেই তাঁর শেক্‌স্‌পীয়রত্বের হানি হয়েছে। তা ছাড়া সনেট-হিসাবে নয়, শুদ্ধমাত্র কাব্যহিসাবেই কি সনেটগুলি শেক্‌স্‌পীয়রের প্রতিভার যোগ্য নিদর্শন?

এলিজাবেথীয় যুগের একজন অখ্যাত কবি ছিলেন ড্রেটন। বয়সে শেক্‌স্‌পীয়রের এক বৎসরের বড়। শেক্‌স্‌পীয়রের সমসাময়িক ইংরেজি কাব্যের উৎকর্ষ বিচারের জন্যে ড্রেটনের 'A Parting' সনেটটি এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

Since there's no help, come, let us kiss and part,—
Nay, I have done, you get no more of me;
And I am glad, yea, glad with all my heart,
That thus so cleanly I myself can free:
Shake hands for ever, cancel all our vows,
And when we meet at any time again,
Be it not seen in either of our brows
That we one jot of former love retain.

Now at the last gasp of Love's latest breath,
When, his pulse failing, Passion speechless lies,
When Faith is kneeling by his bed of death,
And innocence is closing up his eyes,—
Now, if thou would'st, when all have given him over,
From death to life thou might'st him yet recover.

এই কবিতায় হতাশ-প্রেমিকের যে সুন্দর আবেগ স্বচ্ছন্দ প্রসাদগুণে মণ্ডিত হয়েছে শেক্‌স্‌পীয়রের সনেটে তা পাওয়া যায় না। শেক্‌স্‌পীয়র মানবজীবনের মহাকবি সন্দেহ নেই। জীবনের চরম নাটকীয় মুহূর্তে নরনারীর কণ্ঠে যে গভীরতম আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে শেক্‌স্‌পীয়র সে আবেগের সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীকার। কিন্তু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁর দেড়শতাধিক সনেট তাঁর প্রতিভার মর্যাদা বহন করে না।

তার কারণ তাঁর সনেটগুচ্ছে মানবচিত্তের মহাকাশ নয়, তার কলুষক্লিন্ন পাতালরহস্যই উন্মীলিত হয়েছে। তাঁর সনেটগুচ্ছের পশ্চাৎপটে যে জীবনদর্শনের প্রেরণা রয়েছে তা দান্তে-পেত্রার্কার জীবনদর্শনের সম্পূর্ণ বিরোধী। দান্তে-পেত্রার্কার প্রেরণামূলে রয়েছে সেই নারীশক্তির প্রভাব যে-শক্তি মানবজগৎ ও নিসর্গজগতের মধ্যে একটি রহস্যময় যোগসূত্ররূপে বিরাজমান। যাকে পরবর্তীকালে 'পেত্রার্কান প্লেটোনিজম্' বলা হয়েছে সেই হৃদয়াবেগের উৎস-স্বরূপিণী নারী চিরবসন্ত ও বিশ্বজনীন পুনর্জন্মের অধিনেত্রী দেবী,—'the mistress of spring and universal rebirth'। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের সনেটে রয়েছে হোরেস ও ওভিদ-প্রচারিত 'Carpe diem'-তত্ত্ব। 'Devouring Time', অর্থাৎ সর্বগ্রাসী কালের কবলে সৃষ্টবস্তুমাত্রেই কবলিত হচ্ছে। 'ভূতানি কালঃ পচতি।' এই কালের কবল থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র পথ হল সন্তানের মধ্যে বংশানুক্রমে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। সৃষ্টিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই আত্মবিবর্ধনবাদ—এই 'doctrine of Increase'ই বন্ধুকে লেখা শেক্‌স্‌পীয়রের সনেটগুচ্ছের মূলকথা। 'From fairest creatures we desire increase.' কিন্তু এদিক দিয়েও মৌলিকতার কোনো দাবিই তাঁর থাকতে পারে না। আত্মবিবর্ধনের উদ্দেশ্যে প্রাণবঁধুকে উদ্বাহবন্ধনে উৎসাহিত করে কবিতা-রচনার রীতি এর

বহু পূর্ব থেকেই য়ুরোপে প্রচলিত। বিখ্যাত জর্মন পণ্ডিত Wolff তাঁর 'Petrarchism and anti-Petrarchism in Shakespeare's sonnets' নিবন্ধে Leonora Sanvitale-কে লেখা তাসোর [Tasso] কাব্যের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন।[২২] লেভারও তাঁর 'এলিজাবেথান লভ সনেট' গ্রন্থে শেক্‌স্‌পীয়রের এই ভাবের উৎস হিসাবে আরো দু-একটি সূত্রনির্দেশ করেছেন।[২৩] য়ুরোপীয় নবজন্মের পরে বন্ধুপ্রীতিকে কামগন্ধহীন প্লেটোনিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা রূপে প্রচার করে কাব্যরচনার রীতিও বিভিন্ন দেশে প্রবর্তিত হয়। ইতালীয় কাব্যে এই বিষয় নিয়ে বহু সনেট রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে Tommaso de' Cavellieri-র উদ্দেশে লেখা শিল্পী-কবি মাইকেলেঞ্জেলোর সনেটগুচ্ছই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়রের সনেটগুচ্ছে মাইকেলেঞ্জেলীয় বন্ধুসৌন্দর্যমুগ্ধ নিষ্কলুষ প্রেমের আকাশচারিতা নেই। শেক্‌স্‌পীয়র যাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন 'O thou my lovely Boy' তিনি সাদাম্‌টনের আর্লই হোন্ আর উইলিয়ম হলই হোন্, তাঁর প্রতি শেক্‌স্‌পীয়রের আকর্ষণ সমকামুকত্বের কলুষমুক্ত ছিল বলে প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। 'No longer mourn for me when I am dead',—বন্ধুর উদ্দেশে লেখা এই কবিতায় উচ্চারিত মৃত্যুবাসনা কামমোহিত ব্যর্থপ্রেমিকের নৈরাশ্যচেতনা থেকেই উদ্ভূত।

সনেটগুচ্ছের দ্বিতীয়াংশে অসিতাঙ্গী রমণীর প্রেমপ্রসঙ্গে এসে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে, শেক্‌স্‌পীয়র জৈব আকর্ষণকে নিয়ে কোনো অবাস্তব সৌন্দর্যস্বপ্ন রচনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। 'My mistress' eyes are nothing like the Sun'—এই সনেটে তিনি নারী-সৌন্দর্যকে নিয়ে পেত্রার্কীয় বন্দনাগীতির প্রতি বক্রোক্তিকারের কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন। তাছাড়া তাঁর 'lovely Boy' যখন তাঁর এই কামসঙ্গিনীকে হরণ করে নিয়ে গেলেন তখন প্রেয়সী ও প্রিয়-

বন্ধুর আচরণ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গিও বস্তুজগতের বোঝাপড়া ও লাভালাভের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। Wolff দেখিয়েছেন যে, একই নারীর প্রতি দুই পুরুষের অনুরূপ প্রণয়াকর্ষণের ব্যাপার তোস্কো ও আলামন্নির বেলাও ঘটেছিল, এবং আলামন্নি তা নিয়ে কাব্যও রচনা করেছেন।

নারীর উদ্দেশ্যে রচিত সনেটগুচ্ছ সম্পর্কে শেক্‌স্‌পীয়রের প্রশস্তিকারগণও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে পারেন নি। এলিজাবেথীয় সনেট সম্পর্কে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সংকলনে সিড্‌নি লী-লিখিত ভূমিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। এই সম্পর্কে তার পরেই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য আলোচনা হল ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত J. W. Lever-এর 'The Elezabethan Love Sonnet' গ্রন্থখানি। এই সুলিখিত গ্রন্থের শতাধিক পৃষ্ঠা জুড়ে লেভার শেক্‌স্‌পীয়রের সমর্থনে তাঁর প্রশংসনীয় বিশ্লেষণীশক্তি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু প্রেয়সী-প্রসঙ্গে এসে তাঁকেও বলতে হয়েছে .

It is strange that the Mistress is frequently thought of as a painted courtesan, black as sin, but daubed and dyed with cosmetics, exercising an irresistible sensual appeal.

[পৃ° ১৭৬

... the Poet rationalizes his relationship at its lowest level.

When my love swears that she is made of truth,
I do believe her, though I know she lies.

[পৃ° ১৭৮

On this new basis of mutual mistrust the idyll is resumed, and with tongue in the cheek the Poet commends it as an example to others :

Therefore I lie with her and she with me,
And in our faults by lies we flattered be. [পৃ° ১৭৮

Moral nihilism passes over into deliberate obscenity in CLI where the Poet answers a reproach from the mistress that he lacks 'conscience'.

[পৃ০ ১৭৮

To the Nadir of the spiral belongs the masochistic satire of the 'Will' sonnets, cxxxv and cxxxvi. Courtship has become a joyless mating of human animals in rut.... ...Both Poet and Mistress are reduced to featureless sex-partners, the forerunners of Apeneck Sweeney and the Lady in the Cape.

[পৃ০ ১৭৯

বলাই বাহুল্য, নরনারীর এই অধোগামী ও অসুন্দর সম্পর্ক-চেতনা থেকে মহৎ কাব্যের জন্ম হতেই পারে না। কাজেই প্রেমকাব্য হিসাবে শেক্‌স্‌পীয়রের সনেটগুচ্ছ অতি নিকৃষ্ট স্তরের রচনা, এবং বন্ধুপ্রীতির কাব্য হিসাবেও তা কলুষমুক্ত নয়। কিন্তু বিষয়ালম্বন যাই হোক না কেন, শেক্‌স্‌পীয়রের মত মহাকবির হাতে ধূলিমুষ্টিও স্বর্ণমুষ্টি হয়ে ওঠে। সর্বগ্রাসী কালের স্বরূপচিন্তনে তাঁর প্রকাশভঙ্গি যেমন বলিষ্ঠ তেমনি চিত্তাকর্ষক। 'When forty winters shall besiege thy brow,' 'Shall I compare thee to a Summer's day?' 'Not marble, nor the gilded monuments,' 'Like as the waves make towards the pebbled shore,' প্রভৃতি কবিতা চিরদিনই শেক্‌স্‌পীয়রের উজ্জ্বল স্বাক্ষর গৌরবের সঙ্গে বহন করবে। এই সব কবিতার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখেই লেভারবলেছেন, 'Indeed there are no English sonnets to compare with them in imaginative range and intellectual power'. অবশ্য এ সব ক্ষেত্রেও কবি ভাবের দিক দিয়ে পূর্বসূরিদের নিকট ঋণী। 'Like as the waves make towards the pebbled

shore'-এর মত অতুলনীয় কবিতাও যখন শুধু ভাবানুষঙ্গই নয়, রূপকল্পের দিক দিয়েও, ওভিদকে স্মরণ করিয়ে দেয় তখন সমালোচকগণ বলতে বাধ্য হন যে, 'in literature, it is not the originality of the theme that counts as much as the manner in which the poet has relived it'. শেক্‌স্‌পীয়র মুখ্যত নাট্যকার। তাঁর কবিপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োজিত হয়েছে নাট্যকলাসৃষ্টিতেই। নাটক রচনার অবসরে তিনি সনেটগুলি লিখেছেন। প্রচলিত রীতি ও বিষয়বস্তু অবলম্বন করেই তাঁর সনেটগুচ্ছ বিরচিত। শেক্‌স্‌পীয়র-জীবনীকার সিড্‌নি লী বলেছেন যে, সমকালীন ইংরেজি, ফরাসি ও ইতালীয় রচনাবলীর কথা চিন্তা করলে শেক্‌স্‌পীয়রের কৃতিত্ব রচনাকুশলতার চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে হয় না—Shakespeare's performances prove to be little more than trials of skill.[২৪]

কিন্তু কাব্য হিসাবে শেক্‌স্‌পীয়রের কয়েকটি সনেটের উৎকর্ষ সর্বজনস্বীকৃত হলেও সনেট-কলাকৃতির বিচারে সেগুলি নগণ্য। পেত্রার্কান রীতিকে তিনি গ্রহণ করেন নি, সুতরাং অষ্টক-ষট্‌কবন্ধে ভারসাম্য রক্ষা করে ভাবের আসক্তি-মুক্তি-লীলার শিল্পায়ন তাঁর কাছে প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু এনিড হেমার যে লক্ষণটিকে সার্থক-সনেট-বিচারে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন 'the maintenance of an unbroken artistic elevation'[২৫] —শেক্‌স্‌পীয়রের সার্থকতম সনেটেও তা কদাচিৎ রক্ষিত হয়েছে। 'Like as the waves' সনেটের অন্তিম মিত্রাক্ষর-যুগ্মকটির প্রতি লক্ষ্য করলেই আমাদের বক্তব্য প্রমাণিত হবে। কবিকল্পনার যে তুঙ্গশিখরে কবিতাটির আরম্ভ অন্তিম-যুগ্মকে শুধু যে সেই শিখর থেকেই কবি বিচ্যুত হয়েছেন এমন নয়, একেবারে anti-climax-এ অবনীত হয়েছেন। মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সনেট-রচনার উপসংহার কেন বাঞ্ছিত নয় শেক্‌স্‌পীয়রের

সনেটগুলিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সনেট হিসাবে শেক্‌স্‌পীয়রীয় 'সহজিয়া পদ্ধতি' মন্দ-কবিযশঃপ্রার্থীদের পক্ষে যতই লোভনীয় হোক না কেন, ইংলণ্ডের খ্যাতিমান অভিজাত-কবিদের মধ্যে অল্পই আছেন যাঁরা শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিকে সম্মান দিয়েছেন। শেক্‌স্‌পীয়রের সনেটগুলি যে চতুর্দশ চরণের সাধারণ গীতিকবিতার অধিক মর্যাদা দাবি করতে পারে না, আশা করি সেকথা কলা-কুতূহলী বিদগ্ধ-সমাজকে বোঝাবার জন্যে আর বেশি তথ্যসংকলনের প্রয়োজন নেই।

৪

ইংরেজি সনেটের বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র এ নয়। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই আমরা এই অপ্রিয় প্রসঙ্গে প্রবেশ করেছি। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বে হলেও অপ্রয়োজনে নয়। ইংরেজি সনেটের কুপ্রভাবে বাংলা সনেটের বিশুদ্ধি কলুষিত হয়েছে। তাই এ প্রসঙ্গ ভবিষ্যতেও আমাদের একাধিকবার উত্থাপন করতে হবে।

এইবার গীতিকবিতার ক্ষেত্রে সনেটের স্বরূপলক্ষণ সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের অবতারণা করা যেতে পারে। সনেটের মধ্যবর্তী 'আবর্তনে'র রহস্য কি ও কোথায়? এই আবর্তন নিতান্তই তৎকালীন কোন রীতি বা প্রথা থেকে আকস্মিকভাবে উদ্ভূত হয়ে এখনও অনাবশ্যক কারণেই সনেটের মধ্যে দৌরাত্ম্য করছে কি না। অর্থাৎ পদ্যবন্ধ হিসাবে এই আবর্তন কৃত্রিম কি না এবং যদি তাই হয়, তা হলে সনেটে তা না থাকলেই বা ক্ষতি কি?

আমরা পূর্বেই বলেছি, ইংরেজি সমালোচকগণ একে Break, Pause, Turn বা Twist বলেছেন। বলাই বাহুল্য, অষ্টকের

চতুষ্ক-যুগলবন্ধ সম্পূর্ণ হবার পর সনেটের অষ্টম পংক্তির শেষে ছন্দ-যতি বাক্‌স্পন্দের স্বাভাবিক নিয়মেই অনিবার্য হয়ে ওঠে। ইংরেজি Pause বা যতি কথাটির সেখান থেকেই উৎপত্তি। ওয়াট্‌স্‌-ডানটনের তরঙ্গ-তত্ত্ব থেকে Break কথাটির উদ্ভব হয়েছে: Breaking of waves বা তরঙ্গ-ভঙ্গ। কিন্তু এ দুটি শব্দের ব্যবহারে আবর্তনের স্বরূপ ধরা পড়ে না। Turn বা Twist-এর মধ্যেই আবর্তন-লীলার রহস্য আভাসিত। ইতালীয় ভাষায় এই আবর্তন Volte শব্দের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। পূর্বে বলা হয়েছে, ত্রুবাত্বরদের ক্যানসো বা প্রেমসংগীতের শেষে একটি হ্রস্ব স্তবকবন্ধ থাকত, তাকে বলা হত তর্‌নাদা। ইতালিতে সনেটের ষট্‌কবন্ধের নামও volte। তার অভিধেয় বা অন্বর্থ হল Turning; বাংলায় 'আবর্তন' শব্দের সাহায্যেই volte বা Turning-এর সবচেয়ে বেশি ব্যঞ্জনা প্রকাশ করা যেতে পারে। সনেটে অষ্টক-বন্ধের শেষে এবং ষট্‌কবন্ধের প্রারম্ভে ভাবের আবর্তনসন্ধি। ছন্দঃস্পন্দ ও ভাববন্ধের এই আবর্তনের সম্যক্‌ সঙ্গতিতেই সনেটের বাগর্থ-সম্পৃক্তির সার্থকতা। সনেটের ছন্দ-বন্ধন প্রসঙ্গে পূর্বে বলেছি যে, অষ্টকে বন্ধন এবং ষট্‌কে মুক্তিই চতুষ্কযুগল ও ত্রিকযুগলের সাহায্যে সনেট-বন্ধনের প্রধান লক্ষ্য। সনেটের ভাববন্ধনের দিক দিয়েও রয়েছে অনুরূপ বন্ধন ও মুক্তির লীলা; আমরা তাকে বলতে চাই ভাবের আসক্তি-মুক্তি-লীলা। অবশ্য সে লীলাবিলাসে কবির পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান। কবির সৃষ্টিপ্রেরণার আবেগ ও স্বরূপ অনুসারে কখনো অষ্টকে আসক্তি ষট্‌কে মুক্তি, কখনো আবার তার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ অষ্টকে মুক্তি ষট্‌কে আসক্তি,—এই ভাবেই সনেটের ভাব বিকশিত। কিন্তু সেই আসক্তি-মুক্তি-লীলা যে ভাবেই বিকশিত হোক না কেন, আবর্তন-সন্ধিতেই সনেটের ভারসাম্য রক্ষিত।

সনেটের জন্মভূমি ইতালিতে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে এই ভারসাম্য আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাক্-পেত্রার্কান সনেটকারগণ ছন্দঃস্পন্দের দিক দিয়েই এই ভারসাম্যের সন্ধান করেছিলেন, কিন্তু পেত্রার্কার প্রেমকাব্যেই প্রথম ছন্দঃস্পন্দ এবং ভাববন্ধ উভয়েরই ভারসাম্য আবর্তন-সন্ধিতে মিলিত ও নিয়ন্ত্রিত হল। তাই সনেটই পেত্রার্কার আত্মপ্রকাশের 'Organic Form' হয়ে উঠল। লরার প্রতি পেত্রার্কার প্রেমাসক্তি থেকেই তাঁর সনেটের উদ্ভব। এই প্রেমে যেমন গভীর আসক্তি ছিল তেমনি তার মর্মমূলে ছিল মুক্তির মন্ত্র। পেত্রার্কা ত্রুবাদুর-প্রেমেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনিই আধুনিক যুগের প্রথম আত্মসচেতন মানুষ। তাই তাঁকে যেমন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রুবাদুর বলা হয়, তেমনই বলা হয় প্রথম-মানবতাবাদী বা first humanist। ত্রুবাদুরদের মতই লরা তাঁর মানসসুন্দরী, কিন্তু সেই মানসসুন্দরীকে সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রেমিকের মতই তিনি বাসনালোকে দেহের কামনা দিয়ে আসঙ্গ-লিপ্সায় পেতে চেয়েছেন। অথচ সেভাবে অর্থাৎ প্রেমসম্ভোগের বাস্তব সঙ্গিনীরূপে তাঁকে তো কিছুতেই পাওয়া সম্ভব ছিল না। তাই ছিল তাঁর অন্তর্লোকে প্রেমের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বকে বিচিত্রভাবে অনুভব করা, জীবনের মহত্তর সঙ্গতির মধ্যে তাকে ধ্যান করা এবং শিল্পের সৌন্দর্যলোকে বাসনার এই গ্রন্থিমোচনের চেষ্টা করাই পেত্রার্কার কাব্যরচনার মূল প্রেরণা ছিল। তাই তাঁর মানস-লোকের দ্বন্দ্ব ও সঙ্গতিই সনেটের দ্বন্দ্ব ও সঙ্গতির মধ্যে রসমোক্ষ লাভ করেছে।

কিন্তু শুধু প্রেমের ক্ষেত্রেই পেত্রার্কার এই দ্বন্দ্ব নয়। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ছিল তাঁর দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতির লীলা। বিচিত্রমুখী ছিল তাঁর জীবন এবং তারই অনিবার্য পরিণাম হিসাবে নানা অসঙ্গতিতে পূর্ণ ছিল তাঁর চেতনা। তিনি ছিলেন কোবিদ ও প্রেমিক, কবি ও

সুরশিল্পী, প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও মুদ্রাসংকলক, পত্ররচয়িতা ও ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও পরিব্রাজক, কূটনীতিবিদ ও রাজনীতি-বিশারদ। নির্জনতায়ই ছিল তাঁর আনন্দ, অথচ অভিজাতসঙ্গ ছিল তাঁর কাম্য ও ভাগ্য। প্রকৃতিপ্রেমিক হয়েও তিনি ছিলেন চারুকলারও একান্ত ভক্ত। তেইশ বৎসর বয়সে তাঁর মানসলোকে লরার প্রথম আবির্ভাব, তারপর সুদীর্ঘ একুশ বৎসর সেই পবিত্র প্রেমবহ্নিতে তিনি প্রজ্বলিত হয়েছেন, এমন কি লরার মৃত্যুর পরও আরও দশ বৎসর লরার প্রতি তাঁর অনুরক্তি অব্যাহত রয়েছে, অথচ রক্তমাংসের মানুষের মত তিনিও জীবন যাপন করেছেন, সন্তানের পিতা হয়েছেন। তবু বলা হয়েছে, 'Never did passion burn more purely than in the love of Petrarch for Laura'। এক দিকে তিনি ছিলেন ইন্দ্রিয়বেদ্য জীবনরসের রসিক, অন্য দিকে সর্বভোগবিরক্ত সন্ন্যাসী। যেমন স্বাধীনতার উপাসক তেমনি সে যুগের সবচেয়ে বড় অত্যাচারী শাসকের হাতের পুতুল ; ধর্মে তাঁর বিশ্বাস কারও চেয়ে কম ছিল না, অথচ সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অক্লান্ত সংগ্রাম। অন্তরঙ্গ বন্ধুদের প্রকাশ্যভাবে মদ্যপ দুশ্চরিত্র ও নির্বোধ বলে ঘোষণা করতে তাঁর বাধে নি, কিন্তু বন্ধুপ্রীতি ছিল তাঁর অন্তরঙ্গ হৃদয়-ধর্ম। ঐশ্বর্যের প্রতি তিনি চরম ঘৃণা পোষণ করতেন, কিন্তু রাজন্যবর্গের মহার্ঘ উপহার ও উপঢৌকন গ্রহণে কখনই তাঁর অরুচি বা অনিচ্ছা ছিল না। এমনি অসঙ্গতি ও পরস্পরবিরোধী দোষে-গুণে মানুষ ছিলেন পেত্রার্কা।[২৬] অথচ সভ্যতার নবজন্ম তাঁরই হাতে হয়েছিল।

আসলে পেত্রার্কার ব্যক্তিজীবনে যা বিশেষরূপে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে রেনেসাঁস বা সভ্যতার নবজন্মের মধ্যেই সাধারণভাবে সেই লক্ষণগুলি বিরাজমান দেখতে পাওয়া যাবে। নবজন্মের এক দিকে আছে প্রজ্ঞাপরিশীলিত জীবনচর্যা, অন্য দিকে পরিপূর্ণ ভোগাসক্তি,

এক দিকে পঞ্চেন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়ে দেহসৌন্দর্যের আরতি, অন্য দিকে প্রাণপণে আত্মার বিশুদ্ধিরক্ষার চেষ্টা ; অর্থাৎ এক দিকে পেগানিজ্‌ম্‌ আর একদিকে ক্রিশ্চিয়ানিটি। এক দিকে পরিদৃশ্যমানকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সাহায্যে বুদ্ধিবেদ্য করার বিজ্ঞানসাধনা, অন্য দিকে দুর্নিরীক্ষ্য স্বপ্নলোকে রোমান্টিক কল্পনার সুদূরাভিসার। এক দিকে ভগবানে ও পরলোকে বিশ্বাস, অন্য দিকে মানবতা ও মর্ত্যজীবনের প্রতি পরম আসক্তি। এই আকর্ষণবিকর্ষণের বহুমুখী বিচিত্র দ্বন্দ্বে নিত্য-আন্দোলিত রেনেসাঁসের জীবনস্পন্দন। তবু তার মধ্যে আছে সঙ্গতি, আছে সামঞ্জস্য ; রেনেসাঁসের প্রাণপুরুষ সেই সঙ্গতি সেই সামঞ্জস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁর জীবনসাধনায়। শিল্পলোকে সনেটবন্ধে তারই প্রতিফলন। আবর্তনসন্ধিতে আসক্তি ও মুক্তির ভারসাম্য রক্ষা করে বন্ধনরচন ও বন্ধনমোচনের লীলারহস্যে কলাবিলসন। তাই সনেট শুধু পেত্রার্কারই নিজস্ব কলাকৃতি নয়, তা রেনেসাঁস বা নবজন্মোত্তর কবিমাত্রেরই আত্মপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ কাব্যরূপ।

বস্তুত পেত্রার্কার Canzoniere-এর অতুলনীয় লোকপ্রিয়তা থেকেই য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে সনেটের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুমান করা যেতে পারে। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের পরে Canzoniere প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ভেনিসে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাকি ত্রিশ বৎসরের মধ্যে গ্রন্থখানির চৌত্রিশটি সংস্করণ হয়েছে ; তারপর কেবল ষোড়শ শতাব্দীতেই একশ' সাতষট্টিটি সংস্করণ পঞ্জিভুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন দেশে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে সনেট-রচনা বিদগ্ধসমাজের একটি বিশিষ্ট গুণ বলেই আদৃত হয়েছিল। তার ফলে মন্দকবিযশঃপ্রার্থী প্রতিভাশূন্য পদ্যকারদের হাতে সনেটের দুর্গতিও কম হয় নি। এককালে সনেট সামাজিক সৌজন্য ও স্তাবকতার বাহন হয়ে উঠেছিল। বহুশ্রুত কবি ও কোবিদমণ্ডলে

এই সব ভঙ্গিসর্বস্ব প্রেরণাহীন পদ্মমালার রচয়িতারা যে উপহসিত হবেন তা বলাই বাহুল্য। ইংরেজি সাহিত্যে অবজ্ঞাসূচক Sonnettish, Sonneteer ইত্যাদি শব্দই তার প্রমাণ। কিন্তু সত্যকার কাব্যকলাকৃতি হিসাবে সনেট যে কবিসমাজে চির-আদরণীয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতাটি তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি সনেট-বিরূপ সমালোচকদের লক্ষ্য করেই বলছেন:

Scorn not the Sonnet ; Critic, you have frowned,
Mindless of its just honours , with this key
Shakespeare unlocked his heart , the melody
Of this small lute gave ease to Petrarch's wound ;
A thousand times this pipe did Tasso sound ;
With it Camoens soothed an exile's grief ;
The sonnet glittered, a gay myrtle leaf,
Amid the cypress with which Dante crowned
His visionary brow : a glow-worm lamp,
It cheered mild Spenser, called from Faery-land
To struggle through dark ways ; and when a damp
Fell round the path of Milton, in his hand
The thing became a trumpet ; when he blew
Soul-animating strains—alas, too few !

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ এই কবিতায় বিভিন্ন দেশের সনেটকলা-কুশলী শ্রেষ্ঠ কবিগণের শুধু যে নামাবলীই উচ্চারণ করেছেন তাই নয়, বিভিন্ন কবির হাতে বিচিত্র অনুভবের সার্থক বাহন হিসাবে সনেট কি ভাবে কবির আত্মপ্রকাশের যোগ্যতম কলাকৃতি হয়ে উঠেছে এ কবিতায় তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

বিষয়ালম্বন ও ভাববিন্যাসের দিক দিয়ে সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে সনেটের পার্থক্য কি ও কোথায় তাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। ওয়াট্‌স-ডানটন আধুনিক গীতিকাব্যসাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন : গীতিকথা বা সাধারণ লিরিক, আর কাব্যীভূত তত্ত্বকথা বা

তাঁর ভাষায় 'poetised didactics'। তাঁর মতে গীতিকথা বা সাধারণ লিরিকের ক্ষেত্রে অন্যান্য কলাকৃতির চেয়ে সনেটের দাবি বেশি নয়; কিন্তু কাব্যীভূত তত্ত্বকথার ক্ষেত্রে সনেট একমাত্র না হলেও সার্থকতম কাব্যবাহন। আসলে ওয়াট্‌স-ডানটন আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে প্রাচীন গীতিকবিতাকে মিশিয়ে ফেলেছেন বলেই এই বিচার-বিভ্রাটে পড়েছেন। প্রাচীন ও আধুনিক গীতি-কবিতার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য হল এই যে, প্রাচীন গীতিকবিতা বিষয়- বা -ভাবকেন্দ্রিক, আর আধুনিক গীতিকবিতা কবিকেন্দ্রিক। নবজন্মের পরে মানুষের ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যই মুখ্য। আনুগত্য বা অনুস্মৃতি নয়, অন্বীক্ষণ ও আত্মানুসরণই আধুনিক মানুষের স্বভাব-ধর্ম। আত্মবীক্ষণের আলোকে 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' বস্তু- বা -ভাবজগৎকে আধুনিক গীতিকবি প্রথমে আপনার করে তোলেন, তার পরে তাঁর কবিমানস থেকে কাব্যচ্ছন্দে উৎসারিত হয় অনুভূতি ভাব বা বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁরই আত্মকথা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই ভাবে 'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা' অর্থাৎ 'সাধারণের জিনিসকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা'ই সাহিত্যের কাজ। এখানে রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে সাহিত্যসৃষ্টির রহস্যের কথাই বলেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর বক্তব্য আধুনিক গীতিকাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেই অধিকতর সত্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য এ কথা মানতেই হবে যে, চারুকলা চিরদিনই 'প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর রঙ ইঙ্গিত প্রার্থনা করে'; তা 'একজনের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না,' তাই শিল্প কখনোই শিল্পী-নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে শিল্প ও শিল্পীর সম্পর্কটি সমান্তরাল নয়। মহাকাব্য ও নাটকের সার্থক শিল্পী সর্বদাই রঙ্গমঞ্চের বাইরে নেপথ্যলোকের

অন্তরালে থাকেন। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব তাঁর শিল্পের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত ; আধুনিক গীতিকাব্যে তো বটেই। তাই প্রাচীন গীতিকবিতা 'গীতিকথা' আর আধুনিক গীতিকবিতা 'কবিকথা'। প্রাচীন গীতিকাব্য ভাবের সঙ্গে ভাষার, বিষয়ের সঙ্গে ছন্দের রাখীবন্ধনেই সার্থক, কিন্তু আধুনিক গীতিকাব্যে প্রথমে কবিমানসের সঙ্গে ভাব বা বিষয়ের সাযুজ্য হওয়া চাই, তার পরে চাই কবিকথার সঙ্গে কলাকৃতির সারূপ্য।

তা ছাড়া, আধুনিক মন এবং প্রাচীন মনের মধ্যেও একটা মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রাচীন মন যেন ঋজু ও সরল, আধুনিক মন বক্র ও জটিল। প্রাচীন মন যেন একটিমাত্র সুরের লীলা বা melody, আধুনিক মন যেন বহু বিচিত্র সুরের একতান বা harmony। প্রাচীন গীতিকবিতায় প্রাচীন মনের একটি সুরেরই গীতিধ্বনি, আর আধুনিক গীতিকথায় আধুনিক মনের মিশ্র সুরসঙ্গতি। আধুনিক মনের এই মিশ্র সুরসঙ্গতির সার্থকতম শিল্পপ্রকাশ ঘটেছে সনেটের মধ্যে। আমরা যাকে সনেটের আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্ব বলেছি সাধারণ ভাবে তা শিল্পসৃষ্টির মূলতত্ত্ব হলেও সনেটের ক্ষেত্রেই তা বিশেষ অর্থে সত্য। সাধারণের ভাবকে শিল্পী তাঁর আপন স্বভাবে আকর্ষণ করে পুনরায় তাকে শিল্পরূপে মুক্তি দিয়ে সহৃদয়-মাত্রেরই হৃদয়সংবেদ্য করে তোলেন। শিল্পের এই সাধারণীকৃতিকে আসক্তি-মুক্তিতত্ত্বের দ্বারাও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন :

> বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
> আমার সে নয়, সবার সে আজ,
> ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
> বিবিধ সাজে,

তখন তিনি শিল্পের সাধারণীকৃতির রহস্যকেই কাব্যছন্দে প্রকাশ

করেন। কিন্তু সনেটের আসক্তি-মুক্তি-লীলা শুধু তত্ত্বরূপেই সত্য নয়, শিল্পরূপেও অঙ্গাঙ্গী-ভাবে সত্য। পূর্বেই বলা হয়েছে, সংবৃত চতুষ্কযুগলে দুটিমাত্র মিলের পুনঃ-পুনঃ আবর্তনে সনেটের অষ্টকবন্ধে শিল্পদেহে ভাবের গ্রন্থিবন্ধনের যেমন ব্যবস্থা হয় তেমনি ষট্‌কবন্ধে বিবৃত ত্রিকযুগলের মিল-বিন্যাসে সেই সংসক্ত ভাব রসমোক্ষের লীলাতে মুক্তি পেতে থাকে। সাধারণ গীতিকবিতার অন্য কোনো কলাকৃতির মধ্যে ভাব-প্রকাশের এই আসক্তি-মুক্তি-লীলা এমন পরিচ্ছন্ন ও সুসমঞ্জস নয়। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'নটরাজে' এই মুক্তিতত্ত্বের রহস্যটি ভারি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। কবি যখন বলেন :

আমি নটরাজের চেলা,
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে

তখন তিনি 'অন্তরে বাহিরে মহাকালের বিরাট নৃত্যচ্ছন্দ' থেকেই তাঁর শিল্পদীক্ষা গ্রহণ করেন। সে দীক্ষার মূলমন্ত্র হল 'বাঁধন খোলার সাধন' শেখা। কবি বলেছেন, এই দীক্ষাতেই 'জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।' তাই শিল্পগুরু নটরাজের কাছে কবির প্রার্থনা, 'নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে' ; কেননা

তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায় বাঁধন খোলায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে ;

সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কবন্ধের অন্ত্যানুপ্রাস-ঝংকৃত 'সুরে সুরে

তালে তালে' এই বাঁধন পরানো ও বাঁধন খোলার তত্ত্বই সাকার হয়ে উঠেছে।

ভাবের দিক দিয়েও যখন সৃষ্টিরহস্যের এই বাঁধন-পরানো ও বাঁধন-খোলার অখণ্ড লীলারস কবিমানসে বিলসিত হয় তখনই শ্রেষ্ঠ ও সার্থক সনেটের জন্ম হয়ে থাকে। সনেট-রচনার আদিযুগে প্রেমই ছিল তার একমাত্র বিষয়ালম্বন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্রই অপরিতৃপ্ত প্রেমপিপাসার বেদনা থেকেই উৎকৃষ্ট সনেটের উদ্ভব হয়েছে। তারপর গত কয়েক শ বৎসরের বিবর্তনে সনেট-দেহে অনুবিষ্ট ভাব যখন 'মানবহৃদয়ের বর্ণমালা' হয়ে উঠল তখনো বাঁধন-পরানো ও বাঁধন-খোলার এই প্রতীপ-রহস্যটিই ভাবের উদ্দীপন-বিভাবরূপে লীলায়িত হয়ে আসছে। এই বিবর্তন-প্রক্রিয়াটি এনিড হেমারের দৃষ্টিতে বড় সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছে। তিনি বলেছেন :

Through its use for the heart-searchings of unsatisfied desire, the sonnet was found to be a perfect vehicle for recording and analysing the intellectual processes accompanying emotional experience. Nearly all good sonnets hold a nice balance between thought and feeling. The emotions may be deep and strong, even passionate, but they are steadied and elevated by intellectual concentration.[২১]

এখানে সনেট-শিল্পে ভাব ও ভাবনার ভারসাম্য কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে সেই সত্যকে লেখক বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। হৃদয়াবেগের তরলোচ্ছ্বাস আত্মনিরীক্ষারত অনুচিন্তনের উত্তাপে কিভাবে ঘনীভূত ও সংহত হয়ে ওঠে সেই সৃষ্টিপ্রক্রিয়াটির কথাই বলা হয়েছে। সনেটের আসক্তি-মুক্তি-লীলার মূলীভূত কবিমানসের প্রতীপ-ধর্মিতার প্রতিও অঙ্গুলি-নির্দেশ করে লেখক বলেছেন :

The opposition of worldly and spiritual things often gives the dual foundation for a sonnet, the rejection of the worldly for the spiritual life, or of the sensual for the intellectual.[২৮]

বলাই বাহুল্য, অনুভবের এই দ্বিকোটিকতা সর্বত্রই যে ঐহিক থেকে পারত্রিকের, অথবা ইন্দ্রিয়বেদ্য থেকে অতীন্দ্রিয়ের অভিমুখী হবে এমন কথা নেই। কবিচিত্তের প্রবণতা অনুসারেই তার গতিপথ নির্ণীত হবে। কিন্তু যে পথেই তার রসমোক্ষ হোক না কেন, প্রতীপ-ধর্মিতার দ্বন্দ্বকে উদ্ঘাটিত করেই অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে কবিচিত্ত বন্ধনমুক্ত হয়। সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে এখানেই সনেটের পার্থক্য। এবং এই কারণেই সাধারণ গীতি-কবিতার মত সনেটের ভাষা কদাচিৎ ঋজু, সরল ও আবেগগর্ভ হয়ে থাকে। স্বল্প পরিসরে প্রকাশিতব্য বলেই যেমন সনেটের দাবি 'maintenance of an unbroken artistic elevation,' তেমনি তার বাগ্‌বিন্যাসে 'abstract and intellectual language is often more expressive than pictorial or sensuous.'

পেত্রার্কার সনেট থেকেই একটি উদাহরণ দিয়ে সনেটের প্রকাশ-রহস্যটির বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। লরার মৃত্যু হয়েছে, পৃথিবী জুড়ে আবার এসেছে বসন্ত :

Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena,
E i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia,
E garrir Progne e pianger Filomena,
E primavera candida e vermiglia.
Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena ;
Giove s'allegra di mirar sua figlia ;
L'aria e l'acqua e la terra e d'amor piena ;
Ogni animal d'amar si riconsiglia.

Ma per me, lasso, tornano i piu gravi
Sospsiri, che del cor profondo tragge
Quella ch'al ciel se ne porto le chiavi ;
E cantar augelletti, e fiorir piagge,
E 'n belle donne oneste atti soavi,
Sono un deserto, e fere aspre e selvagge.

কবিতাটিকে ইতালীয় থেকে এবার বাংলায় অনুবাদ করা যাক—

আবার দক্ষিণ হাওয়া ফিরে এল বাধাবন্ধহারা,
পুষ্পে আর বৃক্ষপর্ণে গুঞ্জরিত তারি স্বরগ্রাম ;—
বাবুই কি যেন বকে, বুলবুল কেঁদে-কেঁদে সারা,—
শুভ্রতায় স্বর্ণাভায় বসন্ত কি নয়নাভিরাম !
হাসিতে উজ্জ্বল মাঠ, নীলাকাশ স্ফটিকের ধারা,—
কন্যার লাবণ্য দেখে প্রজাপতি পূর্ণ-মনস্কাম ;
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে উচ্ছলিত প্রেমের ফোয়ারা,
মধুর মিলনমন্ত্রে কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরে প্রিয়নাম।

আমার হৃদয়ে হায় দীর্ঘশ্বাস আরো গুরুভার,—
যে-নারী গিয়েছে স্বর্গে হৃদয়ের চাবি ক'রে চুরি
তারি গূঢ় আকর্ষণে কূলপ্লাবী ব্যথার পাথার ;—
আমার জীবনে আর ফিরিবে না বসন্ত-মাধুরী !
পাখির কাকলি আর সুন্দরীর লাবণ্য-সম্ভার
শুধু যেন মরুভূমি, আর হিংস্র শ্বাপদ-চাতুরি !!

বলাই বাহুল্য আমার অক্ষম অনুবাদে ইতালীয় ভাষার গীতিধ্বনি কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবু আধুনিক গীতিকবিতা হিসাবে সনেটের লক্ষণগুলি অক্ষম অনুবাদের ত্রুটি সত্ত্বেও ভারি সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছে। এতে একটি ব্যক্তিহৃদয়েরই আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে এবং ব্যক্তিটি কবি স্বয়ং। সারা পৃথিবী জুড়ে বসন্ত এসেছে তার বর্ণ আর

সংগীত, আনন্দ আর উল্লাস নিয়ে। আকাশ-বাতাস আবেগে বিহ্বল, প্রত্যেক প্রাণী প্রেমের আনন্দ-চিন্তায় বিভোর। কিন্তু বিশ্বের এই উদ্বেল আনন্দোল্লাস থেকে কবি আমাদের টেনে নিয়ে গেছেন তাঁর নিজ হৃদয়ের অন্তঃপুরে। সেখানে সারা বিশ্ব থেকে তাঁর ব্যক্তিকথা স্বতন্ত্র। সেখানে আনন্দের লেশমাত্রও অবশিষ্ট নেই। বেদনা, হাহাকার আর দীর্ঘশ্বাসই তাঁর সারা অন্তর জুড়ে আছে। তিনি চিরদিনের জন্যে হারিয়েছেন তাঁর প্রিয়াকে, তাই পাখি আর ফুল আর নারীর কোমল মাধুর্য সবই তাঁর কাছে মরুভূমি হয়ে গেছে। এ কবিতায় বসন্তের স্বাভাবিক আনন্দ নয়, অস্বাভাবিক বেদনা, সবার সঙ্গে এক হয়ে নয়, সবার থেকে পৃথক হয়েই কবির নিজত্ব চিহ্নিত হয়েছে। হতভাগ্য মানুষটি সবার থেকে আলাদা এবং আলাদা বলেই যেন তাঁর বেদনা সবার অন্তরে আরও বেশি করে স্থান পেল। সনেট হিসাবে এর অষ্টক ও ষট্‌কবন্ধের আবর্তনলীলাটি খুঁজে বের করতে হয় না, তা আলোর মতই স্বচ্ছ। বিশ্ব ও ব্যক্তির বৈসাদৃশ্যে আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্যটিও যেন স্বতঃস্ফূর্ত। সব-কিছু নিয়ে প্রকাশ এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে যে এর কলাকৃতির জটিলতা চোখেই পড়ে না।

তবু, তর্ক উঠতে পারে, পেত্রার্কার কাছে তাঁর আত্মপ্রকাশের বাহন হিসাবে সনেটই 'অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্য' কলাকৃতি হয়ে উঠেছিল; কিন্তু অন্যের কাছে তাঁর সেই ছাঁচ বা বিশেষ কাঠামোটি তো বাইরে থেকে আরোপিত, এবং সেজন্যেই তা কৃত্রিম। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট রীডের Organic Form এবং Abstract Form-এর প্রশ্নও উত্থাপিত হতে পারে।[২৯] অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা-প্রজ্ঞা-সম্পন্ন কবির প্রতিটি সৃষ্টিপ্রেরণাই তাঁর বিশিষ্ট কলাকৃতিকে অভিনবত্ব দান করে। সনেটের বাঁধাধরা নিয়মের বিশিষ্ট ছাঁচে সে-অভিনবত্ব-সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়?

উত্তরে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে সনেটের অভিনবত্ব ন্যাসে মুখ্যত তার অষ্টক ও ষট্‌ক-বন্ধের মধ্যে ভাবের ভারসাম্য ও সঙ্গতি-রচনার অজস্র ও অফুরন্ত বৈচিত্র্যের ফলে। আমরা যাকে ভাবের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তি বলেছি, কত ভাবে তা সম্ভব হতে পারে তার সামান্য একটু আভাস দেওয়া যাক। পেত্রার্কার উদ্ধৃত কবিতায় বিশ্বের সর্বজনীন আনন্দের বৈসাদৃশ্যে ব্যক্তির বিশিষ্ট বেদনার প্রকাশেই ভাবের শিল্পমুক্তি ঘটেছে। তেমনি সামান্য থেকে বিশেষে, বিশেষ থেকে সামান্যে ; অপ্রস্তুত থেকে প্রস্তুতে, প্রস্তুত থেকে অপ্রস্তুতে ; তত্ত্ব থেকে ভাবে, ভাব থেকে তত্ত্বে ; অতীত থেকে বর্তমানে, বর্তমান থেকে অতীতে ; উদাহরণ থেকে সিদ্ধান্তে, সিদ্ধান্ত থেকে উদাহরণে ;—অসংখ্য উপায়ে ভাবের বন্ধন থেকে বন্ধনমুক্তির লীলা প্রত্যেকটি সার্থক সনেটের সংগীত ও সংগতি সৃষ্টিতে অভিনব হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। Enid Hamer বলেছেন :

> The theme of a sonnet has nearly always two parts or elements. It may be based on an experience and its application, on the discovery of common ground between dissimilar things, on contrast, comparison, or the bringing together of past and present ; or the duality may be given by a sudden complete volte-face of mood or vision. ··· The immediate subject or occasion of the sonnet may be developed in the octave, the application or evocation in the sestet.[৩০]

এই ভাবে দ্বিধাবিভক্ত ভাবের দুটি ভাগের মধ্যে সংগতি-সৃষ্টির সার্থকতার উপরেই সনেটের উৎকর্ষ নির্ভরশীল। আর এ ক্ষেত্রে কবির অনন্ত স্বাধীনতা। এবং এই স্বাধীনতার ফলেই এক কবির সনেট থেকে আর-এক কবির সনেটে রূপ-ও-রসগত পার্থক্য দেখা দেয়, এমন কি একই কবির একটি সনেট আর-একটি থেকে সম্পূর্ণ

স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে টি. এস. এলিয়টের বক্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে :

In a perfect sonnet what you admire is not so much the author's skill in adapting himself to the pattern as the skill and power with which he makes the pattern comply with what he has to say.[৩১]

অর্থাৎ রীতির দাসত্ব নয়, রীতির উপর আধিপত্য বিস্তারেই কবি-শিল্পীর ব্যক্তিত্বের পরিচয়।

তা ছাড়া গীতিকবিতা হিসাবে সনেট-রীতির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য অন্যান্য জটিল গীতিকাব্য-বন্ধ থেকে সহজ ও সরল। বস্তুত, আধুনিক য়ুরোপীয় গীতিকাব্যের জন্মলগ্নে প্রভাঁসের সূতিকাগৃহে ত্রুবাদুরদের ক্যানসো, ভিলানেল, সেস্তিনা প্রভৃতি পদ্যবন্ধের সঙ্গে সনেটের তুলনা করলেই এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম যুগের সেই কৃত্রিম রীতিগুলি দেখলে মনে হয়, কবি যেন জ্যামিতির ছক কেটে অঙ্ক কষে পদ্য রচনার কসরতে বসে গেছেন। এমন কি প্রভাঁসের গীতিকাব্যবন্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে ফরাসি দেশে পরবর্তী কালে বিচিত্র স্তবক-বন্ধের বালাদ, দূব্‌ল্ বালাদ, শাঁ র‍্যয়াল, সেস্তিনা, ভিলানেল, ত্রিয়োলেৎ, রঁদেল, রঁদো, রঁদো রিদূব্‌ল্ প্রভৃতি রীতির[৩২] জটিলতা ও কৃত্রিমতার তুলনায় সনেটরীতি সহজতম ও সুচারুতম। সনেটের সূক্ষ্ম সঙ্গতি ও সুমধুর ভারসাম্য অন্য কোন পদ্যবন্ধে নেই। ছন্দের বাহ্য-সঙ্গতির সঙ্গে ভাবের আভ্যন্তর-সঙ্গতির মিলন একমাত্র সনেটেই সার্থক হয়েছে। ছন্দমিলের বাহ্যসঙ্গতি সনেটদেহে পঞ্জর-পিঞ্জরের মত। সেই কাঠামোকে আশ্রয় করেই কবিশিল্পী তাঁর ভাব-প্রতিমাকে রূপায়িত করে তোলেন। কিন্তু সেই প্রতিমার দেহে সৌন্দর্য ও লাবণ্য আসে সনেটের আভ্যন্তর-সঙ্গতির ফলে। তাই সনেট-বিচারে ছন্দমিলের বাহ্যসঙ্গতি গৌণ, ভাবপ্রকাশের আভ্যন্তর-

সঙ্গতিই মুখ্য। সেই আভ্যন্তর-সঙ্গতির মূলকথা হল আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে অষ্টক-ষট্‌কবন্ধে তাকে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় বিলসিত করে তোলা। এ রহস্য যাঁর অধিগত সনেটের বন্ধন তাঁর কাছে মুক্তিরই বাহন। পরিশীলিত শিল্পিমানস সংযমের অনুশাসনে স্বেচ্ছাবন্দী। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদই শিল্পরসিকের একান্ত-বাঞ্ছিত। তাই সার্থক সনেট-শিল্পী মাত্রেই প্রমথ চৌধুরীর বিদগ্ধ-ভাষণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে চিরদিন বলবেন :

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন।
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে, অপরে ক্রন্দন॥

॥ উল্লেখ-পঞ্জি ॥

১ Legouis and Cazamian, A History of English Literature, স° ১৯৫১, পৃষ্ঠা ২২২॥

২ দ্রষ্টব্য : Mark Pattison, The Sonnets of John Milton, ভূমিকা, পৃ° ৭॥

৩ J. W. Lever, Elizabethan Love Sonnet, (১৯৫৬), পৃ° ৬॥

৪ The Elezabethan Love Sonnet, পৃ° ৬-৭॥

৫ William Sharp, Sonnets of this Century গ্রন্থে The Sonnet : Its characteristics and history শীর্ষক ভূমিকা-প্রবন্ধ, পৃ° lvii.

৬ A. W. Verity, Milton's Sonnets, (১৯০৪), পৃ° xxiv-xxv.

৭ Enid Hamer, The English Sonnet, (১৯৩৬), পৃ° xliv-xlv.

৮ Sonnets of this Century, পৃ° lvii.

৯ Francesco Petrarca [১৩০৪-১৩৭৪ খ্রী°]। ইতালি উচ্চারণ 'ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা'। ইংরেজি ভাষায় নামের বানান হল Petrarch, তদনুযায়ী উচ্চারণ হচ্ছে 'পেট্রার্ক্'। কিন্তু মধুসূদন বাংলায় ইতালীয় উচ্চারণে ইতালীয় নামই ব্যবহার করেছেন। পেত্রার্কার পিতা ছিলেন একজন ফ্লোরেন্তাইন ব্যবহারজীবী। রাষ্ট্রদ্বন্দ্বে জড়িত হয়ে তিনি ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে নিজ বাসভূমি থেকে নির্বাসিত হন, এবং সাময়িক ভাবে আরেজোতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানেই ১৩০৪ সালে পেত্রার্কার জন্ম। তাঁর ছেলেবেলা কেটেছে পরিবারের আদিবসতি ভালদার্নোতে। সেখান থেকে ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে পিতার সঙ্গে তিনি যান পিসায় এবং তার পরের বৎসর প্রভাঁসে। ক্রবাতুরদের দেশ প্রভাঁসেই পেত্রার্কাদের স্থায়ী নিবাস গড়ে ওঠে। প্রথমে এভিগ্ননে, পরে কার্পেত্রাঁসে। সেখানকার নন্দনকাননতুল্য প্রাকৃতিক পরিবেশ কবিচিত্তকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। তা ছাড়া এভিগ্ননেই তখন পোপের পীঠস্থান ছিল। পেত্রার্কা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে প্রেরিত হন, কিন্তু আইন-শাস্ত্র তাঁকে মোটেই আকর্ষণ করতে পারে নি। বলোঞা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভার্জিল, সিসেরো ও সেনেকার রচনাবলীই তাঁর কবিকল্পনার প্রেরণা যোগাত। ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর ব্যবহারবিদ্যাকে বিসর্জন দিয়ে পেত্রার্কা দর্শন ও কাব্যকলার মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে রইলেন। এভিগ্ননে এসে অবগাহন করলেন ক্লাসিক কাব্য আর রোমান্টিক প্রেমের অমৃত-সমূদ্রে। ৩৬ বৎসর বয়সে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় এবং রোমান সেনেট—একই সঙ্গে এই দু'জায়গা থেকেই তাঁকে রাজকবি-সম্মানে ভূষিত করার প্রস্তাব করা হল। পেত্রার্কা রোমান সেনেটের মুকুট গ্রহণ করাই সমীচীন মনে করলেন, এবং পর বৎসর ঈস্টার-দিবসে মহাসমারোহে তাঁর অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হল। ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল, ২৩ বৎসর বয়সে, পেত্রার্কা এভিগ্ননের সেণ্ট ক্ল্যারা গির্জায় তাঁর মানসসুন্দরী Madonna Laura-কে দেখতে পান। লরা তখন সপ্তদশী, সম্ভ্রান্ত-গৃহবধূ। প্রথম সাক্ষাতের একুশ বৎসর পরে, ১৩৪৮ খ্রীষ্টাব্দে লরা দেহত্যাগ করেন।

১০ The Encyclopedia Americana, vol. 25, পৃ° ২৫৭॥

১১ Ezra Pound, The Spirit of Romance, পৃ° ১০৩॥

১২ Simondi's Literature of the South of Europe, vol I, Tr. Thomas Roscoe, চতুর্থ স°, পৃ° ২৪৩॥

১৩ দ্রষ্টব্য : Poems and Translations by Dante/ Gabriel Rossetti, অক্সফোর্ড সংস্করণ, পৃ° ৩২৫-৩৮৫ ॥

১৪ A. C. Ward, Landmarks in Western Literature, (১৯৩২), পৃ° ৯২ ॥

১৫ Will Durant, The Story of Civilization, vol v, The Ranaissance, পৃ° ৯ ॥

১৬ তদেব। পৃ° ৯ ॥

১৭ দ্রষ্টব্য : Some Love Songs of Petrarch, William Dudley Foulke, LL. D., Oxford University Press, ১৯১৫, পৃ° ৯ ॥

১৮ His unequal collection, spoilt in more than one place by excessive subtlety, stained by shadows which the most attentive searchlight has not entirely dissipated, is yet the casket which encloses the most precious pearls of Elezabethan lyricism, some of them unsurpassed by any lyricism. A History of English Literature, পৃ° ৩০৯ ॥

১৯ The sonnets, though their excellence is lost in the splendour of the dramas, are as inimitable as they; and it is not a merit of lines, but a total merit of the piece; like the tone of voice of some incomparable person, so is this a speech of poetic beings, and any clause as unproducible now as a whole poem. Ralph Waldo Emerson, Shakespeare ; or, the Poet.

২০ Mark Pattison, Introduction to 'The Sonnets of Milton,' পৃ° ৪০-৪৩ ॥

২১ দ্রষ্টব্য : The Sonnets, and A Lover's Complaint, Edited by G. B. Harrison, Penguin Shakespeare, পৃ° ১৪-১৫ ॥

২২ দ্রষ্টব্য : A Lytton sells, The Italian Influence in English Poetry, পৃ° ১৯৯ ॥

২৩ The Elezabethan Love Sonnet, পৃ° ১৬৪-১৬৫ ॥

২৪ Sir Sidney Lee, A life of William Shakespeare, পৃ° ১৭৭।

২৫ The English Sonnet, পৃ° lii,

২৬ দ্রষ্টব্য : Some Love Songs of Petrarch, Foulke, পৃ° ৯৪-৯৫ ॥

২৭ The English Sonnet, পৃ° l.

২৮ তদেব, পৃ° li,

২৯ Herbert Read, Collected Essays in Literary Criticism, পৃ° ১৭-২০ ॥

Organic form : When a work of art has its own inherent laws, originating with its very invention and fusing in one vital unity both structure and content, then the resulting form may be described as organic.

Abstract form : When an organic form is stabilized and repeated as a pattern, and the intention of the artist is no longer related to the inherent dynamism of an inventive act, but seeks to adapt content to predetermined structure, then the resulting form may be described as abstract.

৩০ The English Sonnet, পৃ° xliv-xlv

৩১ T. S. Eliot, The Music of Poetry, ১৯৪২ ॥

৩২ Ballade, Double Ballade, Chant Royal, Sestina, Villanelle, Triolet, Roundel, Rondeau, Rondeau Redouble.

দ্রষ্টব্য : Lyric Forms From France, Helen Louise Cohen, পৃ° ৯২-৯৪ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ মধুসূদনের গীতিকাব্যলক্ষ্মী ॥

১

আধুনিক বাংলা কাব্যের জন্মলগ্নে কবির আত্মকথার বাহন হিসাবে বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রবর্তন করলেন মহাকবি মধুসূদন। মধুসূদন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নবজন্ম বা রেনে-সাঁসের কবিপুরুষ। তাঁর মধুকরী কল্পনা মহাকবিগণের চিত্তফুলবনমধু আহরণ করে যে চারটি মধুচক্র রচনা করেছিল তাদেরই নাম তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা ও বীরাঙ্গনা। সেখানে তাঁর সুদূরাভিসারী কল্পনা নিঃসীম আকাশচারী। সেই নভোবিহার সমাপ্ত করে যেদিন সেই দিব্য-বিহঙ্গ আত্মমানসের অতল রহস্যে অবগাহন করল সেদিন কবির নবসৃষ্টির বাহন হল সনেট, তিনি যার নামকরণ করেছিলেন "চতুর্দশপদী কবিতা"। কবির কম্বুকণ্ঠে আমরা 'নবজন্মে'র শুভশঙ্খধ্বনি শুনেছি, কিন্তু তাঁর নিজের কথা এতদিন শুনতে পাই নি ; সে কথা বলবার অবসরও যেন তাঁর ছিল না। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬১--মাত্র এই চার বৎসরের মধ্যে কবি রুদ্ধশ্বাসে তাঁর সারস্বতব্রত উদ্‌যাপন করলেন। তার পরে এল তাঁর চির-অতৃপ্ত ব্যক্তিপুরুষের প্ররোচনা, মাইকেল সাগরপারে পাড়ি জমালেন। মাতৃসত্র পরিত্যাগ করার পূর্বে 'বঙ্গভূমির প্রতি' আর 'আত্মবিলাপ' এই দুটি গীতিকাব্যোচ্ছ্বাসে কবির দীর্ঘশ্বাস সারস্বত আকাশকে সকরুণ করে রেখে গেল। তারপর ফ্রান্সের ভার্সাই নগরে বন্ধুসঙ্গহীন দুঃসহ প্রবাসজীবন। নিঃসঙ্গ নির্জনতায় পরম বেদনার মধ্যে কবি আত্মচিন্তায় ধ্যানস্থ হলেন, তলিয়ে গেলেন স্মৃতির অতলে। তাঁর অন্তর্লোক উন্মীলিত হল। মধুমানসের সেই স্বর্ণমঞ্জুষা থেকে ঝরে পড়ল চতুর্দশপদীর মুক্তাবলী।

চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই কবি মধুসূদন নিজেকে উন্মীলিত করেছেন। চতুর্দশপদীই তাঁর আত্মকথার বাহন। এই কাব্য-গ্রন্থেই কবিমানসের মর্মকথা সম্যক্‌ভাবে ধরা পড়েছে। এখানেই মধুসূদনের কবিসত্তা যেন তাঁর ব্যক্তিসত্তা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আত্মবীক্ষণের আলোকে আপনাকে চেনবার চেষ্টা করেছে। সেই আলোকে তাঁর মানসলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শুধু তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা আর অনুরাগ-বিরাগই নয়, সংস্কৃতিপ্রেমী ও সাহিত্যরসিক কবিপ্রাণটিরও সেখানে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তা ছাড়া কবি তাঁর নিজের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কেও কয়েকটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সেখানে রেখে গিয়েছেন। কাজেই মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে সনেট হিসাবে এই কবিতাবলীর উৎকর্ষ-অপকর্ষ-বিচারও যেমন আমাদের কর্তব্য হবে, তেমনই এই কবিতাবলীর মধ্য দিয়ে কবি-মধুসূদনের যে আত্মপরিচয় স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তার স্বরূপনির্ণয়ও হবে আমাদের লক্ষ্য। অর্থাৎ সনেটের আলোকে মধুপ্রতিভার পুনর্বিচারই হবে আমাদের এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। মধুসূদনের জীবন ও কবিকর্ম সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ গত এক শো বৎসর ধরে যথেষ্টই হয়েছে। নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ই তাঁর ভাগ্যে জুটেছে প্রচুর। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, মধুসূদনের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর সম্পর্কে সুবিচার অল্পই হয়েছে। এবং এজন্যে যাঁরা সবচেয়ে বেশি দায়ী তাঁদের মধ্যে মধুসূদনের উত্তরসূরি রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদনের জীবনচরিত-প্রণেতা যোগীন্দ্রনাথ বসু এবং মধুসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার মোহিতলাল মজুমদারই অগ্রগণ্য। রবীন্দ্রনাথকে মধুসূদনের উত্তরসূরি বলেছি, রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বিহারীলালকেই কবিগুরু বলে স্বীকার করেছেন; কিন্তু আধুনিক বাংলা কাব্যের গঙ্গা-যমুনাসঙ্গম থেকে রবীন্দ্রনাথ যে তীর্থসলিল আহরণ করেছেন তাতে বিহারীলালের গীতিযমুনার ধারা ,যতটুকু

আছে মধুসূদনের ভাব-মন্দাকিনীপ্রবাহও তার চেয়ে কম নেই। অথচ সেই রবীন্দ্রনাথই মধুপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তি মেঘনাদবধের উপর সবচেয়ে কঠোর খড়্গাঘাত করেছিলেন। সেই রাম-রাবণ-প্রসঙ্গ : 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'। ভারতের এই ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকে আমাদের জাতীয় জীবনের অমর সহচরবৃন্দের হত্যা-অপরাধে অপরাধী করেছেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে অনুশোচনীয় যে, রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার দৃষ্টিতে [আমি তাঁর ষোলো বৎসরের রচনার কথা বলছি নে, বাইশ বৎসর বয়সে লেখা, ১২৮৯ সালের ভাদ্র মাসে প্রকাশিত যুক্তি-পরম্পরা-গ্রথিত 'মেঘনাদবধ' প্রবন্ধের কথাই বলছি], মেঘনাদবধের চেয়ে বৃত্রসংহারই মহত্তর কাব্য বলে বিবেচিত হয়েছে।[১] আর বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রাদ্ধবাসরে বঙ্কিমস্মৃতিতর্পণ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের ন্যায্য পাওনা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ পরে অবশ্য 'জীবনস্মৃতি'তে তাঁর আত্মমার্জনের চেষ্টা করেছেন এবং 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে বিদ্রোহী মধুসূদনের অভিনবত্ব-সৃষ্টির প্রশস্তি-বাচন করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দায়িত্ব তাতেও ঘোচে নি, কেন না 'মধুসূদন বাংলা জানতেন না, তাঁর বাংলা বাংলাই নয়',-- এ জাতীয় ধারণাসৃষ্টির জন্যও রবীন্দ্রনাথই দায়ী। টমসনের গ্রন্থে তাঁর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। মৌখিক আলাপে রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন, 'His style has not been repeated. It isn't Bengali.'[২] মধুসূদনের জীবনচরিত-রচয়িতা যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রন্থখানি সুলিখিত, কিন্তু সমানধর্মা সহৃদয় না হলে সাহিত্যবিচারে যে বিভ্রান্তি ঘটে যোগীন্দ্রনাথেরও তাই হয়েছে। হিন্দু ঐতিহ্যের সংকীর্ণ গণ্ডীতে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতীয় নবজন্মের সিংহশিশুকে ধরবার চেষ্টা করেছেন। মধুসূদনের ধর্মান্তরগ্রহণ রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ ক্ষমার চোখে দেখে নি। তা ছাড়া প্রতিভাধরকে সাধারণ

মানুষের মাপকাঠিতে বিচার করলে যা হয়, যোগীন্দ্রনাথের জীবনী হয়েছে তাই। মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যবিচার-ক্ষেত্রে নব-সংহিতাকার। মধুসূদন তাঁর আরাধ্য কবি। কিন্তু মেঘনাদবধকে তিনি দেখেছেন 'মহাকাব্যের আকারে বাঙালী জীবনের গীতিকাব্য'-রূপে। মধুসূদনের Epic-Tragedy মহাকাব্যের আকারে লেখা হলেও গীতিকাব্যের আবেগোচ্ছ্বাসেই পূর্ণ, এই ধারণা-সৃষ্টির জন্য মোহিতলালই দায়ী। এপিক-ট্রাজেডির কুশীলবগণের কণ্ঠোচ্চারিত আবেগগর্ভ নাটকীয় উক্তিকে লিরিক-উচ্ছ্বাসরূপে দেখার এই গ্রন্থি থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারেন নি বলে মধুমানস সম্পর্কে মোহিতলালের অন্তিম বিশ্লেষণও কুহেলিকাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে।[৩] মহাকবির দুর্ভাগ্য এখানেই শেষ নয়। বিদ্যামন্দিরে এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে তাঁর অবস্থা আরও শোকাবহ। প্রবেশিকার দেউড়ি পেরোবার পূর্বে বাংলার বিদ্যার্থিসমাজ জেনে আসে যে, মধুসূদন স্বধর্মত্যাগী, উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ এবং চরিত্রহীন ছিলেন। শোচনীয় মৃত্যুর করুণ পরিণামের মধ্য দিয়ে তিনি স্ব-কৃত অপরাধের যোগ্য প্রায়শ্চিত্তই করে গেছেন।[৪] আর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেউড়ি পেরিয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে তারা জানতে পারে যে, 'মাইকেলের মহিমা বাংলা সাহিত্যের প্রসিদ্ধতম কিংবদন্তী, দুর্মরতম কুসংস্কার।'[৫]

এই দুর্ভাগ্যের জন্য কবি নিজেও কম দায়ী নন। আসলে মধুসূদনের মধ্যে দুটি বিপরীত সত্তার বিষম মিলন ঘটেছিল। মধুসূদনের ব্যক্তিপুরুষ আর কবিপুরুষ শুধু স্বতন্ত্রই নয়, এদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। পৃথিবীর যে-সব প্রখ্যাতনামা কবির জীবন আমাদের অজানা নয়, তাঁদের কারও কারও ব্যক্তিজীবন ও কবি-জীবনে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সার্থক ও সুন্দর হয়েছে, এমন উদাহরণ যে খুঁজে পাওয়া যাবে না তা নয়। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাস্তব সত্য এবং মানসস্বপ্নের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে

ওঠে। তির্যক-বিশ্লেষণে অনুপূরক-পরিপূরক-কল্পনায় হয়তো বা সামঞ্জস্য আবিষ্কৃত হতে পারে ; কিন্তু মধুসূদনের ক্ষেত্রে তা শুধু দুর্নিরীক্ষ্যই নয়, দুঃসম্ভবও বটে। মধুসূদন নিজের মনের মধ্যে দুটি মানুষকে নিয়ে ঘর করতেন ; একজনের পরিচয় মাইকেল এম্. এস্. ডাট. বার-অ্যাট-ল ; আর একজন 'দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন'। একজন লক্ষ্মীর উপাসক, আর একজন সরস্বতীর বরপুত্র। একজন শীলধর্মে ক্রিশ্চান, আর একজন কুলধর্মে হিন্দু। একজনের আত্মপ্রকাশ বিজাতীয় ভাষা ইংরেজিতে, আর একজনের বাণী-বিকাশ মাতৃভাষা বাংলায়। একজন অলক্ষ্মীর প্ররোচনায় আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে মরসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত, আর একজন সরস্বতীর প্রসাদে কাব্যামৃতরসাস্বাদে মধুকণ্ঠ পুরুষ। ইংরেজি ভাষায় যে সর্বদা কথা বলছে সে মাইকেল এম. এস. ডাট। কবি শ্রীমধুসূদনের মানসলোকের সাক্ষ্যহিসাবে যখনই আমরা মাইকেলের ইংরেজি বুলির উপর নির্ভর করেছি তখনই কবি মধুসূদনকে বুঝবার পথে এসেছে বিভ্রান্তি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়ে মাইকেল ইংলণ্ডে অত্যন্ত দুরবস্থায় পতিত হন। পত্নী ও শিশুসন্তানদের দেশে রেখেই তিনি বিলেত গিয়েছিলেন, কিন্তু আত্মীয়দের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর পত্নী উপায়ান্তর না দেখে অনাথ শিশুদের নিয়ে স্বামীর কাছে চলে যেতে বাধ্য হন। নিজেরই খরচ চলছিল না, তারপর পরিবারের দায়িত্ব! মধুসূদন অকূলে ভাসলেন। অল্প খরচে চলবে বলে ফ্রান্সে ভার্সাই শহরে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু তাতেও সংকটত্রাণের পথ পাওয়া গেল না। মাইকেল তখন বিদ্যাসাগরের শরণাপন্ন হলেন। আর্ত ও বিপন্ন মাইকেল লিখছেন :

You will be startled, I am sure, grieved to learn that I am at this moment the wreck of the strong and hearty

man who bade you adieu two years ago with a bounding heart and that this calamity has been brought upon me by the cruel and inexplicable conduct of men, one of whom at least, I felt strongly pursuaded, was my friend and well-wisher...

I am going to a French jail and my poor wife and children must seek shelter in a charitable institution ..

I have been obliged to appeal to the generosity of the English clergyman here to save us from starvation and he has just lent me from his "Poor-fund" 25 Francs, that is about 9 Rs. God alone knows what will become of us if there is no money by the two remaining mails of this month. I am afraid we shall perish···

If I had not little helpless children and my wife with me, I should kill myself, for there is nothing in the instrument of misery and humiliation, however base and low, which I have not sounded !'

যে বিদ্যাসাগরকে মাইকেল নিজেই এই নিঃসহায় রিক্ত ও ক্লিন্ন জীবনের কথা লিখেছেন, সেই বিদ্যাসাগরের উদ্দেশেই কবি মধুসূদন লিখেছেন :

হায় রে, কোথা সে বিদ্যা, যে বিদ্যার বলে,
দূরে থাকি পার্থ রথী তোমার চরণে
প্রণমিলা, দ্রোণগুরু! আপন কুশলে
তুষিলা তোমার কর্ণ গোগৃহের রণে ?
এ মম মিনতি, দেব, আসি অকিঞ্চনে
শিখাও সে মহাবিদ্যা এ দূর অঞ্চলে।
তা হলে, পূজিব আজি, মজি কুতূহলে,
মানি যাঁরে, পদ তাঁর ভারত-ভবনে !
নমি পায়ে কব কানে অতি মৃদুস্বরে,—

বেঁচে আছে আজু দাস তোমার প্রসাদে,
অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ;
কেড়ে লব রাজপদ তব আশীর্বাদে।—
কত যে কি বিদ্যা-লাভ দ্বাদশ বৎসরে
করিনু, দেখিবে, দেব, স্নেহের আহ্লাদে।[৭]

মাইকেলে আর মধুসূদনে কত তফাত! একজন ভিক্ষান্নজীবী পরানুগ্রহপ্রার্থী দুর্বল মানুষ, আর একজন চিরবিজয়ী পাণ্ডবরথী পার্থ। বিপন্ন আর বিপন্মুক্ত বলেই এ পার্থক্য দেখা দেয় নি। মধুসূদন মহাকাব্যলোকে যে বীরজগৎ আবিষ্কার করেছিলেন তিনি নিজেও ছিলেন সেই বীরজগতেরই অপরাজেয় যোদ্ধৃপুরুষ। ভিখারী মাইকেলের ক্ষীণকণ্ঠের কাতর আর্তনাদ সেখানে পৌঁছায় না।

মাইকেলি-বুলির আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য লেখার সময় মাইকেল রাজনারায়ণকে লিখছেন, 'Mrs. Radha is not such a bad woman after all.' মাইকেলের কাছে ব্রজাঙ্গনা ছিলেন Mrs. Radha! কিন্তু মধুসূদন তাঁকে কি ভাবে দেখেছেন বুঝবার চেষ্টা করা যাক। মধুসূদন বৈষ্ণব মহাজন ছিলেন না, বলাই বাহুল্য। কিন্তু রাধাপ্রেম যে সাধারণ পরকীয়া-প্রেমের অনেক ঊর্ধ্বে, তাঁর কবিসংস্কারে তা অগোচর ছিল না। তাই তিনি গ্রন্থারম্ভে পদাঙ্কদূতের উদ্ধৃতি দিয়ে রাধাপ্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। পূর্ণ শ্লোকটি হল :

গোপীভর্তুর্বিরহবিধুরা কাচিদিন্দীবরাক্ষী
উন্মত্তেব স্খলিত-কবরী নিঃশ্বসন্তী বিশালম্।
অত্রৈবাস্তে মুররিপুরিতি ভ্রান্তিদূতীসহায়া
ত্যক্ত্বা গেহং ঝটিতি যমুনা-মঞ্জুকুঞ্জং জগাম ॥

রসশাস্ত্রে যাকে বিরহের 'উন্মাদ'-দশা বলে, তদ্গতচিত্ততাহেতু সেই ভ্রান্তিরূপ উন্মাদ অবস্থাতেই কবি রাধাকে মানসলোকে প্রত্যক্ষ

করেছেন। ভক্তের নয়, কবির সেই উত্তুঙ্গ রসকল্পনা থেকেই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের সৃষ্টি। চতুর্দশপদীর উপক্রমে কবি বলেছেন :

কল্পনা দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজ-ধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)—

এই শ্যামহারা বিরহে-বিহ্বলা রাধাকে মধুসূদন শুধু ‘Ode’ রচনার আলম্বন-রূপেই ব্যবহার করেন নি। বাঙালীর রসপিপাসায় রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যে ওতপ্রোত হয়ে আছে সে চেতনা কবি মধুসূদনের অবশ্যই ছিল। কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতাবলী না পড়লে সে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। ‘জয়দেব’, ‘দেবদোল’ এবং ‘ব্রজবৃত্তান্ত’ কবিতায় মধুসূদন বাঙালীমানসের সেই বৈষ্ণব রসপিপাসাকেই, ভক্তিরস-রূপে নয়, মধুররস-রূপে আস্বাদন করেছেন। লিরিক বা গীতিকাব্য হিসাবে ‘ব্রজবৃত্তান্ত’ কবিতাটির তুলনা মেলা ভার।—

আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে, ব্রজের সুন্দরী ?
আর কি পড়ে লো এবে তোর জলে খসি
অশ্রু-ধারা ; মুকুতার কম রূপ ধরি ?
বিন্দা,—চন্দ্রাননা দূতী—ক মোরে রূপসি
কালিন্দি, পার কি আর হয় ও লহরী,
কহিতে রাধার কথা, রাজ-পুরে পশি,
নবরাজে, কর-যুগ ভয়ে জোড় করি ?—
বঙ্গের হৃদয়-রূপ রঙ্গ-ভূমি-তলে
সাঙ্গিল কি এতদিনে গোকুলের লীলা ?
কোথায় রাখাল-রাজ পীত-ধড়া গলে ?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা !

বাঙালী-হৃদয়ের এই ব্রজলীলা, এই মুক্ত প্রেমপিপাসা যে বাঙালীর রসচেতনার একটি মধুর সম্পদ সে তত্ত্ব মধুমানসে কমল-কান্তিতেই সুপরিস্ফুট ছিল। তিনি জানতেন 'the vile imagination of poetasters' অর্থাৎ কবিওয়ালাদের দুষ্টকল্পনার ফলেই রাধার দুর্গতি ঘটেছে। বৈষ্ণব-বাঙালীর মানস-রাধাকে তাই তিনি বাংলা কাব্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে যত্নবান হয়েছিলেন। ব্রজবৃত্তান্তের ষট্‌কবন্ধের এই জিজ্ঞাসারই যেন প্রতিধ্বনি শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথের 'একাল ও সেকাল' কবিতায় :

আজো আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
    শরতের পূর্ণিমায়
    শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
    এখনো প্রেমের খেলা
    সারা দিন, সারা বেলা,
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়-কুটিরে। [৮]

বলাই বাহুল্য, দুটি কবিতা একই সুরে বাঁধা। পূর্বসূরির কাব্যে যা জিজ্ঞাসার আকারে দেখা দিয়েছে উত্তরসূরির কাব্যে তাই ধরা পড়েছে উত্তরের ভাষায়। রবীন্দ্রনাথ মানবের হৃদয়-কুটিরে যে-রাধার ক্রন্দন শুনেছেন তিনি মধুসূদনেরই মানসরাধা; মাইকেলের Mrs. Radha নয়। মাইকেলি বুলির আর একটি মারাত্মক উদাহরণ হল রাম-রাবণ সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বাস : 'I despise Ram and his rabble ; but the idea of Ravan elevates and kindles my imagination ; he was a grand fellow.' মাইকেলের এই উক্তিই মধুসূদনের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি, সবচেয়ে

বড় সর্বনাশ করেছে। কারণ এই উক্তিকে কেন্দ্র করেই তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি সম্পর্কে সবচেয়ে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

২

বাংলা ভাষায় প্রথম সনেট মধুসূদনের 'কবিমাতৃভাষা'। ১৮৬০ সনে কলিকাতায় রচিত। য়ুরোপীয় নবজন্ম বা রেনেসাঁসের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হল মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্তি এবং তার সম্যক্ অনুশীলন। মধুসূদনের 'কবিমাতৃভাষা'য় সেই সত্যেরই প্রকাশ। পরবর্তী কালে কবি তাঁর 'কবিমাতৃভাষা'কে 'বঙ্গভাষা'য় পরিমার্জিত করেছেন এবং চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'উপক্রম'-এর পরেই সর্বপ্রথমে তার স্থান নির্দেশ করেছেন। শিক্ষিত বাঙালীর সর্বজনকণ্ঠের সেই প্রিয় কবিতার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই কবিতার মধ্যে শুধু মধুসূদনের মানসলোকের দিক্‌পরিবর্তনেরই সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না, ওর মধ্যে স্পন্দিত হয়েছে বাঙালীর নবজন্মের মর্মকথাটি। বিদেশী শাসকবৃন্দের দিগ্‌বিজয়ী ভাষার অক্টোপাশবন্ধন থেকে যেদিন বাঙালী-কণ্ঠ মাতৃভাষার আনন্দলোকে মুক্তির সন্ধান পেল, সেদিনই নবজাগ্রত বাংলার আত্মপ্রকাশ শৃঙ্খলমুক্ত হল, আর সেই হল বিদেশী-শাসক-রচিত শৃঙ্খলমোচনের প্রথম পদক্ষেপ।

প্রথম বাংলা সনেট কলিকাতায় রচিত হলেও মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলীর প্রথম সংস্করণের বাকি সনেটগুলি রচিত হয়েছে ফরাসি দেশে কবির প্রবাসজীবনে। ১৮৬৫ সনের ২৬শে জানুয়ারি তারিখে বন্ধু গৌরদাসকে লিখিত পত্রে কবি জানাচ্ছেন যে, ইতালীয় পদ্ধতিতে তিনি সনেট রচনা শুরু করেছেন। সম্ভবতঃ সে

সময়ে তাঁর প্রথম সনেট 'জন্মভূমিস্তনে দুগ্ধ-স্রোতোরূপী' কপোতাক্ষ নদ। কপোতাক্ষ নদই সর্বাগ্রে কবিকল্পনায় এসেছে কি না বলা শক্ত, তবে প্রথম চারটি সনেট হল অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, জয়দেব, সায়ংকাল ও কপোতাক্ষ [কবির আদরের ভাষায় 'কবতক্ষ'] নদ। ১৮৬৫ সনেই মধুসূদনের শতাধিক সনেট রচিত হয় এবং পর-বৎসর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কলিকাতায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা প্রয়োজন যে, ১৮৬৫ সনেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ আবিষ্কৃত হল। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে বাংলার কথাসাহিত্য এবং মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে বাংলার লিরিক বা গীতিকাব্য। এই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই মধুসূদনের কবিজীবনের পূর্ণাহুতি। এই পূর্ণাহুতির জন্যে কবির য়ুরোপ-পরিক্রমা অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক ছিল।

জীবনচরিতে যোগীন্দ্রনাথ অবশ্য অন্য কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য হল, "তিনি যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে গিয়াছিলেন তাহা তাঁহার উপযুক্ত ছিল না।...কি পরীক্ষাস্থলে এবং তাহার পর কি কর্মক্ষেত্রে, কোথাও তিনি ব্যবহারশাস্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর অধ্যয়নের পর কোনও রূপে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন; উল্লেখযোগ্য কোনও সম্মান তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।...মধুসূদন যদি ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশীয়গণই যে কেবল উপকৃত হইতেন তাহা নহে, তিনি নিজেও বোধ হয় সুখী হইতে পারিতেন। কিন্তু বিধাতার তাহা ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার দ্বারা যতটুকু কার্য করাইয়া লইবার বিধাতার ইচ্ছা ছিল, তাহা সম্পন্ন হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকে অন্য পথে প্রেরণ করিলেন।"[৯]

যোগীন্দ্রনাথের এই শেষ মন্তব্য কবি মধুসূদন সম্পর্কে প্রযোজ্য

নয়, ব্যারিস্টার মাইকেল সম্পর্কেই গ্রাহ্য। আসলে মধুবিধাতা জানতেন যে, কবির কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। গীতিকাব্যের মধ্য দিয়ে কবিকথার আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক বাংলা কাব্যের জন্মদাতার সৃষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ হতেই পারে না। আর সুখী হওয়া? মধুবিধাতা তাঁর ভাগ্যে সুখ লেখেন নি। 'শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্যং বা সাধয়েয়ম্'—এই হল মধুজীবনের মূলমন্ত্র। আর তাঁর এমনই ভাগ্য যে, শরীর পাত না করা পর্যন্ত তাঁর কার্যসিদ্ধি সম্ভব হত না। মধুসূদনের জীবনের দুটি অধ্যায় এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে স্মরণীয়। মাদ্রাজ-প্রবাসে মহামতি রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র যখন তাঁর জীবনের ঘনদুর্যোগ এবং চরম দুর্দিনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছেন তখনই কবির ভাগ্যদেবতা তাঁকে প্রস্তুত করছেন মহত্তম কার্যসাধনের জন্য। মাদ্রাজেই মধুসূদনের প্রথম অজ্ঞাতবাসের গোপন তপশ্চর্যার কাল কেটেছে। সেখানেই তিনি হিব্রু, লাতিন, গ্রীক ও সংস্কৃতের সারস্বত-মন্দিরে প্রবেশ করে প্রাচীন প্রজ্ঞা ও বিদ্যার পুনরুজ্জীবন ঘটালেন। পৃথিবীর মহাকাব্যযুগের মহিমান্বিত ঐশ্বর্যের রুদ্ধদ্বার তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হল। আর তাঁর দ্বিতীয় অজ্ঞাতবাসের চরম লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই তাঁর কাছে উন্মীলিত হল য়ুরোপীয় নবজন্মের শ্রেষ্ঠ দান—আধুনিক য়ুরোপের ভাষা ও সাহিত্য। ফরাসি, ইতালি ও জার্মান ভাষার অন্তঃপুরে প্রবেশের পূর্ণ সুযোগ পেলেন তিনি। গৌরদাসকে কবি লিখেছিলেন, একটি শ্রেষ্ঠ য়ুরোপীয় ভাষায় জ্ঞানলাভ করা একটি বিরাট ও সুকর্ষিত ভূভাগের উপর আধিপত্য বিস্তার করারই সমকক্ষ।[১০] পৃথিবীর প্রাচীন ভাষাসমূহের অনুশীলনের ফলে যেমন মধুসূদনের হাতে মহাকাব্যের জন্ম হয়েছিল, আধুনিক য়ুরোপীয় ভাষাসমূহের মর্মলোকে অনুবিষ্ট হওয়ার ফলে তেমনই তাঁর হাতে জন্ম হল গীতিকাব্যের। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর সাধনা নীলকণ্ঠের সাধনা। মধুসূদনের ব্যক্তিপুরুষ আর কবিপুরুষ—দুটির

সন্তান আর অদিতির সন্তান—এই দু পক্ষের সহযোগে জীবনসমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত আর হলাহল উঠেছিল নীলকণ্ঠ মধুসূদন স্বয়ং স্বেচ্ছায় সেই হলাহল কণ্ঠে নিয়েছিলেন বলেই কাব্যলোকে অমৃত বিতরণের তিনি অধিকারী হয়েছিলেন। 'শ্যামা পক্ষী' কবিতায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের ক্রন্দনসংগীত শুনে কবি বলেছিলেন :

কবির কুভাগ্য তোর, আমি ভাবি মনে।
দুঃখের আঁধারে মজি গাইস বিরলে
তুই, পাখি, মজায়ে রে মধু-বরিষণে!
কে জানে যাতনা কত তোর ভবতলে?
মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে।

এই হুতাশনদাহে অহোরাত্র দগ্ধ হওয়াই কবির নিয়তি। মধুসূদনের জীবন যেন তার চরম নিদর্শন। আর তারও চূড়ান্ত অধ্যায় কেটেছে ফ্রান্সে। সে জন্যেই কবির চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশও ঘটেছে তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে।

৩

য়ুরোপ-প্রবাসে না গেলে মধুসূদন য়ুরোপীয় নবজন্মের আদি-গঙ্গোত্রীর সঙ্গে পূর্ণপরিচয় লাভের সুযোগ পেতেন না। নবজন্মের প্রাণপুরুষ পেত্রার্কার সঙ্গেও তাঁর আত্মিক যোগাযোগ সম্ভব হত না। গেলেন ইংলণ্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে, অথচ ভাগ্যবিধাতার নির্দেশে তাঁকে ফ্রান্সেই প্রবাস-জীবনের দীর্ঘদিন কাটাতে হল। আর ফ্রান্সের সঙ্গে ইতালির সাহিত্যসংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগের কথা কে না জানে! কৈশোরে বয়ঃসন্ধিলগ্নে হিন্দু-কলেজের বিদ্যার্থী হিসাবে মধুসূদন ইংরেজি সাহিত্যসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে

আধুনিক য়ুরোপের ভাবলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরস্বলুণ্ঠনকারী সাম্রাজ্যবাদী বৈশ্যবৃত্ত ইংরেজের কলুষিত স্পর্শ তার সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই কলুষ থেকে মুক্ত, উদার পটভূমিতে নবজন্মোত্তর য়ুরোপকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়োজন ছিল ভারতীয় নবজন্মের কবিপুরুষ মধুসূদনের। আর এদিক দিয়ে ফ্রান্সের চেয়ে যোগ্যতর পটভূমি আর কি হতে পারে! আধুনিক য়ুরোপের 'কবিমাতৃভূমি' প্রভাঁস ফ্রান্সেরই অংশ এবং ইতালির সঙ্গে ফ্রান্সেরই আত্মিক যোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। তা ছাড়া ১৯১৭ সনের পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক পৃথিবীর বৃহত্তম ও মহত্তম মানবযজ্ঞ হয়েছিল এই ফ্রান্সেরই পুণ্যভূমিতে। তাই মধুসূদনের সর্বশেষ আত্মসংস্কারের জন্য আধুনিক য়ুরোপের যজ্ঞবেদীর সেই হোমানলশিখার পুণ্যস্পর্শের প্রয়োজন ছিল।

মধুসূদন সম্পর্কে এই সত্যটুকু আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তাই আমরা তাঁকে মনে-প্রাণে ইংরেজ বলেই জেনে এসেছি। আমরা জেনে এসেছি মধুসূদন মিলটনকেই কাব্যোৎকর্ষের অনতিক্রম্য আদর্শ বলে মনে করতেন। ইংরেজি ভাষায় কবিতা লিখে বায়রনের কবিখ্যাতির সমকক্ষ হওয়া, এবং মনে প্রাণে আচারে আচরণে, কাব্যে চিন্তায় স্বপ্নে, ইংরেজ হয়ে ওঠাই তরুণ মধুর একমাত্র কাম্য ও আরাধ্য ছিল। আমরা জেনে এসেছি দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'র নিমাইচাঁদই মধুচরিত্রের নাট্যরূপ। তাই হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুসূদনের ইংরেজি বুকনিই তাঁকে চেনবার পক্ষে আমাদের একমাত্র ও অভ্রান্ত সাক্ষ্য ও সহায় হয়ে উঠেছে।

কিন্তু মধুসূদন চতুর্দশপদীতে নিজেকে কুরুক্ষেত্রের যে মহানায়কের সঙ্গে তুলনা করেছেন সেই পার্থের অজ্ঞাতবাসের মত তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনাও লোকলোচনের অন্তরালে অজ্ঞাতবাসেই সাধিত হয়েছে। মধুসূদনের জীবনে সে অজ্ঞাতবাস আবার দু-দুবার ঘটেছে।

প্রথমবার মাদ্রাজে, দ্বিতীয়বার আরও দূরে, আরও কঠিন তপশ্চর্যার ক্ষেত্র ফ্রান্সে। মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাসে মধুসূদনের অন্তর্জীবন-কথা সম্পূর্ণভাবে জানাবার উপায় নেই। কিন্তু সেখানে তাঁর জীবনের একটি ইঙ্গিত বিশেষ ব্যঞ্জনাময়। সেখানে মধুসূদনের জীবনে এসেছিলেন দুটি নারী। এই দুই নারী যেন প্রেমিক-কবি মধুসূদনের জীবনে দুটি দিব্য সংকেত। ইংরেজনন্দিনী রেবেকার সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। অল্পদিনের ঘরকন্না, সন্তান-সন্ততিও হয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্ক ক্ষণস্থায়ী। মধুসূদনের সঙ্গে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর বিচ্ছেদ হয়ে গেল। তারপর এলেন তাঁর জীবনে ফরাসি-দুহিতা আঁরিয়েৎ; তাঁর প্রেমলক্ষ্মী, তাঁর আজীবন সঙ্গিনী, তাঁর কবিজীবনের নিত্যপ্রেরণা। ইংরেজনন্দিনীর সঙ্গে এই ডিভোর্স এবং ফরাসি-দুহিতার সঙ্গে এই অবিচ্ছেদ্য রাখীবন্ধন ; এক জনের সঙ্গে শাস্ত্রসম্মত উদ্বাহ, আর এক জনের সঙ্গে প্রাণের আকর্ষণে মর্মের যোগ ;– এর মধ্যেই মধুসূদনের অন্তর্জীবনের গূঢ় সত্য লুক্কায়িত।

মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাসেই হিন্দু কলেজের ইংরেজি ভাষার বিদ্যার্থী প্রাচীন প্রজ্ঞাভূমির তপশ্চারী সাধকে রূপান্তরিত হলেন। ইয়ংবেঙ্গলের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য দেখা দিল। তাই কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর প্রাথমিক সাহিত্য-খসড়া 'একেই কি বলে সভ্যতা'র প্রহসন-রহস্যে ইয়ংবেঙ্গলই তাঁর বিষয়ালম্বন হল। মধুসূদন বাংলার নবজীবনের ভগীরথ। কিন্তু নবজীবনের জোয়ার যেখানে দুকূলপ্লাবী পঙ্কিলতায় অসংযত, সেখানে তাঁর বাণী ক্ষুরধার। হিন্দু-কলেজীয় সর্বসংস্কার-মুক্তির আদর্শ কি ভাবে তৎকালীন ইয়ংবেঙ্গলের জীবনে উচ্ছৃঙ্খল স্বৈরাচারের মহাসনদ হয়ে উঠেছিল, 'একেই কি বলে সভ্যতা' তারই হাস্যোজ্জ্বল নাট্যালেখ্য। তাঁর এই নাটকের বিষয় পূর্বে অবগত হয়ে সেদিনকার উগ্র তরুণেরা প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে এর

প্রকাশ এবং অভিনয় কিছুতেই সম্ভব না হয়। কিন্তু সে বাধার ঐরাবত ঠেলে কবিকথার ভাগীরথীপ্রবাহ চিরমুক্ত হয়েছে। জ্ঞান-তরঙ্গিনী-সভায় 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নায়ক নবকুমারের বক্তৃতা শোনা যাক :

নব। জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম ; কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে, স্রুপরষ্টিশনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েচি, আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করিনে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে, এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোশীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।

সকলে। হিয়ার হিয়ার !!

নব। জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর, তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, তোমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয় !

সকলে। হিয়ার, হিয়ার !!

নব। কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা ; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটী হল—অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুশি, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন, ইন দি নেম অব ফ্রীডম, লেট অস এঞ্জয় আওরসেলভস !

সমাজ-সংস্কারের আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বারবনিতাগৃহকে 'লিবরটী হল' মনে করার মধ্যে যে বিভ্রান্তি ও উৎকেন্দ্রিকতা সেদিনকার তরুণ বাঙালী-জীবনকে কলুষিত করেছিল এখানে তারই রসসংকেত। যে প্রাতিভ দৃষ্টিতে বিশ্বের এবং আপনার অন্তর্লোক স্বচ্ছ হয়ে ওঠে সেই কবিদৃষ্টি নিয়ে এখানে তিনি জীবনের গভীরে ডুব দিয়েছেন। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় কবির সেই আত্মসমীক্ষণই প্রহসনের

অট্টহাসিতে বিদীর্ণ হয়েছে। আর, সেই আত্মসমীক্ষণেরই অমর সংগীত :

> মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
> কেলিনু শৈবলে ভুলি কমল-কানন।

মহাকবি তাঁর ফ্রান্স-প্রবাসে ইংরেজি সাহিত্যের শৈবালক্ষেত্র পেরিয়ে য়ুরোপীয় মহাসরস্বতীর কমলবনে উপনীত হলেন। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কবিকুলধন ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা আছেন, কবিগুরু দান্তে আছেন, কবিবর ভিক্‌তর হ্যুগো আছেন, ভারত-সাহিত্য-প্রেমিক বলে পণ্ডিত থিওডোর গোল্‌ড্‌স্টুকরও আছেন ; অর্থাৎ ইতালি, ফ্রান্স, জর্মনি আছে ; কিন্তু নেই ইংলণ্ড। এমন কি, নেই শেক্‌স্‌পীয়র, নেই মিলটন। শুধু ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি পূর্ব-সৌহার্দ্যের প্রীতিস্মরণবশেই যেন আছেন কবিবর আলফ্রেড টেনিসন। কিন্তু সেখানে মধুসূদনের কণ্ঠ অনুরাগী ভক্তের কণ্ঠ নয়; সারস্বতক্ষেত্রে সতীর্থ কবিবন্ধুর উদ্দেশে মহাকবির শুভেচ্ছাই সেখানে উচ্চারিত হয়েছে।

বস্তুতঃ য়ুরোপক্ষেত্রে মধুসূদন আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ, অতীত গৌরবে উদাত্তকণ্ঠ ভারতের মহাকবিরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। আধুনিক য়ুরোপের কবিকুলগুরু দান্তের ষট্‌-শতবার্ষিকীতে তাই ভারতের কবি-প্রতিনিধিরূপেই তাঁর আত্মপ্রকাশ। সেখানে মধুসূদন তাঁর মাতৃভাষায় একটি চতুর্দশপদী রচনা করে তাঁর স্বীয় আদর্শ-মুদ্রাঙ্কিত পত্রপর্ণে দান্তের উদ্দেশে বাঙালী কবির প্রীতি-উপহার পাঠিয়েছেন। ইংরেজিতে নয়, ফরাসি ভাষায় একটি কাব্য তর্জমাও তৎসঙ্গে যুক্ত আছে। কিন্তু মূল উপহারটি নবজাগ্রত বাঙালীর মাতৃভাষাতেই প্রদত্ত। নীচে কবির স্বাক্ষর—'শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত'। তাঁর উপহারের ভূমিকাস্বরূপ যে পত্রখানি মধুসূদন ইতালির

রাজার নিকট লেখেন তাতে ভারতীয়সুলভ সুবিনয়ের সঙ্গেই তিনি বলেছেন, "এই পত্রলেখক এক সামান্য পদ্যকার। তিনি কবি বলে পরিচয় দেবার স্পর্ধা করেন না। তাঁর জন্ম গঙ্গার তীরে,...তাঁর প্রার্থনা, ইতালি কবিগুরু দান্তের স্মৃতিস্তম্ভ যে মাল্য দিয়ে বিভূষিত করবে, প্রাচ্যের এই ক্ষুদ্র ফুলটি যেন তার সঙ্গে যুক্ত হয়।" উত্তরে রাজার পক্ষ থেকে তাঁর সচিব লিখেছেন, "আলিঘিএরির সমাধিস্তম্ভে অর্পণ করার জন্যে আপনি যে প্রাচ্যদেশীয় ফুলটি পাঠিয়েছেন, তা ইতালি-রাজ গ্রহণ করেছেন এবং তিনি আশা করেন অদূর ভবিষ্যতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে মৈত্রীর সূত্রে আবদ্ধ করবার যে ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য এতকাল ইতালি পোষণ করেছে তা পূর্ণ হবে।"[১১]

আধুনিক কালে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এই মধুর ও সুন্দর রাখীবন্ধন বাংলার মহাকবি মধুসূদনের দ্বারাই প্রথম সম্পন্ন হল। য়ুরোপ-পরিক্রমায় রামমোহন ও দ্বারকানাথ মধুসূদনের অগ্রগামী সন্দেহ নেই, কিন্তু আধুনিক যুগে মধুসূদনই য়ুরোপক্ষেত্রে চারুকলাচর্চিত ভারতের প্রথম সংস্কৃতিদূত।

৪

মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতা পেত্রার্কার বিশুদ্ধ সনেটের আদর্শে লিখিত। ইংরেজির বিকার-কলুষিত স্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে য়ুরোপীয় নবজন্মের অভিনব কাব্যকলাকৃতিকে মধুসূদন পূর্ণবিশুদ্ধিতেই বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন। আমরা 'সনেটের জন্মকথা'য় সনেটের স্বরূপ সম্পর্কে যা বলেছি, এই প্রসঙ্গে তা পুনঃস্মরণীয়। অর্থাৎ সনেটের ছন্দ-মিল এবং ভাবের বাহ্য ও আভ্যন্তর

সঙ্গতি এবং আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করে আসক্তি-মুক্তি-লীলায় তাকে বিলসিত করে তোলাই সনেট-রচয়িতার মুখ্য শিল্পকৃত্য।

প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, পেত্রার্কার Organic Formই মধুসূদনের আত্মপ্রকাশের Organic Form হয়ে উঠেছে, কেন না পেত্রার্কার কবিমানসের সঙ্গে মধুসূদনেরও কবিমানসের আশ্চর্য সাধর্ম্য বিদ্যমান। পূর্ব অধ্যায়ে আমরা পেত্রার্কার জীবন ও মনোলোকের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেছি। তা স্মরণ করলে এবং মধুসূদনের জীবনবৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করে তার সঙ্গে মেলালে দেখা যাবে যে, পেত্রার্কা ও মধুসূদন সমানধর্মা কবিপুরুষ। পেত্রার্কা য়ুরোপীয় নবজন্মের জনয়িতা, মধুসূদনও, আমি প্রথমেই বলেছি, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের নবজন্ম বা রেনেসাঁসের কবিপুরুষ।

মধুসূদনের চতুর্দশপদী বাহ্য ও আভ্যন্তর—উভয় সঙ্গতিতেই বিশুদ্ধ সনেটের কঠিন আদর্শকে অটুট রেখেছে। প্রথমে বাহ্য-সঙ্গতির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। মধুসূদনের সনেট অষ্টক ও ষট্‌ক-বন্ধে রচিত। কয়েকটি অনুত্তীর্ণ কবিতা ছাড়া সর্বত্রই অষ্টক ও ষট্‌ক-বন্ধে আবর্তন-সন্ধিতে ছন্দ ও ভাবের লীলাবিলাস সার্থক।[১২] অষ্টকে মধুসূদন দুটি মিলের মিলনে অষ্টপদী বন্ধন রচনা করেছেন। কিন্তু মিলবন্ধনের পর্যায়-বিন্যাসে তাঁর সনেটে চারটি বৈচিত্র্য ধরা দিয়েছে। প্রথম পর্যায়ের সনেটে চতুষ্কযুগল সংবৃত, দ্বিতীয় পর্যায়ে চতুষ্কযুগল বিবৃত, তৃতীয় পর্যায়ে প্রথম চতুষ্ক সংবৃত কিন্তু দ্বিতীয়টি বিবৃত, আর চতুর্থ পর্যায়ে প্রথমটি বিবৃত দ্বিতীয়টি সংবৃত।[১৩] কিন্তু সর্বত্রই দুটি মাত্র মিল এবং সেখানেই তাঁর সনেট গোত্রে পেত্রার্কান। তথাকথিত শেক্‌স্‌পীয়রীয় বা ইংলণ্ডের 'স্বদেশী সনেটে'র অন্ত্যজ-স্পর্শ মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে কোথাও নেই। অনেকের ধারণা অষ্টকে সংবৃত চতুষ্কযুগল-রচনাই পেত্রার্কার

একমাত্র রীতি। কিন্তু সে ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। 'The Oxford Book of Italian Verse' নামক সংকলনগ্রন্থে পেত্রার্কার তেত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে পঁচিশটি সনেট। এই পঁচিশটি বিশুদ্ধ পেত্রার্কান সনেটের মধ্যে ৮৩ ও ৮৭ সংখ্যক দুটি সনেটের মিলবন্ধন বিবৃত অর্থাৎ পদান্তরপর্যায়বিন্যাসে বিন্যস্ত। উক্ত সংকলন-গ্রন্থে দান্তেরও বারোটি সনেট রয়েছে। তন্মধ্যে দশটি সংবৃত, দুটি বিবৃত। কাজেই বিবৃত চতুষ্কযুগলে সনেটের বিশুদ্ধি নষ্ট হয় না, কিন্তু অষ্টপদে দুটির বেশি মিল হলেই মিলবন্ধনে কৌলীন্যহানি ঘটে। মধুসূদনের বিবৃত চতুষ্কযুগলের মধ্যেও আবার দুটি রীতি পরিলক্ষিত হয়। প্রথম রীতিতে মিল হল ক চ ক চ ঃ ক চ ক চ। দ্বিতীয় রীতিতে ক চ ক চ ঃ চ ক চ ক। এই দ্বিতীয় রীতিতে প্রথম চতুষ্কের দক্ষিণাবর্ত মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে বামাবর্তে পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তার ফলে বিবৃত রীতিতেও এক নতুন ধরনের সংবৃতি-ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। মধুসূদনের তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের মিলবন্ধনেও কবিপ্রজাপতি নবযোটক রচনা করেছেন, কিন্তু কৌলীন্য অক্ষুণ্ণই রয়েছে।

ষট্কবন্ধে মধুসূদন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দুটি মিলের ব্যবহার করেছেন, কদাচিৎ কখনও তিনটি। তাঁর দুই মিলের ত্রিক-যুগল বিবৃত, পদান্তরপর্যায়ে বিন্যস্ত। তিন মিলের মিলনও বিবৃতি অর্থাৎ মুক্তিধর্মী।[১৪] কেবল চারটি কবিতায় মধুসূদন মিত্রাক্ষর-যুগ্মকে তাঁর চতুর্দশপদী সমাপ্ত করেছেন।[১৫] মিত্রাক্ষর-যুগ্মকে সনেটের সমাপ্তি সনেট-কলার আদর্শ নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম পেত্রার্কাতেও আছে। এনিড হেমার তাঁর ইংরেজি সনেট-সংকলন-গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, পেত্রার্কারও একটি সনেট মিত্রাক্ষর যুগ্মকে সমাপ্ত হয়েছে।[১৬] তবু তা আদর্শ সনেটের অগৌরব।

মধুসূদনের সনেটের একটি বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ চোখে পড়ে না।

মিলের দিক দিয়ে স্বরান্তশব্দবহুল ইতালীয় সনেটে দুটি স্বরান্ত অক্ষরে অক্ষরে Double Rhyme-এর মিল। ইংরেজি ভাষায় ব্যঞ্জনান্তবহুল শব্দের ফলে ইতালির এই মিলপদ্ধতি নিয়ে ইংরেজ কবিরা বড়ই বিব্রত হয়েছিলেন। তাঁরা কোনদিনই ইতালীয় সনেটের দুই স্বরান্ত অক্ষরের মিলের মাধুর্য ইংরেজি ভাষায় আনতে পারেন নি। কিন্তু মধুসূদনের সনেটে ইতালীয় মিলের মাধুর্য সুরক্ষিত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, তাঁর সনেটগুলিতে, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র, স্বরান্ত মিলেরই সাম্রাজ্য। আমরা মধুসূদনকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের কবি বলেই জানি। কিন্তু মিত্রাক্ষর ছন্দেরও যে তিনিই নবরূপনির্মাতা, সে কথা ভুলে যাই। তাঁর ব্রজাঙ্গনাতে তিনি প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিলেন, কিন্তু সনেটেই তাঁর মিলের মণিকাঞ্চনযোগ। যুগ্মাক্ষর অন্ত্যমিল রচনায় প্রাচীন বাংলা কাব্যে ভারতচন্দ্র ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আধুনিক বাংলা কাব্যে এদিক দিয়ে মধুসূদনের কৃতিত্বও অবিস্মরণীয়। মিলের মিলন সনেটের একটি প্রধান সম্পদ। মধুসূদনের সনেট সেদিক দিয়েও সম্পদশালী।[১১]

মধুসূদন চতুর্দশাক্ষর পয়ার-পদেই সনেট-পদের দৈর্ঘ্য নিরূপিত করেছেন। পরে অষ্টাদশাক্ষর মহাপয়ারও সনেট-পদের দৈর্ঘ্যরূপে গৃহীত হয়েছে এবং সার্থকভাবেই গৃহীত হয়েছে। তবু চতুর্দশীর তন্বী-রূপটি যেন চতুর্দশ অক্ষরেই সমধিক লাবণ্য-মণ্ডিত। তানপ্রধান পয়াররীতিই সনেটের ছন্দঃস্পন্দের বাহন, ধ্বনিপ্রধানের বংশীরবে সনেটের শঙ্খধ্বনি নেই, শ্বাসাঘাত-প্রধানের মাদলবাদ্য ধ্যানসমুত্থ কবিচেতনার পক্ষে একেবারেই শ্রুতিবিগর্হিত।

মধুসূদনের বিষয়ালম্বন নিয়ে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এখানেই পেত্রার্কার সঙ্গে তাঁর বৈসাদৃশ্য। পেত্রার্কার সনেট প্রেমকাব্য। মধুসূদনের সনেট বিচিত্র ভাব ও বিষয়ের অবলম্বনে বিচিত্র রসের

লীলাক্ষেত্র। পেত্রার্কার Canzonier বা গীতি-কাব্যে প্রেমই মুখ্য বটে, কিন্তু প্রেমই সর্বস্ব নয়। বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, পেত্রার্কার তিন শতাধিক সনেটের মধ্যে চল্লিশটি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে লেখা। তা ছাড়া পাখি ও প্রকৃতিকে নিয়েও অনেক সনেট আছে। আসলে আধুনিক গীতিকাব্য হিসাবে সনেটও কবিকথা। পেত্রার্কা যে-বিষয় নিয়েই লিখে থাকুন না কেন, তাঁর আত্মকথাই সনেটে বিলসিত। মধুসূদনের সনেটও তাঁর আত্মকথা। উদ্দীপন-বিভাবে তারা বিচিত্র; কিন্তু আলম্বন-বিভাবে তারা এক, সে আলম্বন কবিচিত্ত।

এবার একটি উদাহরণের সাহায্যে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুরণের চেষ্টা করব। মধুসূদনের "দুঃশাসন" কবিতা। পাণ্ডবলক্ষ্মী পাঞ্চালীর কেশপাশ আকর্ষণ করে দুঃশাসন সভাপর্বে যে পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল তারই যোগ্য প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ভীম প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার বক্ষোরক্ত পান করে বর্বরের যথাযোগ্য শাস্তিবিধান করবেন। মধুসূদন চতুর্দশপদীতে রৌদ্ররসের উদাহরণ হিসাবেই কবিতাটি রচনা করেছেন:

মেঘ-রূপ চাপ ছাড়ি, বজ্রাগ্নি যেমনে
পড়ে পাহাড়ের শৃঙ্গে ভীষণ নির্ঘোষে;
হেরি ক্ষেত্রে ক্ষত্র-গ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনে,
রৌদ্ররূপী ভীমসেন ধাইলা সরোষে;—
পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে;
বাজিল উরুতে অসি গুরু অসি-কোষে।
যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে;
বিদরি হৃদয় তার ভৈরব-আরবে,
পান করি রক্তস্রোতঃ গর্জিলা পাবনি।

"মনাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্বর !—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

সনেটের ক্ষুদ্রদেহে যে মহাকাব্যের বীর্য সঞ্চারিত করা যায়, কবিতাটি তারই বলিষ্ঠ উদাহরণ। এর প্রতিটি পদে, প্রতিটি কথায়, প্রতিটি অক্ষরে ক্রোধবহ্নি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত করছে। এবার ওর অঙ্গসন্ধির দিকে লক্ষ্য করা যাক। প্রথম চতুষ্কে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে একটি বিদ্যুৎচমক দিয়ে কবিতাটির আরম্ভ। মেঘচাপ থেকে বজ্র-শর নিক্ষেপের মত রৌদ্ররূপী ভীমসেন ক্ষত্রগ্লানি দুষ্ট দুঃশাসনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সেই রুদ্রের মহাতাণ্ডব দিয়ে দ্বিতীয় চতুষ্কের সূত্রপাত : 'পদাঘাতে বসুমতী কাঁপিলা সঘনে।' কিন্তু অষ্টকবন্ধ শেষ হয়েছে একটি শাশ্বত জান্তব সংগ্রামের ভীষণ নিষ্ঠুর শব্দালেখ্যের রক্তবিদারণে :

যথা সিংহ সিংহনাদে ধরি মৃগে বনে
কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড় লহু-ধারা শোষে ;

মধুসূদনের শব্দধ্বনি-সৃষ্টির অসামান্য শক্তি লক্ষণীয়। তিনটি মাত্র শব্দ, দুটি বাংলার দেশজ এবং একটি মধুসূদনের নিজস্ব-ক্রিয়া-বিশেষণের এ-যোগে অ-সংস্কৃত—এই তিনটি অনার্য শব্দ—কামড়ে প্রগাঢ়ে ঘাড়—ওর সাহায্যেই কবি ভীম-সিংহের আক্রমণে দুঃশাসন-মৃগের অন্তিম সর্বনাশচিত্র রচনা করেছেন। ক-ড়, গ-ড়, ঘ-ড়—কণ্ঠ্য ও মূর্ধন্য বর্ণের শ্বাসে ও নাদে, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণে মিলিয়ে কবি অস্থিচূর্ণকর মল্লযুদ্ধের যে শব্দধ্বনি সৃষ্টি করেছেন অতিসূক্ষ্ম শ্রুতি-সম্পন্ন বাক্‌সিদ্ধ বাণীশিল্পীর পক্ষেই তা সম্ভব। কবিতার অষ্টকবন্ধ দুঃশাসনের বক্ষোবিদারণ ক্রিয়াতেই সমাপ্ত হয়েছে। তারপর ষট্‌কে মহারুদ্রের রসমোক্ষ :

বিদরি হৃদয় তার ভৈরব আরবে,
পান করি রক্তস্রোতঃ গর্জিলা পাবনি।
"মনাগ্নি নিবানু আমি আজি এ আহবে
বর্বর !—পাঞ্চালী সতী, পাণ্ডব-রমণী,
তার কেশপাশ পর্শি, আকর্ষিলি যবে,
কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি।"

ষট্‌কবন্ধে এই রসমোক্ষ-রচনায় কবি ক্রুদ্ধ ভীমের গর্জন-আস্ফালনের মধ্য দিয়ে শুধু তাঁর রুদ্র-সংবিদেরই মুক্তিদান করেন নি, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মহাভারতের মর্মবাণীও ওতে মুক্তিলাভ করেছে। কামার্ত পুরুষ-পিশাচের কলুষস্পর্শে যাজ্ঞসেনী নারীলক্ষ্মীর অপমানেই কুরুবংশ ধ্বংস হল। 'কুরু-কুলে রাজলক্ষ্মী ত্যজিলা তখনি'। এই ব্যঞ্জনাধর্মেই মধুসূদনের হাতে সনেট-কাব্য মহাকাব্যের গাম্ভীর্য, সমুন্নতি ও বিশালতা লাভ করেছে।

৫

এবার আলোচনা করব, সনেটই কেন মধুসূদনের আত্মকথার বাহন হল। এই আলোচনায়ও কবির একটি চতুর্দশপদীই আমাদের সহায়ক হবে। মধুসূদনের "মিত্রাক্ষর" :

বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে
মিত্রাক্ষর-রূপ বেড়ি ! কত ব্যথা লাগে
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে !
ছিল না কি ভাব-ধন, কহ, লো ললনে,

মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?—

কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
নিজ-রূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে !
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?

কবিতাটি সত্যই অদ্ভুত! মিলের বিচিত্র সজ্জায় কাব্যলক্ষ্মীর দীপারতি করে কবি মিলেরই নিন্দা করছেন। মিত্রাক্ষরবন্ধে অমিত্রাক্ষরের জয়গান! কি বিস্ময়কর অসঙ্গতির আশ্চর্য নিদর্শন এই কবিতাটি! অথচ এই তো মধুসূদনের নিয়তি! অক্টোপাস-বন্ধনের মধ্যে অষ্ট-পৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে প্রাণের আনন্দে চিরমুক্তির গান গাওয়া, এই তো মধুসূদনের কাব্যজীবনের মূল সত্য! মনে রাখতে হবে, মধুসূদনের কাব্যকাল ১৮৫৮ থেকে ১৮৬৫। ১৮৫৭ সনে সিপাহী-বিদ্রোহের পর কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরী স্বয়ং গ্রহণ করলেন। অর্থাৎ পরাধীনতার শেষ গ্রন্থি বজ্র-আঁটুনিতে বাঁধা হল। বাইরের এই রাষ্ট্রীয় বন্ধন তো বাহ্য, ইংরেজের ভাষা ও সাহিত্য, সংস্কৃতিক্ষেত্রে ইংরেজি-দাসত্বের অভিশাপ চরমে উঠল এই সময়। হিন্দু-কলেজ প্রতিষ্ঠার পর চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, বাঙালী জাতি মাতৃভাষার মর্যাদা গিয়েছে ভুলে, ইংরেজিই সর্বক্ষেত্রে তার আত্মপ্রকাশের গৌরবান্বিত বাহন হয়ে উঠেছে। হিন্দু-কলেজের সেরা ছাত্র মধুসূদনের সর্বাঙ্গেও সেই দাসত্বের ছাপ। অথচ তিনিই মাতৃ-ভাষায় মাতৃনাম উচ্চারণের প্রথম কবি-ঋত্বিক। পরাধীনতার

নাগপাশ তাঁকে সর্বভাবে শৃঙ্খলিত করতে চাইছে, অথচ তাঁর সমগ্র সত্তায় মুক্তির অনন্ত পিপাসা। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে তিনি যে বীরজগৎ আবিষ্কার করেছেন সেখানেই তাঁর প্রাণের নিত্যগতি, অথচ তাঁর আশেপাশে 'সিংহের ঔরসে শৃগালের দল' ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁর কবিসত্তায় একটি অদিতি-তনয় নিত্য-শুচিতায় বাস করে, অথচ তাঁর ব্যক্তিসত্তায় রয়েছে কাম- ও অর্থ-লোলুপ একটি ক্লিষ্ট ও ক্লিন্ন দিতির সন্তান। প্রতি পদে তাকে তিনি ঘৃণা করে চলেছেন, অথচ তার সঙ্গেই সারা জীবন একই দেহে অতিবাহিত করতে হচ্ছে। যে মুক্তিস্বর্গ তিনি স্বপ্নলোকে সৃষ্টি করেছেন, বাস্তব মর্ত্যলোকে কোথাও তার কোন চিহ্ন নেই। এই অসঙ্গতিই মধুসূদনের মানসে ও পরিবেশে বিরাজমান। তাই বন্ধনের মধ্যে থেকে বন্ধনমুক্তির বাণীই তাঁর কবিচিত্তের বাণী। এই বন্ধনের দুর্বিষহ জ্বালা এবং সর্বভাবে এই বন্ধনকে অস্বীকার করে মুক্তির গান গাওয়াই মধুসূদনের কবিভাগ্য। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পর পর নূতন নূতন দৃষ্টান্তে মিত্রাক্ষরের ষট্‌কবন্ধ রচিত হয়েছে।

> কি কাজ রঞ্জনে রাঙি কমলের দলে ?
> কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
> কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?

এই তিন-তিনটি জিজ্ঞাসার মধ্যে বন্ধন-অসহিষ্ণু কবিচিত্তের মুক্তি-কামনাই যেন মুক্তত্রিবেণী রচনা করেছে। আঘাতে আঘাতে সর্ববন্ধন থেকে মুক্তিপ্রয়াসেরই তারা প্রতীক!

বলাই বাহুল্য, মধুসূদনের এই বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির প্রেরণারই যোগ্য রূপায়ণ হয়েছে সনেটের আভ্যন্তর-সঙ্গতি অর্থাৎ বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির লীলায়। উভয়তই আপাত-দৃশ্যমান অসঙ্গতির মধ্যে

এক পূর্ণতর ও মহত্তর সঙ্গতির সাধনা। বন্ধনের মধ্যে থেকেই বন্ধনমুক্তির উদাত্ত সংগীত। তাই মধুসূদনের অন্তরঙ্গতম আত্ম-কথার সার্থক বাহন হয়েছে সনেট।[১৮]

৬

মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে কাব্যরসাত্মার বাঙ্‌ময় মূর্তি রচনা করেছেন। করুণরস, বীররস, শৃঙ্গাররস ও রৌদ্ররস,—চারটি সনেটে এই চারটি রসের বাণীবিগ্রহ রচনা করে কবি এক অভাবনীয় মৌলিক কবিকল্পনার পরিচয় বাংলা সাহিত্যে রেখে গিয়েছেন। কাব্যরসের রূপদর্শনের পরিকল্পনা অভূতপূর্ব না হলেও অভিনব সন্দেহ নেই। ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তপূজারী যখন উপাস্য দেবদেবীর ধ্যানমন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন তাঁর ধ্যানলোকে আরাধ্যদেবতার রূপ প্রত্যক্ষীভূত হয়। নিরাকারকে সাকার করেই ভক্তের তন্ময়তা ইষ্টোপাসনায় একাগ্রীভূত হয়ে ওঠে। জ্যোতিষ-শাস্ত্রাদিতে গ্রহাদির বর্ণনাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় ; কিন্তু ভারতীয় সংগীতশাস্ত্রে রাগরাগিণীর অপরূপ মূর্তিকল্পনা সূক্ষ্মতর চারুতায় মণ্ডিত হয়েছে। কাব্যরসের মূর্তিরচনায় রূপদক্ষ মধুসূদনের কৃতিত্বও সমপর্যায়ভুক্ত। কবি তাঁর বিবেচনায় মুখ্য রসচতুষ্টয়ের চারটি বাঙ্মূর্তি রচনা করে একাধিক উদাহরণের সাহায্যে তাদের রসভাষ্য করেছেন।

কবির বীররস 'ভৈরব-আকৃতি শূর', তিনি তাকে গিরিশীর্ষে স্থাপন করেছেন। তার

> ব্যোমকেশ-সম কায় ; ধরাতল পদে,
> রতন-মণ্ডিত শিরঃ ঠেকিছে গগনে,

বিজলী-ঝলসা-রূপে উজলি জলদে।
চাঁদের পরিধি, যেন রাহুর গরাসে,
ঢালখান ;

বলাই বাহুল্য, এ বীর চিরন্তন বীরত্বেরই প্রতিমূর্তি। ভীম শরাসন বাম করে নিয়ে তিনি তাতে মুহুর্মুহুঃ টংকার দিচ্ছেন ; এই বীরচর্যা অনিঃশেষ উৎসাহেরই প্রতীক। মহাকবি মধুসূদনের মতে বীররসই 'রস-কুল-পতি'। 'গদাযুদ্ধ', 'গোগৃহরণে' ও 'কুরুক্ষেত্রে'—এই তিনটি উদাহরণের সাহায্যে কবি বীররসের স্বরূপ-নির্ণয় করেছেন। কবির রৌদ্ররস যেন মূর্তিমান ক্রুধ। গিরি-গহ্বরে ক্ষুধার্ত কেশরীর মত তার নিনাদ, 'প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জিছে গগনে'। স্বভাবের দিক দিয়ে সে

বড়ই কর্কশ-ভাষী, নিষ্ঠুর, দুর্মতি,
সতত বিবাদে মত্ত, পুড়ি রোষানলে।

কিন্তু তবু কাব্যক্ষেত্রে তারও আত্ম-প্রকাশ আনন্দপ্রদ। কবি তারই সংকেত দিয়ে বলছেন, 'বাড়বাগ্নি মগ্ন যথা সাগরের জলে।' এই উপমাতে রূপের সঙ্গে প্রাণের, দেহের সঙ্গে দেহীর একাত্মতার স্বরূপটিও বড় সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। রৌদ্ররসেরও তিনি দুটি উদাহরণ দিয়েছেন, দুঃশাসন এবং হিড়িম্বাকে নিয়ে রচিত সনেট-যুগ্মকে। 'দুঃশাসন' কবিতার ব্যাখ্যা পূর্বেই করা হয়েছে। মধুসূদনের শৃঙ্গাররস 'কামদেব অবতার রস-কুলে আসি,' অবার্য-বীর্য সেই 'রূপস পুরুষে'র 'চৌদিকে রমণী-চয় কামাগ্নি নয়নে',

সে কামাগ্নি-কণা লয়ে, সে যুবক, হাসি,
জ্বালাইছে হিয়াবৃন্দে ; ফুল-ধনুঃ ধরি,
হানিতেছে চারিদিকে বাণ রাশি রাশি,
কি দেব, কি নর, উভে জর জর করি।

শৃঙ্গার-রসেরও তিনটি উদাহরণ কবি রচনা করেছেন; প্রথমটি সুরত-কেলিকথা, দ্বিতীয়টি স্বকীয়া রতি 'সুভদ্রা', এবং তৃতীয়টি পরকীয়া রতি 'উর্বশী'। সুরত-কেলিকথায় বিপরীত-বিহারের বর্ণনায় কবির আদর্শ ভারতচন্দ্র নন, জয়দেব। কিন্তু নর-নারীর এই লীলা-বিলাসের রূপায়ণে কবিমানসে মহাকাল-বক্ষোবিহারিণী মহাকালীর মূর্তিটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তন্ত্রোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি-তত্ত্বই এখানে আভাসিত। তাই কবির 'চারুনেত্রা' রমণী 'চন্দ্র-চূড়-রথী' 'দিগম্বরী'।

মধুসূদন মুখ্যত বীররসের কবি। কিন্তু শৃঙ্গার ও করুণ রসের আলাপেও তাঁর বীণা কোমলনাদিনী। শৃঙ্গারের কোমলতা সব-চেয়ে সার্থক হয়েছে "উর্বশী"র ষট্‌কবন্ধে :

> উন্মদা মদন-মদে কহিলা উর্বশী ;
> "কামাতুরা আমি নাথ তোমার কিঙ্করী ;
> সরের সুকান্তি দেখি যথা পড়ে খসি
> কৌমুদিনী তার কোলে, লও কোলে ধরি
> দাসীরে ; অধর দিয়া অধর পরশি,
> যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি।"

মিলনের আনন্দস্পন্দ এর ছন্দঃস্পন্দে ধরা দিয়েছে। 'যথা কৌমুদিনী কাঁপে, কাঁপি থর থরি'!—দেহমিলনের মধ্যেও যে কবির দৃষ্টি রয়েছে সূক্ষ্মতর হৃদয়-মিলনের প্রতি তার প্রমাণ, সরোবরের স্ফটিকস্বচ্ছ সলিলে জ্যোৎস্নাকান্তির মিলনই হয়েছে তাঁর উপমেয়।

মধুসূদনের দৃষ্টিতে বীররস যেমন 'রসকুল-পতি', করুণ রস তেমনি 'রস-কুলে-রাণী।' কবির মতে 'সেই ধন্য, বশ সতী যার তপোবলে।' মহাকবির কাব্যে এই দুটি রসই যুগ্মধারায় নিত্য-প্রবাহিত। ট্রাজিক মহাকাব্যের নিয়তিলাঞ্ছিত বীরজীবনে বীররস

ও করুণরসই অঙ্গী বা প্রধান রস। এদের মধ্যে বিরোধ-কল্পনা জীবনানুগ নয়, এই দুটি রস পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়েই ভাগ্যবিড়ম্বিত বীরজীবনের অপরাজেয় মহিমাকে উদ্ঘাটিত করে।[১১] করুণ রসের বর্ণনায় কবি বলছেন :

> সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী
> বামারে, মলিন-মুখী, শরদের শশী
> রাহুর তরাসে যেন ! সে বিরলে বসি,
> মৃদে কাঁদে সুবদনা ; ঝরঝরে ঝরি,
> গলে অশ্রু-বিন্দু, যেন মুক্তা-ফল খসি !
> সে নদের স্রোতঃ অশ্রু পরশন করি,
> ভাসে, ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি ধরি,
> মধুলোভী মধুকরে মধুরসে রসি,
> গন্ধামোদী গন্ধবহে সুগন্ধ প্রদানি।

এই মূর্তি নির্মাণে কবির কল্পনা অসামান্যের স্পর্শ পেয়েছে। সুন্দর নদের তীরে মলিনমুখী অশ্রুমালিনী সুন্দরী বামা, যেন রাহু-ত্রাস-ত্রস্ত শরতের শশী। এই রূপক বিশ্লেষণ করে কবি বলছেন, 'কবিতা-রসের স্রোতঃ, এ নদের ছলে ; করুণা বামার নাম।' অর্থাৎ করুণ রস কবির দৃষ্টিতে মূর্তিমতী করুণা, মৃত্যুরাহুর ত্রাসে মলিনবদনা অশ্রুমতী। করুণাময়ীর অশ্রুবিন্দুই কাব্যপ্রবাহে 'ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি' ধরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে। লৌকিক জগতের শোকার্ত হৃদয়ের বেদনা কি রহস্যে কাব্যলোকে করুণ রসের আনন্দে রূপান্তরিত হয় কবিতাটি তারই অসামান্য কাব্যসংকেত। মোহিতলাল যাকে কবির দিব্যাবেশ বলেছেন, কবিতাটি যেন সেই দিব্যাবেশে লেখা। 'সারদামঙ্গলে'র কবিও তাঁর কাব্যের প্রথম সর্গে তমসাতীরের ক্রৌঞ্চ-শোক-কাতর আদিকবির প্রেরণাদাত্রী

রূপে বাগ্‌দেবীর করুণাময়ী মূর্তিকেই ধ্যান করেছেন। তাঁর কল্পনাতেও

ব্রহ্মার মানস-সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পুর্ণিমা যামিনী।

বলাই বাহুল্য মধুসূদনের 'ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তি'ই বিহারীলালের 'নীল জলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী'র রূপ গ্রহণ করেছে। এই রূপকল্পটির প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেও একটি সুন্দর কবিতার জন্ম হয়েছে। 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের "প্রভাতে" কবিতাটির কথাই বলছি। সেখানেও কবিজীবনে বেদনার রহস্যময় আকস্মিক অবসানে আনন্দের কমলকান্তি-বিকাশেরই কথা। কবি বলছেন :

হেরো হেরো মোর অকূল অশ্রু-
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমলকান্তি
কেমনে রাজে।
একটি মাত্র শ্বেত শতদল
আলোক-পুলকে করে ঢল ঢল্‌,
কখন ফুটিল বল্‌ মোরে বল্‌
এমন সাজে
আমার অতল অশ্রু-সাগর-
সলিল মাঝে।

'অতল অশ্রু-সাগর-সলিলে' অমল-কমলকান্তি শ্বেতশতদল-বিকাশের এই রূপকল্পটি মধুসূদনের 'করুণরসে'র সৃষ্টিরহস্যকেই

স্মরণ করিয়ে দেয়। শুধু মধুসূদনের 'স্বর্ণকান্তি' রবীন্দ্রকাব্যে 'শ্বেতশতদলে' বিকশিত।

৭

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র আলোচনায় মধুসূদনের ভাষা-প্রসঙ্গও এসে পড়ে। কথা উঠেছে মধুসূদন নাকি বাংলা ভাষা জানতেন না, অভিধান থেকে শব্দরাজি আহরণ করে তিনি পদ্য লিখতেন; তাঁর বাংলা বাংলাই নয়!

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, কবি যেখানে ব্যর্থ সেখানে তাঁর আলোচনা করলে তাঁর প্রতি কিছুতেই সুবিচার হতে পারে না; কবি যেখানে সার্থক, যেখানে তাঁর উৎকর্ষ, সেখানেই তাঁর সত্য বিচার। আমরা যাকে বাংলা বুলি বলি, তার রূপ কি, কোথায় কিভাবে তার প্রকাশ সার্থক হয়েছে—এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। বলা বাহুল্য, চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাংলা, আর যাই হোক, বিশুদ্ধ বাংলা বুলি নয়। কৃত্তিবাস-কাশীরাম আর মুকুন্দরাম-বিজয়গুপ্ত-ঘনরামের ভাষা এক নয়, চণ্ডীদাস-গোবিন্দদাসের কাব্য আর মালাধর-কৃষ্ণদাসের পদ্য পৃথক, ভারতচন্দ্র আর রামপ্রসাদ কখনোই এক ভাষায় কথা বলেননি; নিধুবাবু, দাশু রায় আর কবিওয়ালার দল অথবা ঈশ্বর গুপ্তই কি খাঁটি বাংলা বুলিতে কথা বলেছেন? আসলে যে প্রকাশে প্রাণের পিপাসা নিবৃত্ত হয়, প্রাণের আশা মেটে, তারই নাম মাতৃভাষা।

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর হাতে বাংলা গদ্য ও পদ্য উভয়েরই ভাষা নতুন করে গড়ে উঠেছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা বাঙালীর নব-সংস্কৃত-সাধনার পরম আশীর্বাদ।

সংস্কৃতের সুন্দরতম দুখানি কাব্য অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ আর উত্তররামচরিতের শিল্পসৌন্দর্য আহরণ করে বিদ্যাসাগরের হাতে আধুনিক বাংলা গদ্যের সৃষ্টি, আর সংস্কৃত কাব্য-সমুদ্রমন্থনের ফলে মধুসূদনের হাতে বাংলা কাব্যের জন্ম। পয়ার-ত্রিপদীর মরা গাঙে যেদিন মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দ প্রবাহিত হল সেদিনই কবিওয়ালাদের অত্যাচারে মৃতপ্রায় বাংলা পদ্যের দেহে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল। মধুসূদন শুধু আধুনিক বাংলা কাব্য-সাহিত্যেরই জন্মদাতা নন, আধুনিক বাংলা কাব্য-ভাষারও জনয়িতা। কিন্তু মধুসূদনের ভাষার কথা উঠলেই আমরা তাঁর অমিত্রাক্ষরের কথাই বলি। সে অমিত্রাক্ষরের ঐশ্বর্য 'মেঘনাদবধে', পরিণতি 'বীরাঙ্গনা'য়। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা'তেও তাঁর ভাষার ধার সম্পূর্ণ মসৃণ হয়ে আসে নি। সে মসৃণতা এসেছে 'চতুর্দশপদী'র সার্থকতার মধ্যে। দুটি কারণে এসেছে। সনেটে পদ থেকে পদান্তরে ভাষার বহমানতা অবাঞ্ছনীয়। প্রতি চরণে অর্থাৎ চতুর্দশ অক্ষরের পয়ার-পংক্তির মধ্যেই, পরবর্তী যুগে অষ্টাদশাক্ষরা মহাপয়ারেও বটে, ভাবকে মূর্ত করে তুলতে হবে, এবং অন্ত্যমিলের ধ্বনিসংগীতে ছন্দঃস্পন্দকে যেন সমে এনে পৌঁছে দিতে হবে। মধুসূদন সর্বত্রই যে সার্থক হয়েছেন তা বলব না, কিন্তু এই সংযম-বন্ধন তাঁর ভাষায় নতুন লাবণ্যের সৃষ্টি করেছে। অমিত্রাক্ষরের কবি সনেটের সর্বত্র দুটি স্বরান্ত অক্ষরে গড়া অজস্র মিলের মাধুর্যে তাঁর বাণীলক্ষ্মীর নবরূপ দিয়েছেন।

'চতুর্দশপদী কবিতা'য় ভাষার ঐশ্বর্য নয়, ভাষার সংযম-সৌন্দর্যই লক্ষ্য করবার মত। কিন্তু মধুসূদনের ভাষায় বাঙালীর প্রাণের পিপাসা নিবৃত্ত হয় নি? আমার তো মনে হয়, আধুনিক বাংলা কাব্যে মধুসূদনের ভাষাতেই বাঙালী হিন্দুর প্রাণের সংস্কার সবচেয়ে সার্থক ভাষারূপ পেয়েছে। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বাংলাভাষা সংগীত আর সৌন্দর্যের শিল্পশুচিতায় নয়নাভিরাম হয়ে

উঠেছে। কিন্তু মধুসূদনের ভাষায় বাংলার ব্রাহ্মণ্যশুচিতা অতুলনীয়। দুটি মাত্র উদাহরণে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করব। মধুসূদনের কল্পনায় জনক-নন্দিনী সীতা নিত্যশুচি। কবি তার উপমা পেলেন তুলসী-তলায়। ফরাসিদেশে বসে কবি মাতৃনাম স্মরণ করে 'চতুর্দশপদী' রচনায় বাগ্‌দেবীকে আবাহন করেছিলেন, গ্রন্থশেষে তাঁকে বিদায় দিতে হবে। কবি বলছেন :

বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
ও প্রতিমা !

এ বিসর্জন যে কি মর্মান্তিক বিসর্জন, বাঙালী হিন্দুর হৃদয়ই তা মর্মে মর্মে জানে। এই ধরনের রূপকল্প বা poetic imagery অভিধানের রচনাবলী সংকলন করে সৃষ্টি করা যায় না, সহজাত সংস্কারের মর্মমূল থেকেই তাদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার।

কিন্তু তবু বলতে হবে, মধুসূদনের ভাষা যেন বড় বেশি সজ্জিত, বেশি অলংকৃত। মহাকবির রাজরাজেশ্বরী বাণীলক্ষ্মী স্বভাবতঃই রত্নাভরণভূষিতা। কিন্তু মধুসূদনের আত্মকথা যেখানে বাঙালীর প্রাণের কথা হয়ে উঠেছে সেখানে তাঁর বাণী অলংকারের সামান্য প্রসাধনও বর্জন করেছেন। বাৎসল্যরসচেতনাই যেমন বাঙালী হৃদয়ের গভীরতম চেতনা, মধু-সরস্বতীর সেই যশোদা-মূর্তিই তেমনই তাঁর বাগ্‌দেবীর শেষ বিগ্রহ। 'চতুর্দশপদী'র "বিজয়া-দশমী" কবিতাটি সমগ্রভাবে উদ্ধার না করলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে না :—

"যেয়ো না, রজনি, আজি লয়ে তারা দলে !
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে !—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে !

বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারাকুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি।"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশা-শেষে গিরীশের রাণী।

গীতিকবিতা হিসাবে বাংলাকাব্যে এই কবিতাটি অতুলনীয়। আদর্শ সনেট হিসাবেও এর অষ্টকের দুটি বিবৃত চতুষ্ক পেরিয়ে ষট্‌কবন্ধে মায়ের সন্তান-বাৎসল্যের অতৃপ্ত পিপাসায় মেয়ের মুখখানি—'তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে দূর করি অন্ধকার'—আর আসন্ন বিচ্ছেদের ভাবনায় 'দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি, নিবাও এ দীপ যদি'—মাতৃহৃদয়ের মিলনবিচ্ছেদের এ আলো-আঁধারি লীলার কোথাও কি কোন তুলনা আছে? আর শিশুকণ্ঠের কাকলি 'মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে'—তারই বা তুলনা কোথায়? মধুসূদন তাঁর কণ্ঠে 'মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে' সেই শিশুর ভাষা ফুটিয়েই যেন তাঁর বাণীসাধনার সমাপ্তি রচনা করেছেন। বিজয়াদশমীতে আমরা বাংলার ঘরের বাংলার মায়ের প্রাণের ভাষা শুনলাম। "সরস্বতী" কবিতায় বাণীর বরপুত্রের কণ্ঠে এবার শিশুর মুখে মা-ডাকটি শুনব :

তৃষাতুর জন যথা হেরি জলবতী
নদীরে, তাহার পানে ধায় ব্যগ্র মনে
পিপাসা-নাশের আশে; এ দাস তেমতি,

জ্বলে যবে প্রাণ তার দুঃখের জ্বলনে,
ধরে রাঙা পা দুখানি, দেবি সরস্বতি !—
মার কোল-সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর ? নয়নের জলে
ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে ?
কে মোচে আঁখির জল অমনি আঁচলে ?

লক্ষ্য করলে দেখতে পাওয়া যাবে, কবি-শিশু যতই মায়ের কাছে এগিয়ে আসছেন ততই তাঁর কণ্ঠে সংস্কৃত তৎসম শব্দ যাচ্ছে হারিয়ে, আসছে বাংলার ঘরোয়া ভাষার খাঁটি দেশী বুলি। এমন কি, এই উদ্ধৃতির অষ্টম চরণে দুটি অক্ষর পর্যন্ত কম পড়েছে ; এমন ঘটনা মধু-সাহিত্যে দ্বিতীয়বার ঘটে নি। কিন্তু এই শিশুকণ্ঠের অস্ফুট কাকলিরও মিষ্টতম অংশ হল :

মার কোল সম, মা গো, এ তিন ভুবনে
আছে কি আশ্রম আর ?

আশ্রয় নয়, আশ্রম ; শব্দটি কি অসামান্য ব্যঞ্জনা পেয়েছে কবির কণ্ঠে ! আজ পর্যন্ত এর তুলনা আর একটিমাত্র বাক্যই আছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে। ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনীর অবোধ সরল কণ্ঠে বাৎসল্যরসের শেষ নির্যাস :

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

মাতৃভাষা সম্পর্কে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ ভক্তি নিবেদিত হয়েছে চতুর্দশপদীর আর একটি কবিতায়। বাংলা সাহিত্যের বিশুদ্ধি-রক্ষার সাধনায় কোন প্রকার শৈথিল্য যে তাঁর কাছে ক্ষমার্হ ছিল না, তার প্রমাণ আছে। "কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া" শিরোনামাঙ্কিত সনেটে :

চাঁড়ালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে !
করি ভস্মরাশি, ফেল, কর্মনাশা-জলে !

ক্রোধ নয়, তা হলে কথাটি হত চণ্ডাল, ঘৃণা বলেই চাঁড়াল হয়েছে।

এই কবিতাই বঙ্গভাষাপ্রেমী মধুসূদনের মানসলোকের অভ্রান্ত পরিচয়। মাতৃভাষার বিশুদ্ধি-বিনাশের অপপ্রয়াসে তাঁর ঘৃণা অতলস্পর্শী।

৮

কিন্তু সে প্রসঙ্গ আর নয়। এবার মধু-সাহিত্যের সবচেয়ে জটিল ব্যাসকূট—তাঁর শ্রেষ্ঠকীর্তি 'মেঘনাদবধ' প্রসঙ্গ। আমরা বলেছি মাইকেলি বুলি 'I despise Ram and his rabble···' এই উক্তিই মহাকবির 'মেঘনাদবধে'র বিচারে বিভ্রান্তি সৃষ্টির মূল কারণ। এ কথা সত্য যে, চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ও কবিকৃত্য, এবং অশিববিনাশে সমাজমানসকে অনুপ্রাণিত করাই মহৎ কাব্যের লক্ষণ। এ দুটিকে বাদ দিয়ে কান্তাসম্মিত বাণীর দ্বারা 'সদ্যঃপরনির্বৃতি'-সৃষ্টির বিচার সাহিত্যের ইতিহাসে হয়নি যে এমন নয়, কিন্তু সামাজিকগণ বলবেন তা হওয়া উচিত নয়। সেইজন্যই প্রশ্ন উঠেছে মধুসূদন 'রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ'—ভারতের এই সনাতন নীতিবাক্য লঙ্ঘন করেছেন। এখানেই তাঁর অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু রামের মত হও, রাবণের মত হয়ো না। কোন্ রাম? কোন্ রাবণ? বাল্মীকির নরচন্দ্রমা আর কালিদাসের রঘুবংশের রাঘব এক নন, বাল্মীকির রাম আদর্শ মানব, কালিদাসের রাম আদর্শ হিন্দু নরপতি। কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র তো ভগবানের অবতার। তাঁর লঙ্কাকাণ্ডের রামলীলা প্রায় জগাই-মাধাই উদ্ধারেরই সামিল। আর রাবণ? বাল্মীকির 'প্রবলপ্রতাপ ত্রিভুবনবিশ্রুতকীর্তি নীতিজ্ঞ

মহাবীর' পুরুষপ্রবর আর কৃত্তিবাসের দশমুণ্ডধারী রাক্ষস কি এক? রাবণের মৃত্যুর পরে বাল্মীকি বিভীষণ-বিলাপে বিভীষণকণ্ঠে যে রাবণপ্রশস্তি উচ্চারণ করেছেন তাতে দেখা যাবে বিভীষণ বলছেন :

বীর বিক্রান্ত বিখ্যাত প্রবীণ নয়কোবিদ।
মহার্হশয়নোপেত কিং শেষেঽদ্য হতো ভুবি॥

*

গতঃ সেতুঃ সুনীতানাং গতো ধর্মস্য বিগ্রহঃ।
গতঃ সত্ত্বস্য সংক্ষেপঃ সুহস্তানাং গতির্গতা॥
আদিত্যঃ পতিতো ভূমৌ মগ্নস্তমসি চন্দ্রমাঃ।
চিত্রভানুঃ প্রশান্তার্চির্ব্যবসায়ো নিরুদ্যমঃ।
অস্মিন্নিপতিতে বীরে ভূমৌ শস্ত্রভৃতাং বরে॥

*

ধৃতিপ্রবালঃ প্রসভাগ্র্যপুষ্প-
স্তপোবলঃ শৌর্যনিবদ্ধমূলঃ।
রণে মহান্ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ
সম্মর্দিতো রাঘবমারুতেন॥

*

পরাক্রমোৎসাহবিজৃম্ভিতার্চি-
র্নিশ্বাসধূমঃ স্ববলপ্রতাপঃ।
প্রতাপবান্ সংযতি রাবণাগ্নি-
র্নির্বাপিতো রামপয়োধরেণ॥

অর্থাৎ : "আপনি প্রবীণ, আপনি নীতিনিপুণ।...শস্ত্রধারিপ্রবর, আপনি নিহত হওয়ায় ধার্মিকগণের সেতু গত হইল। মূর্তিমান ধর্ম নষ্ট হইল, বলের কোষাগার বিলুপ্ত হইল, বীরদিগের আশ্রয় বিনষ্ট হইল। হা বীর! আপনি নিপতিত হওয়ায় অদ্য আদিত্য ভূমণ্ডলে পতিত, চন্দ্রমা রাহুগ্রস্ত ও হুতাশন নির্বাণ হইল।...হায়! ধৈর্য যাহার পত্র, হঠকারিতা যাহার পুষ্প, তপস্যা যাহার বল, এবং শৌর্য যাহার দৃঢ়মূল, সেই

রাক্ষসরাজরূপ বৃক্ষ অদ্য রণমধ্যে রামরূপ বায়ুবেগে উন্মূলিত হইল। হায়! পরাক্রম ও উৎসাহ যাহার অর্চি, নিশ্বাস যাহার ধূম, স্বীয় বল যাহার দাহিকাশক্তি সেই প্রতাপবান রাবণরূপ হুতাশন রামরূপ মেঘ দ্বারা নির্বাপিত হইয়াছে"।[২৮]

মধুসূদন যে এই বিভীষণ-বিলাপের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তার প্রমাণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎনিধনের পর তাঁর বিভীষণও অনুরূপভাবেই বিলাপচারী হয়েছেন। আসলে মধুসূদন প্রাচীন মহাকাব্যলোকে যে বীরজগৎ আবিষ্কার করেছিলেন, রাবণ সেই বীরজগতেরই অগ্রগণ্য মহারথী। প্রাচীন গ্রীসের মহাকাব্য ও ট্রাজেডিতে নিয়তিলাঞ্ছিত বীর নায়কবৃন্দের দৈবপরাজিত মানবশক্তির যে অপরাজেয় মহিমা মহাকবি দেখেছিলেন, রাবণের মধ্যে তিনি তাকেই ধ্যান করেছেন। সমগ্র ভারতসাহিত্যে তিনটি বীরচরিত্র উজ্জ্বল হয়ে আছে : রামায়ণের রাবণ, মহাভারতের কর্ণ আর বাংলা লোকসাহিত্যের চাঁদ সদাগর। নবজন্ম বা রেনেসাঁসের মূলমন্ত্র হল মানবিকতা। দৈবমহিমার বিরুদ্ধে মানবমহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এই মানবিকতা-বোধ প্রথম স্তরে আদর্শ সন্ধান করেছিল প্রাচীন মহাকাব্যযুগের মানব-বীরত্বের মধ্যে। ত্রিভুবনমন্থনকারী রাবণের মহাশক্তি মধুসূদনকে মুগ্ধ করেছিল। হিন্দু কলেজের সংস্কারমুক্তির যজ্ঞে সবচেয়ে প্রতিভাধর বিদ্যার্থী ছিলেন মধুসূদন। শান্তি নয়—সংগ্রাম, আনুগত্য নয়—বিদ্রোহই ছিল সেই মুক্তিযজ্ঞের মূলমন্ত্র। বিদ্রোহী রাবণের আত্মমথিত হলাহলজ্বালার মধ্যেই যেন মধুসূদন তাঁর জীবনযজ্ঞের প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছিলেন। তাই এই সর্ববিদ্রোহী মহাশক্তির প্রতি ছিল তাঁর সানুরাগ পক্ষপাতিত্ব। তা ছাড়া 'মেঘনাদবধে'র রাবণ মধুসূদনেরই আবিষ্কার, মহাকবিরই নবসৃষ্টি। নবজন্মের আলোকে প্রাচীন মহিমার নবতর ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা মধুসূদনে আরম্ভ, কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের

'কৃষ্ণচরিত্রে' ভগবত্তা নয়—আদর্শ মানবতারই সন্ধান, নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণও দেবতা নন—মহামানব। পরবর্তী পৌরাণিক নাট্যসাহিত্যের কর্ণ-কংশ-চন্দ্রধরেরা এই একই মানবতাবাদী দৃষ্টির বিচিত্র অভিব্যক্তি। মধুসূদনই এই নবদৃষ্টিভঙ্গির প্রথম ভাষ্যকার।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভুললে চলবে না, নবজন্মের প্রথম স্তরে মানবতাবাদ দৈববিরোধী হলেও নিরীশ্বর নয়। পেত্রার্কার জীবনেও তাই দেখি, শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রেম ও উচ্চাশার সঙ্গে তাঁর পারলৌকিক মুক্তিস্বপ্নের বিরোধ দেখা দিয়েছে। মধুসূদনের রাবণ দেববিদ্রোহী হয়েও পরম শৈব। চরমবিপদে তিনি ইষ্টদেবকেই স্মরণ করেন—'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে'। এবং শেষ বিশ্লেষণে তাঁর আত্মমথিত হলাহল-পানে নীলকণ্ঠ রাবণ কবির দৃষ্টিতে তাঁর আরাধ্য দেবতার সঙ্গেই যেন অভিন্ন হয়ে উঠেছেন। পুত্রের শেষকৃত্য পালনের জন্য শ্মশানযাত্রায় সর্বাভরণরিক্ত রাবণের 'বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী' কবিদৃষ্টিতে উৎপ্রেক্ষার বিভ্রম এনে দিয়েছে: 'ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে।' কিন্তু এই ধর্ম মানব-মহিমাকেই উজ্জ্বল করে, এ মানবতারই মর্মকোষে অনুভূত গূঢ়সঞ্চারিণী আত্মপ্রেরণা। দেবশক্তির আনুগত্য, দৈববলের দাসত্বের সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। তাই দৈবনির্ভর দেবকুলপ্রিয় রাম-লক্ষ্মণের বীরত্বের প্রতি মধুসূদনের এত অবজ্ঞা ও অবহেলা।

কিন্তু এহ বাহ্য। রাবণ মধুসূদনের মানবিকতার নবচেতনাকে উজ্জীবিত করেছেন সত্য, কিন্তু মধুসূদন রাবণকে তাঁর 'মেঘনাদবধে'র নায়করূপে কখনোই কল্পনা করেন নি। এমন কি, মাইকেলি বুলিতেও তার সাক্ষ্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। মধুসূদনের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর সমালোচকগণেরই কেউ কেউ রাবণকে 'মেঘনাদবধে'র নায়কপদে বসিয়ে দিয়েছেন, এবং তাঁদের রাবণ-কেন্দ্রিক বিচারে কবির বীররসাশ্রিত মহাকাব্য করুণরসের অশ্রু-

নির্ঝরে পরিণত হয়েছে।[২১] প্রকৃতপক্ষে 'মেঘনাদবধে'র সৃষ্টিকর্তার কাঙ্ক্ষিত নায়ক রাবণ নন—ইন্দ্রজিৎ। এ সম্পর্কে কবির নিজের অভিমত কি, এবং 'চতুর্দশপদী'তে তিনি কি ইঙ্গিত রেখে গিয়েছেন তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এবং সেইজন্যেই এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে। 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে "উপক্রম" কবিতায় আত্মকৃতির পরিচয়-প্রসঙ্গে কবি বলছেন :

> কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
> গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল, কেমনে
> নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র লঙ্কার সমরে,
> দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে ;—

অর্থাৎ কবির নিজের কথায় সুমিত্রাপুত্র (কবির অবজ্ঞা লক্ষণীয়) কর্তৃক দেবদৈত্যনরাতঙ্ক রক্ষেন্দ্র-নন্দন-বিনাশই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র মূলকথা। রামায়ণ সম্পর্কে মধুসূদনের দৃষ্টিও একটু স্বতন্ত্র ছিল। রাম-রাবণ-যুদ্ধের প্রতি তাঁর বিশেষ কৌতূহল ছিল না। তাঁর রামায়ণ-চেতনার কেন্দ্রভূমিতে রয়েছেন মানুষের সংসারে প্রেম করুণা সৌন্দর্য ও পবিত্রতার প্রতিমূর্তি নারীলক্ষ্মী সীতা। অশোক-বনে বন্দিনী সীতার পদমূলে যখন স্বর্ণলঙ্কার স্বর্ণকান্তি রাজবধূ সরমা এসে বসলেন, তখনই কবিকণ্ঠে মহত্তম কাব্যালংকারের সৃষ্টি হয়েছে :

> সুবর্ণ-দেউটি
> তুলসীর মূলে যেন জ্বলিল উজলি'
> দশ দিশ !

মধুসূদনের দৃষ্টিতে সীতা নিত্যপবিত্র তুলসী। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুমানসলক্ষ্মী সীতা বার বার দেখা দিয়েছেন। "রামায়ণ" কবিতার অষ্টকবন্ধটি অবিস্মরণীয় :

> সাধিনু নিদ্রায় বৃথা সুন্দর সিংহলে।—
> স্মৃতি, পিতা বাল্মীকির বৃদ্ধ রূপ ধরি,

বসিলা শিয়রে মোর ; হাতে বীণা করি,
গাইলা সে মহাগীত, যাহে হিয়া জ্বলে ;
যাহে আজু আঁখি হতে অশ্রুবিন্দু গলে !
কে সে মূঢ় ভূভারতে, বৈদেহি-সুন্দরি,
নাহি আর্দ্রে মনঃ যার তব কথা স্মরি,
নিত্যকান্তি কমলিনী তুমি ভক্তি-জলে !

করুণরসের উদাহরণ-হিসাবেও উত্তরকাণ্ডে নির্বাসিতা সীতাকেই কবি মূর্তিমতী করুণারূপে ধ্যান করেছেন। "সীতা দেবী" কবিতায় কবি বলছেন, 'অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা বৈদেহি !' এবং সেখানেই রাবণের উদ্দেশে কবির চরম ভৎর্সনাবাণী উচ্চারিত হয়েছে :

কি সাহসে, সুকেশিনি, হরিল তোমারে
রাক্ষস ? জানে না মূঢ়, কি ঘটিবে পরে !
রাহু-গ্রহ-রূপ ধরি বিপত্তি আঁধারে
জ্ঞান-রবি, যবে বিধি বিড়ম্বন করে !
মজিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ত্রিসংসারে,
ভূকম্পনে দ্বীপ যথা অতল সাগরে !

কবিকণ্ঠের ক্ষমাহীন এই ভৎর্সনার কথা 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র বিচার-প্রসঙ্গে অবশ্যই মনে রাখতে হবে। রাবণ মহাবীর, কিন্তু সে মূঢ়। বিধিবিড়ম্বনায় তার জ্ঞানরবি রাহুগ্রস্ত। সীতাহরণ-রূপ বিপত্তিই রাবণের সর্বনাশের কারণ। রাবণের এই মহা-অপরাধেরই নির্মম প্রায়শ্চিত্তরূপে রক্ষোবংশ-নাশ—'মজিবে এ রক্ষোবংশ খ্যাত ত্রিসংসারে।' এ যেন মহাকবিকণ্ঠে দ্বিতীয় অভিশাপ ; 'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাংত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।' পিতৃপুরুষের মূঢ়তায় বীরবংশের বিনাশই 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র এপিক-ট্রাজেডির মর্মকথা। রক্ষোবংশের শেষ বীরসন্তান মেঘনাদই তাই এ কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং

তাঁর অপমৃত্যুই কাব্যের কেন্দ্রীয় ঘটনা। মেঘনাদ মধুসূদনের কল্পনায় বীরবংশের সিংহশিশু। 'রাক্ষস-কুল-শেখর' সে, 'রাক্ষস-কুল-ভরসা'। কাব্যের প্রথম সর্গে তার বীর-সজ্জা ও বীরযাত্রার যে চিত্র কবি অঙ্কন করেছেন তাতে মনে হয়, চতুর্দশপদীর 'বীররস'ই যেন এই 'রাক্ষস-কুল-হর্যক্ষ' 'রথীন্দ্রর্ষভে'র মধ্যে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, অগ্নি-উপাসক এই বীরসন্তানের মধ্যে মধুসূদন নবমানবতার নিষ্কলুষ বীরমহিমার ধ্যান করেছিলেন। 'মেঘনাদবধে'র মহাকবি তারই কীর্তি-কীর্তনে 'বীররসে ভাসি' গম্ভীরে বীণা বাজিয়েছেন।

'মেঘনাদবধ' যে বীররসাত্মক মহাকাব্য, মেঘনাদকে কেন্দ্র করে কাব্যের বিশ্লেষণ করলেই এ সত্য উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু তার পূর্বে বীররস সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণা কি, তার পরিচয় সংগ্রহ করা যাক। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে বীররসের যে তিনটি উদাহরণ আছে তার তৃতীয় অর্থাৎ সর্বশেষ উদাহরণেই কবির রসমূর্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবিতাটির নাম "কুরুক্ষেত্রে"। 'অভিমন্যুবধ'ই তার বিষয়ালম্বন।—

যথা দাবানল বেড়ে অনল-প্রাচীরে
সিংহ-বৎসে, সপ্তরথী বেড়িলা তেমতি
কুমারে। অনল-কণা-রূপে শর, শিরে
পড়ে পুঞ্জে পুঞ্জে পুড়ি, অনিবার গতি!
সে কাল অনল-তেজে সে বনে যেমতি
রোষে, ভয়ে সিংহ-শিশু গরজে অস্থিরে,
গরজিলা মহাবাহু চারিদিকে ফিরে
রোষে, ভয়ে। ধরি ঘন ধূমের মূরতি,
উড়িল চৌদিকে ধূলা, পদ-আস্ফালনে
অশ্বের। নিশ্বাস ছাড়ি আর্জুনি বিষাদে,

ছাড়িলা জীবন-আশা তরুণ যৌবনে!
আঁধারি চৌদিক যথা রাহু গ্রাসে চাঁদে
গ্রাসিলা বীরেশে যম। অন্তের শয়নে
নিদ্রা গেলা অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে।

পাঠকগণ, 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র ষষ্ঠ সর্গে 'অন্যায় বিবাদে' নিহত মেঘনাদের সংগ্রাম ও অন্তিম-শয়নের কথা স্মরণ করুন। বীররসাশ্রিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ২৬৮টি চরণে কবি সেখানে যে অমর সংগ্রামের কথা বলেছেন, এখানে চতুর্দশ পংক্তির সুমিত সীমায় তাকে ধরতে হয়েছে, কিন্তু স্বাদ একই। মেঘনাদের অন্তিম শয়ন-দৃশ্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে :

অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু
রাক্ষসকুল-ভরসা, পরুষ বচনে
কহিলা লক্ষ্মণ শূরে,—"বীরকুলগ্লানি,
সুমিত্রানন্দন, তুই! শত ধিক্ তোরে!
রাবণনন্দন আমি, না ডরি শমনে!
কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে!
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?
আর কি কহিব তোরে? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে,
নরাধম? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস্ যদিও তুই, পশিবে সে দেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নিরাশি সম তেজে!
দাবাগ্নিসদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস, কুমতি!

নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন
ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুষিলে?
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে,
কলঙ্কি?" এতেক কহি, বিষাদে সুমতি
মাতৃপিতৃপাদপদ্ম স্মরিলা অন্তিমে।
অধীর হইলা বীর ভাবি প্রমীলারে
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা,
অনর্গল বহি, হায়, আদ্রিল মহীরে।
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্তাচলে।
নির্বাণ পাবক যথা, কিম্বা ত্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে।

বলাই বাহুল্য, এখানে মধুসূদন প্রাচীন গ্রীসের এপিক-ট্রাজেডির মহত্তম মহিমাকে বাংলা কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করেছেন। নিষ্কলুষ বীরশিশু, কিন্তু অগ্নি-উপাসনা তার অসম্পূর্ণ রয়ে গেল বলেই সে নিরস্ত্র অবস্থায় প্রাণ হারাল। পিতৃপুরুষের মূঢ়তা—রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের অপরাধের প্রায়শ্চিত্তরূপেই—মানুষের সংসারে এই সিংহ-শিশুর আত্মবলি অনিবার্য হয়ে উঠল। সেই জন্যই মেঘনাদের প্রাণহনন সবচেয়ে বেশি অনুশোচনীয়। তাই স্বর্ণলঙ্কার অন্তঃপুরে রোদননিনাদ উঠেছে। কবিও তাঁর এই অমর শিশুহত্যার মুহূর্তে কম কান্না কাঁদেন নি। তবু মধুসূদনের কল্পনায় এ-ই বীররস, এ-ই তাঁর এপিক-ট্রাজেডি। তাঁর বিষাদাত্মক নাটক 'কৃষ্ণ-কুমারী'তেও এই একই রসকল্পনা। নিষ্কলুষা কৃষ্ণকুমারী। মানব-জীবনের সহজাত প্রেমসংগীতে সেই রাজকুলকমলিনীর হৃদয় পূর্ণ হয়েছে; এই তার অপরাধ। কিন্তু রক্ষিতা-প্রেম-কলুষিত জগৎ সিংহের লালসার রাহুগ্রাসে সে গ্রস্তা। আত্মরক্ষায় অসমর্থ পিতা ভীমসিংহ দুর্বল। রাজ্য ও রাজবংশের সম্মানরক্ষার জন্য তাই

দেশমাতৃকার বেদীমূলে কৃষ্ণকুমারীর আত্মোৎসর্জন। পিতৃপুরুষের অক্ষমতার অপরাধে সেখানেও সন্তানের আত্মদানেই ট্রাজেডির রসমোক্ষ ঘটেছে। শুধু মধুসূদনেরই নয়, বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী অধ্যায়েও ট্রাজেডির এই রূপটি উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জনে'। 'বিসর্জনে'ও রঘুপতির অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জয়সিংহের আত্মবলিদানে। বস্তুতঃ, নায়ক-চরিত্রের ট্রাজেডি-রচনায় 'মেঘনাদ বধ' আর 'বিসর্জনে'র রসকল্পনা একই জীবনবোধ থেকে উৎসারিত। 'চতুর্দশপদী'র উদ্ধৃত কবিতাবলী সেই জীবনবোধেরই নিদর্শন।

৯

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র কাব্যোৎকর্ষের যথাযোগ্য বিচার-বিশ্লেষণ আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে হয় নি। জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী সৌন্দর্যে মধুসূদনের অন্যান্য কাব্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট'। তাঁর মতে 'মধুসূদনের কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে হইলে, যেমন তাঁহার মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা পাঠ করা আবশ্যক, মধুসূদনকে জানিতে হইলে, তেমনি তাঁহার চতুর্দশপদী কবিতাবলী পাঠ করিবার প্রয়োজন।'[২২] পরবর্তী সমালোচকগণ মোটামুটি এই দৃষ্টিতেই চতুর্দশপদীর বিচার করেছেন। মোহিতলাল তাঁর 'কবি শ্রীমধুসূদন' গ্রন্থে নিতান্ত অবজ্ঞার সঙ্গেই এই কাব্যগ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।[২৩] 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে 'সনেট' প্রবন্ধে মধুসূদনের সনেট সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য তীব্রতর।[২৪]

কেউ কেউ মনে করেন মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে এক বিরাট সম্ভাবনার স্বপ্ন নিয়ে এসেছিলেন বটে, কিন্তু সে সম্ভাবনা শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনার স্তরেই অবরুদ্ধ হয়ে রইল, মহৎ সৃষ্টির সার্থকতায়

কোনদিনই তা সফল হয়ে উঠতে পারল না। তিনি এক অলিখিত মহাকাব্যের কবি হয়েই রইলেন। নাটক বা প্রহসন, মহাকাব্য বা গীতিকাব্য—নানাদিক দিয়েই তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পথিকৃৎ বলা যেতে পারে; কিন্তু তার অধিক সম্মান তাঁর প্রাপ্য নয়। আবার অন্য কেউ কেউ মনে করেন চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনাকালে মধুপ্রতিভা অস্তাচলের দিকেই ঢলে পড়েছে। মেঘনাদবধেই তাঁর প্রতিভার মাধ্যন্দিন দীপ্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, 'চতুর্দশপদী'তে 'অস্তগামী-ভানু-প্রভা-সদৃশ' সে দীপ্তি নির্বাণোন্মুখ।

মেঘনাদবধ মহাকাব্যের কবি হিসাবেই মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে প্রখ্যাতনামা। মোহিতলাল বলেছেন, 'উহাই মধুসূদনের একমাত্র কবিকীর্তি', তাই তিনি 'কবি শ্রীমধুসূদনের কাব্য ও কবি-চরিত'-এর বিচারপ্রসঙ্গে মুখ্যত মেঘনাদবধকেই অবলম্বন করেছেন। মহাকাব্য-রচনার প্রতিভা নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেছেন গীতিকাব্যের রচয়িতা হিসাবে তাঁর কীর্তি অনুল্লেখযোগ্য, এমন কথাও কেউ কেউ মনে করে থাকেন। এই প্রসঙ্গে মিলটন সম্পর্কে জনসনের মন্তব্যটি স্মরণ করা যেতে পারে। মিলটনের সনেট সম্পর্কে শ্রীমতী মূরকে জনসন বলেছিলেন,

> Milton, madam, was a genius that could cut a colossus from a rock, but could not carve heads upon cherry-stones.[২৫]

অর্থাৎ, রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায়, পিরামিড নির্মাণ যাঁর দ্বারা সম্ভব তাজমহলসৃষ্টি তার কর্ম নয়। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসে বার বার প্রমাণিত হয়েছে যে, মহাকাব্যরচনার প্রতিভা আর গীতিকাব্য-রচনার প্রতিভার মধ্যে অহিনকুল সম্পর্ক বিরাজমান নয়। রঘুবংশ-কুমারসম্ভবের কবিই ঋতুসংহার-মেঘদূত রচনা করেছেন; য়ুরোপেও ভার্জিল, তাসো, দান্তে, পেত্রার্কা, মিলটন ও গ্যয়টের মধ্যে মহাকাব্য

এবং গীতিকাব্য-সৃষ্টির প্রতিভা একাধারেই রক্ষিত ছিল। এ সম্বন্ধে 'প্রসন্নরাঘবম্' নাটকে পীযূষবর্ষ জয়দেবের মন্তব্যটি উদ্ধারযোগ্য। নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারকে নট বলছেন, এই গ্রন্থরচয়িতা প্রমাণপ্রবীণ অর্থাৎ ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিত বলেই খ্যাত। 'তদিহ চন্দ্রিকাচণ্ডাতপয়োরিব কবিতাতার্কিকত্বয়োরেকাধিকরণতামালোক্য বিস্মিতোঽস্মি।' একই সময়ে আকাশে চন্দ্র এবং সূর্যের জোতিঃপ্রকাশ যেমন অকল্পনীয়, তেমনি একই আধারে কবিতা এবং তার্কিকত্বের অস্তিত্বও বিস্ময়াবহ। তার উত্তরে সূত্রধার বলছেন, এতে বিস্ময়ের কি আছে!—

> যেষাং কোমলকাব্যকৌশলকলালীলাবতী ভারতী
> তেষাং কর্কশতর্কবক্রবচনোদ্গারেঽপি কিং হীয়তে।
> যৈঃ কান্তাকুচমণ্ডলে কররুহাঃ সানন্দমারোপিতা-
> স্তৈঃ কিং মত্তকরীন্দ্রকুম্ভশিখরে নারোপণীয়াঃ শরাঃ॥

অর্থাৎ, ললিতকাব্যকলায় লাস্যময়ী যাদের বাণী কর্কশ তর্কের বক্রবচনোদ্গারে তাদের হানি কি? প্রিয়ার পয়োধরে যারা রতিরভসে হস্তারোপ করে মত্ত করীন্দ্রের কুম্ভশিখরে কি তারা শরাঘাত করবে না?

সূত্রধারের উক্তি ভারতীয় রসিকজনোচিত উক্তিই বটে! কিন্তু আদিরসাশ্রিত উপমাটির দিকে লক্ষ্য না করেও জয়দেবের অনুসরণে বলা যেতে পারে যে, কবিতা এবং তার্কিকত্বের একাধিকরণত্ব যদি সম্ভব হয়, তাহলে মহাকাব্যসৃষ্টির প্রতিভা আর গীতিকাব্যসৃষ্টির প্রতিভার একাধিকরণত্বই বা হবে না কেন?

সাহিত্যক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রতিভাও ছিল বহুমুখী। এবং মহাকাব্যরচনায় মেঘনাদবধের কবি হিসাবে তিনি যে সাফল্য অর্জন করেছেন গীতিকাব্যরচনায় 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র কবি হিসাবেও তাঁর সাফল্য তার চেয়ে ন্যূন নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত

মহাকাব্যের ধারা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের অর্ধসফল অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রয়েছে ; কিন্তু বিষয়ালম্বন, রীতি ও কলাকৃতির দিক দিয়ে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে তিনি যে গীতিকাব্যধারার প্রবর্তন করেছেন পরবর্তী কালে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল, দেবেন সেন প্রমুখ উত্তরসূরিবৃন্দের সার্থক সাধনার মধ্যে তা নবনব সাফল্যের নিত্যপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।

গীতিকাব্যে আকাশপৃথিবীব্যাপী বিচিত্র বিষয়কে অবলম্বন করে কবিকল্পনার মণিদীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সূচীপত্র থেকেই এর বিষয়ালম্বনের ঐশ্বর্য সূচিত হবে। নিম্নে তাই নটি ভাগে বিভক্ত করে গ্রন্থের বিষয়সূচী সংকলিত হল :

১। আত্মপরিচয় : উপক্রম ১, ২, পরিচয় ১, ২, বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উদ্দেশে, শতসংখ্যক কবিতা [প্রফুল্ল কমল যথা], সমাপ্তে।

২। মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি : বঙ্গভাষা, কপোতাক্ষ নদ, ভাষা, সংস্কৃত, ভারতভূমি, আমরা, কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া, অমিত্রাক্ষর।

৩। সারস্বত-কথা : কবি, শ্রীপঞ্চমী, কবিতা, সরস্বতী, কল্পনা, দ্বেষ ১, ২, সাংসারিক জ্ঞান, অর্থ।

৪। বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতি : দেবদোল, আশ্বিনমাস, বিজয়া দশমী, কোজাগর লক্ষ্মীপূজা, ব্রজবৃত্তান্ত।

৫। কবি- ও কোবিদ- তর্পণ : কমলে কামিনী, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস, জয়দেব, কালিদাস, ঈশ্বর গুপ্ত, বাল্মীকি। কবিগুরু দান্তে, কবিবর আলফ্রেড টেনিসন, কবিবর ভিক্তর হ্যুগো।
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত থিওডোর গোল্ডস্টুকর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৬। কাব্যরসোদ্গার : মেঘদূত, ১, ২, সীতাদেবী, মহাভারত, ঈশ্বরী পাটনী, সুভদ্রাহরণ, কিরাত-আর্জুনীয়ম্, করুণ রস, সীতা বনবাসে

১, ২, বীররস, গদাযুদ্ধ, গোগৃহরণে, কুরুক্ষেত্রে, শৃঙ্গাররস, ৫৮ সংখ্যক কবিতা [নহি আমি, চারু-নেত্রা,], সুভদ্রা, উর্বশী, রৌদ্ররস, দুঃশাসন, হিড়িম্বা ১, ২, পুরুরবা, শিশুপাল, রামায়ণ, হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু, শকুন্তলা, শ্রীমন্তের টোপর।

৭। নিসর্গ : দ্যুলোক : সায়ংকাল, সায়ংকালের তারা, নিশা, ছায়া-পথ, সূর্য, নন্দনকানন, রাশিচক্র, শনি, তারা।

নিসর্গ : ভূলোক : নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির, কুসুমে কীট, বটবৃক্ষ, মধুকর, উদ্যানে পুষ্করিণী, কেউটিয়া সাপ, সাগরে তরি, পৃথিবী।

৮। পাখি : বউ কথা কও, বসন্তে একটি পাখীর প্রতি, শ্যামা পক্ষী।

৯। তত্ত্বচিন্তা : যশের মন্দির, প্রাণ, নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির, ভরসেল্‌স্ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান, পরলোক, শ্মশান, নূতন বৎসর, যশঃ, ভূতকাল, আশা।

এই শ্রেণীবিন্যাসে বিষয়ালম্বনের যে বৈচিত্র্যই ধরা পড়ুক না কেন, মধুসূদন যে পেত্রার্কার কাব্য থেকে প্রত্যক্ষভাবে প্রেরণা পেয়েছেন তার উদাহরণও চতুর্দশপদীতে রয়েছে। এমার্সন শেকস্‌পীয়র প্রসঙ্গে বলেছেন The world takes liberties with world-books. আর নবজন্মোত্তর য়ুরোপে পেত্রার্কার প্রেমকাব্য যে সারা পৃথিবীর সম্পদ বলে গৃহীত হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। মধুসূদনের মধুকরী কল্পনা কি ভাবে পেত্রার্কার চিত্তফুলবনমধু আহরণ করে নবমধুচক্র রচনা করেছে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মধুসূদনের 'সাংসারিক জ্ঞান' সনেটটির কথাই বলছি :

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূরে নাচায়ে ?

স্বতরিতে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর-জলে স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অন্ন অর্দ্ধ মাত্র খায়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?
ছিঁড়ি তার-কুল, বীণা ছুঁড়ি ফেল দূরে !"—
কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি।
কিন্তু চিত্ত-ক্ষেত্রে যবে এ বীজ অঙ্কুরে,
উপাড়ে ইহায় হেন কাহার শকতি ?
উদাসীন-দশা তার সদা জীব-পুরে ;
যে অভাগা রাঙা পদ ভজে, মা ভারতি !

এই কবিতাটির সঙ্গে পেত্রার্কার সপ্তম সনেটের তুলনা করা যেতে পারে। জনৈক বন্ধুকে কাব্যরচনায় প্রেরণা দিয়ে পেত্রার্কা বলছেন,—'La, gola e' l sonno, e l' oziose piume.' —এনন-কৃত অনুবাদটি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

Torn is each virtue from its earthly throne
By sloth, intemperance, and voluptuous ease ;
E'en nature deviates from her wonted ways,
Too much the slave of vicious custom grown.
Far hence is every light celestial gone,
That guides mankind through life's perplexing maze ;
And those, whom Helicon's sweet waters please,
From mocking crowds receive contempt alone.
Who now would laurel, myrtle-wreaths obtain ?
Let want, let shame, Philosophy attend !
Cries the base world, intent on sordid gain.
What though thy favourite path be trod by few ;
Let it but urge thee more, dear gentle friend !
The great design of glory to pursue.

প্রকাশে পার্থক্য থাকলেও ভাবানুষঙ্গ অভিন্ন। বিশেষ করে

মধুসূদনের 'কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি' পেত্রার্কার 'Cries the base world, intent on sordid gain.'—এই বাক্যের প্রতিধ্বনি বলেই মনে হবে।

কিন্তু চতুর্দশপদীর রূপ ও রূপকল্প-রচনায় পেত্রার্কার কবিকৃতির প্রভাব মধুসূদনের উপর থাকলেও উভয়ের বৈসাদৃশ্যের কথাই বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে হবে। পেত্রার্কার কাব্যপ্রেরণা প্রেমৈকসর্বস্ব না হলেও প্রেমকেন্দ্রিক ; চতুর্দশপদীতে প্রেমকল্পনা মধুর ও সুন্দর হলেও সেখানে প্রেম মুখ্য নয়, গৌণ।[২৬]

চতুর্দশপদীর বিষয়ালম্বনগত শ্রেণীবিন্যাসের নবম অর্থাৎ শেষ পর্যায়ের দিকে লক্ষ্য করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে। তত্ত্বচিন্তা, অর্থাৎ জীবন ও জগতের স্বরূপচিন্তনে মধুসূদন পেত্রার্কা-পন্থী নন, এদিক দিয়ে তিনি ওবিদ (Ovid) ও হোরেস-(Horace)-পন্থ কবি। মহাভারতকার বলেছিলেন পৃথিবীর বার্তা হল, 'ভূতানি কালঃ পচতি।' সর্বগ্রাসী কালের করাল কবলে কবলিত হওয়াই এই মরজীবনের নিয়তি। মধুসূদনের চেতনায়ও এই সত্যই বিধৃত : 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে, চিরস্থির কবে নীর হায় রে, জীবন-নদে?' কবি মানবজীবনের এই অনিবার্য নিয়তিকে স্বীকার করে নিয়েই বলেছেন, 'কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি?'

ওবিদের 'মেটামরফসিস' গ্রন্থের পঞ্চদশ অর্থাৎ অন্তিম পর্বে পিথাগরাস বলছেন,

Et quoniam magno feror aequore plenaque ventis
vela dedi : nihil est toto, quod persted, in orbe.
Cuncta fluunt, omnisque vagans formatur imago ,
ipse quoque absiduo labuntur tempora motu,
non secus ac flumen ; neque enim consistere flumen,
nec levis hora potest : sed ut unda inpellitur unda.

urgueturque eadem veniens urguetque priorem,
tempora sic fugiunt pariter pariterque sequuntur
et nova sunt semper ; nam quod fuit ante, relictum est
fitque, quod haud fuerat, momentaque cuncta novantur.

[*Metamorphoses, XV. 176-85*]

Since I have set sail upon a wide ocean, and spread my canvas to the wind, let me continue further. Nothing is constant in the world. Everything is in a state of flux, and comes into being as a transient appearance Time itself flows on with constant motion, just like a river : for no more than a river can the fleeting hour stand still. As wave is driven on by wave, and, itself pursued, pursues the one before, so the moments of time at once flee and follow, and are ever new. What was before is left behind, that which was not comes to be, and every minute gives place to another.[২১]

[অনুবাদ : Mary M. Innes, পেঙ্গুইন ক্লাসিক্‌স্]

ওবিদের পিথাগরাসের এই উক্তিই শেক্‌স্‌পীয়রের বিখ্যাত সনেট 'Like as the waves make towards the pebbled shore'-এ প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'সম্মুখ-উর্মিরে ডাকে পশ্চাতের ঢেউ'ও এই চেতনারই কাব্যরূপ। মধুসূদনের 'নূতন বৎসরে' 'কালের নিত্যগামী রথচক্রে'র কল্পনাও একই রূপকে রূপায়িত—

ভূত-রূপ সিন্ধু-জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।—

'নূতন বৎসর' সনেট 'আত্মবিলাপের'ই ঘনীভূত ও সংহত কাব্যরূপ। 'আত্মবিলাপে' বিলাপই মুখ্য, কিন্তু 'নূতন বৎসরে' ব্যক্তিগত আবেগবিহ্বলতা তত্ত্বচিন্তায় উন্নীত হয়ে সর্বমানবীয় নিয়তির অমোঘ

বিধানকেই উদ্ঘাটিত করেছে। 'নূতন বৎসরে'র ষট্‌কবন্ধটি তাই কবির আত্মকথা হয়েও সর্বমানবকথা :

বাড়িতে লাগিল বেলা ; ডুবিবে সত্বরে
তিমিরে জীবন-রবি। আসিছে রজনী,
নাহি যার মুখে কথা বায়ু-রূপ স্বরে ;
নাহি যার কেশ-পাশে তারা-রূপ মণি ;
চির-রুদ্ধ দ্বার যার নাহি মুক্ত করে
উষা,—তপনের দূতী, অরুণ-রমণী !

আসন্ন মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে নিঃসহায় মানুষের চিরন্তন মর্মান্তিক বেদনাই এখানে ভাষা পেয়েছে। জিজীবিষু মানুষের কাছে মৃত্যুর কালরাত্রি যে কি ভয়ংকর কবিতাটি তারই চির-করুণ কাব্যরূপ। এই প্রসঙ্গে একটি বাগ্‌ভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য না করে পারা যায় না। কবি বলেছেন, 'বাড়িতে লাগিল বেলা' ; কিন্তু সূর্য যখন অস্তাচলে ঢলে পড়ে তখন বেলা বাড়ে না, বেলা পড়ে। মধুসূদনের জীবনে কিন্তু কথাটি নূতন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। মোটামুটি ভাবে একশত বৎসরই মর্তলোকে মানুষের পরমায়ু। মধুসূদন উনপঞ্চাশ বৎসরেই ইহলীলা সংবরণ করেন ; অর্থাৎ তাঁর জীবন-রবি মাধ্যন্দিন আকাশে পৌঁছবার পূর্বেই অস্তমিত হল। তাই তাঁর জীবনে 'বেলা বাড়া' আর 'বেলা পড়া'য় কোনো পার্থক্য নেই।

'নদী-তীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব-মন্দির' দেখেও কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে, 'এ মন্দির-বৃন্দ হেথা কে নির্মিল কবে? কোন্ জন? কোন কালে?'—কালপ্রবাহের কর্মনাশা-জলে মানুষের সমস্ত কীর্তিই লুপ্ত হচ্ছে এ চিন্তা চতুর্দশপদীর একাধিক কবিতায় অভিব্যক্ত। কবি ভাবছেন, হয়ত এগুলির নির্মাতা মনে করেছিল এই কীর্তির মধ্যেই সে অমর হয়ে থাকবে, কিন্তু বৃথা সে কামনা ; কেন না :

গুঁড়া হয়ে উড়ি যায় কালের পীড়নে
পাথর ; হুতাশে তার কি ধাতু না গলে ?

'ভরসেল্‌স্‌ নগরে রাজপুরী ও উদ্যান' দেখেও কবিচিত্তে এই একই জিজ্ঞাসা !—'কোথা সে রাজেন্দ্র এবে, যার ইচ্ছা-বলে বৈজয়ন্তসম ধাম এ মর্ত্য-নন্দনে শোভিল ?' উত্তরও অবশ্য কবিচিত্ত পেয়েছে। কালকে লক্ষ্য করেই কবি বলছেন,

রে দুরন্ত, নিরন্তর যেমত সাগরে
চলে জল, জীব-কুলে চালাস্‌ সে মত।

শ্মশানে ভ্রমণ করেও কবির এই একই প্রতীতি, 'জীবনের স্রোতঃ পড়ে এ সাগরে আসি।' এই অপচীয়মান কাল নিত্য-ধাবমান। তাই তার অপচয়ে অনুশোচনা অনিবার্য। 'ভূত কাল' কবিতায় কবি বলেছেন,

পশে যে প্রবাহ বহি অকূল সাগরে,
ফিরি কি সে আসে পুনঃ পর্বত-সদনে ?

'আসে না,'—এই উত্তরের ব্যঞ্জনাই প্রশ্নের মধ্যে সমর্পিত। বলাই বাহুল্য, অপচিত অতীত সম্পর্কে কবিমানসের অনুশোচনাতে কবিতাটি মর্মস্পর্শী।

কিন্তু এই দুর্নিবার কালের গতি যেমন সত্য, মানুষের মনে মৃত্যুঞ্জয় জিজীবিষাও তেমনি সত্য। সেইজন্যই প্রতিদিন অগণিত জীবকে কালকৃত হতে দেখেও 'শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি।' মায়াবিনী আশা মানুষের হৃদয়ে তার কুহকজাল বিস্তার করে 'ভবিষ্যৎ অন্ধকারে' তার মায়াদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। শত ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের মধ্যেও তাই মানুষ 'মৃত্যুঞ্জয়ী আশার সংগীত' শুনতে পায়। কবি বলছেন, মৃত্যুর সঙ্গে কালের সঙ্গে বীরের মত সংগ্রামই মানুষের আচরণীয় ধর্ম : 'বীর-বীর্যে আশা-লতা কর ফলবতী।' বীরচর্যার

ফলেই আসে যশ, এবং এই যশঃ-শরীরেই মানুষ অমর। কবির এই উপলব্ধিটি 'যশঃ' কবিতায় সার্থক বাণীরূপ পেয়েছে। কবিতাটি অন্য কারণেও সমগ্রভাবে উদ্ধারযোগ্য :

লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে
বালিতে, রে কাল, তোর সাগরের তীরে ?
ফেন-চূড় জল-রাশি আসে কি রে ফিরে,
মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে ?
অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—

শূন্য-জল জল-পথে জলে লোক স্মরে ;
দেব-শূন্য দেবালয়ে অদৃশ্যে নিবাসে
দেবতা ; ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে।
সেইরূপে ধড় যবে পড়ে কাল-গ্রাসে,
যশোরূপাশ্রমে প্রাণ মর্ত্যে বাস করে ,—
কুযশে নরকে যেন, সুযশে—আকাশে !

মধুসূদনের এই সনেটটি স্পেন্সারের একটি সনেটকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেই সনেটটিও এই প্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :

One day I wrote her name upon the strand,
But came the waves and washed it away.
Again I wrote it with a second hand,
But came the tide and made my pains his prey.
'Vain man,' said she, 'that dost in vain assay
A mortal thing so to immortalize,
For I myself shall like to this decay,
And eke my name be wiped out likewise.'

'Not so,' quoth I. 'Let baser things devise
To die in dust, but you shall live by fame.
My verse your virtues rare shall eternize,
And in the heavens write your glorious name.
Where whenas death shall all the world subdue,
Our love shall live, and later life renew.'

রূপকল্পের দিক দিয়ে মধুসূদনের 'যশঃ' শীর্ষক সনেটের সঙ্গে এই কবিতার প্রথম চতুষ্কের আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে পার্থক্যও আছে। মধুসূদনের কবিতায় আত্মকথাই বড়, স্পেন্সারে 'তুমি' অর্থাৎ কবিপ্রিয়ার চেতনাই মুখ্য। স্পেন্সার তাঁর প্রেয়সীকে লক্ষ্য করে বলছেন, তাঁর কবিতাই প্রিয়ার দুর্লভ গুণাবলীকে অমরত্ব দেবে। মৃত্যু পৃথিবীর সব সত্তাকেই কবলিত করবে, কিন্তু তাঁদের প্রেম হবে চিরজীবী, পরবর্তী জীবনে সে হবে পুনর্নব। এখানে 'ইংলণ্ডের পেত্রার্কা' তাঁর ইতালীয় গুরুর কাছে যে প্রেমদীক্ষা পেয়েছিলেন তারই জয়ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে।

কিন্তু এবিষয়েও মধুসূদনের আনুগত্য ওবিদ ও হোরেসের প্রতি। হোরেস বলছেন,

Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non Aquilo impotens
Possit diruere, aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum.

[*Odes, III. XXX.*]

My work is done, the memorial more enduring than brass and loftier than the kingly building of the pyramids—something that neither the corroding rain nor the wild rage of Aquilo can ever destroy, nor the numberless succession of years and flight of ages.[২৮]

[অনুবাদ : ই. সি. উইক্‌হাম, অক্‌সফোর্ড, ১৯০৩]

ওবিদও তাঁর 'মেটামরফসিস' কাব্য শেষ করে বলছেন :

Iamque opus exegi, quod nec Iovis ira nec ignis,
Nec poterit ferrum nec edax abolere vetustas
Cum volet, illa dies, quae nil nisi corporis huius
Ius habet, incerti spatium mihi finiat aevi
Parte tamen meliore mei super alta perennis
Astra ferar, nomenque erit indelebile nostrum,
Quaque patet domitis Romana potentia terris,
Ore legar populi, perque omnia saecula fama,
Siquid habent veri vatum praesagia, vivam.

My work is complete ; a work which neither Jove's anger nor fire nor sword shall destroy, nor yet the gnawing tooth of time. That day which has power over nothing but my body may, when it pleases, put an end to my uncertain span of years. Yet with my better part I shall soar, undying, far above the stars, and my name will be imperishable. Wherever Roman power extends over the lands Rome has subdued, people will read my verse. If there be any truth in poet's prophecies, I shall live to all eternity, immortalized by fame.[২৯]

[অনুবাদ : Mary M. Innes, পেঙ্গুইন ক্লাসিক্স]

বলাই বাহুল্য, শেক্‌স্‌পীয়রের 'Not marble, nor the gilded monuments' সনেটটি ওবিদেরই অনুসরণ। 'কবিবর ভিক্‌তের হ্যুগো' কবিতায় মধুসূদন বলেছেন,

প্রস্তরের স্তম্ভ যবে গল্যে মাটি হবে,
শোভিবে আদরে তুমি মনের সংসারে !

এখানে কিন্তু ওবিদ ও শেক্‌স্‌পীয়রের সঙ্গে মধুসূদনের একটি লক্ষণীয় পার্থক্য বর্তমান। ওবিদ ও শেক্‌স্‌পীয়রের কণ্ঠে তাঁদের আত্মবিশ্বাস অহংকারের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ভারতীয় কবি ভবভূতিও

একদিন 'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা' বলে এই আত্মশ্লাঘাই প্রচার করেছিলেন। মধুসূদন তাঁর প্রথম কাব্য তিলোত্তমাসম্ভবের শিরোনামাপত্রে ভবভূতির এই শ্লোকের সঙ্গে হোরেসের "Neque• •te ut turba miretur, labores, Contentus paucis lectoribus." এবং মিলটনের "Fit audience find—tho' few."—এই উক্তিটি উদ্ধার করে আত্মশ্লাঘারই পরিচয় দিয়েছিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যেই কিন্তু তাঁর সুরের বদল হয়েছে। পূর্বসূরি মহাকবিগণকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে 'দীন যথা রাজেন্দ্র সঙ্গমে' 'তীর্থ দরশনে' যায় তেমনি তিনি কবিতীর্থ-পরিক্রমায় প্রয়াসী হয়েছেন। চতুর্দশপদীতে বিদ্বজ্জনসুলভ বিনয়ের সঙ্গেই তিনি আত্মপরিচয় দিয়েছেন। দান্তের ষট্‌শতবার্ষিকীতে ইতালিরাজের উদ্দেশে তাঁর পত্রে তিনি নিজেকে 'গঙ্গাতীরবাসী একজন সামান্য পদ্যকার' বলে বিনয়-ভাষণের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। শুধু যে সৌজন্যবোধ থেকেই সে বিনয়ের সৃষ্টি হয়েছে এমন নয়, চতুর্দশপদীতে কবিমানসের অহমিকার দম্ভ সম্পূর্ণই তিরোহিত হয়েছে। চতুর্দশপদীতে কাব্যরসিক সমাজ কবির সম্মানাস্পদ। তাই মেঘনাদবধের 'গৌড়জন' এখানে হয়েছে 'গৌড় সুভাজন,' 'গৌড়চূড়ামণি'। তাঁদের সন্তোষ বিধানই তাঁর কাম্য ;—'তুষি যেন বিজ্ঞে মা গো, এ মোর মিনতি।'

এই অনিত্য ও অশাশ্বত সংসারে সারস্বত কীর্তিই যে চিরস্থায়ী, এই বিশ্বাস মধুসূদনের কণ্ঠে বার বার বিঘোষিত হয়েছে। 'যশের মন্দিরে' কবি 'অতি তুঙ্গশৃঙ্গশিরে' যে 'সুবর্ণ দেউলে'র স্বপ্ন দেখেছেন আসলে ওটি বাণীরই দেউল। ভারতীর আশীর্বাদ-ধন্য ব্যক্তিই সেখানে যেতে পারে। আর সেই যশের মন্দিরে যার গাত 'অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে!' 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' কবিতায় তিনি ভাগ্যবান ভবানন্দকে বলছেন,

ধন-স্রোতে তব ভাগ্যতরি,
ভাসিবে অনেক দিন জননীর বরে।
কিন্তু চিরস্থায়ী অর্থ নহে এ সংসারে ;
চঞ্চলা ধনদা রমা, ধনও চঞ্চল ;
তবু কি সংশয় তব, জিজ্ঞাসি তোমারে ?
তব বংশ-যশঃ-ঝাঁপি—অন্নদামঙ্গল—
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডল ॥

এই কবিতাটি সম্পর্কে কবি স্বয়ং সগৌরবে বলেছিলেন 'ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর সম্পর্কে এমন মার্জিত সাধুবাদ কারো কণ্ঠেই উচ্চারিত হয় নি।' শুধু ভারতচন্দ্র সম্পর্কেই নয়, কবিকীর্তির যশোগানে মধুসূদন পঞ্চমুখ। তাঁর দৃষ্টিতে কবির কীর্তি দিগ্‌বিজয়ী রাজার কীর্তির চেয়েও মহত্তর মহিমামণ্ডিত। বাংলা মহাভারতের মহাকবি কাশীরামের অবিস্মরণীয় কীর্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁকে ভগীরথের সঙ্গে উপমিত করে বলেছেন :

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,
ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।
কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে এ তিন ভুবন ;

সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !

কবিকীর্তির যশোগানে মধুসূদন এখানে যে রূপকল্পটিকে পুষ্পিত করেছেন মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশে দিগ্‌বিজয়ী রঘুর রাজ-কীর্তির মহিমাব্যাখ্যানে সেই রূপকল্পটিই ব্যবহার করেছিলেন :

স সেনাং মহতীং কর্ষন্ পূর্বসাগরগামিনীম্।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ ॥
ত্যাজিতৈঃ ফলমুৎখাতৈর্ভগ্নৈশ্চ বহুধা নৃপৈঃ।
তস্যাসীদুল্বণো মার্গঃ পাদপৈরিব দন্তিণঃ ॥

[রঘুবংশ, ৪।৩৩-৩৪ ॥

"হরজটাভ্রষ্টা গঙ্গাকে লইয়া ভগীরথের ন্যায় মহারাজ রঘু স্বীয় সুসজ্জিত বিরাট বাহিনী লইয়া পূর্বসাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। [৩৩]। মদমত্ত দুর্দান্ত হস্তিযূথ যেরূপ পথিমধ্যবর্তী বনস্পতিসমূহকে উৎপাটিত, ছিন্ন ও ফলশূন্য করত স্বীয় পথ পরিষ্কার করিয়া লয়, রাজা রঘুও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিদিগের কাহাকেও পদচ্যুত, কাহাকেও বিমর্দিত এবং কাহাকেও বা সম্পূর্ণ পরাজিত করিয়া স্বীয় অভিযান-পথ পরিষ্কার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। [৩৪] ॥ অনুবাদ—পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালিদাস গ্রন্থাবলী, বসুমতী সংস্করণ।

মধুসূদন তাঁর অষ্টকে কালিদাসের 'হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ' রূপকল্পটিকেই বিশদীভূত করেছেন, আর ষট্‌কবন্ধের "সেইরূপে ভাষা-পথ খননি স্ববলে" প্রভৃতি অংশে কালিদাসের পরবর্তী শ্লোকের ক্ষাত্রবীর্যের সঙ্গেই উপমিত হয়েছে পথিকৃৎ কবির দুর্গম পথযাত্রা। বলাই বাহুল্য, কালিদাসের কল্পনা মধুসূদনে মহত্তর মানবসত্যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে ; কেননা, ক্ষত্রিয়ের দিগ্‌বিজয় মানবসভ্যতার অতীত যুগকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু কবিকীর্তি সনাতন ও পুনর্নব।

'যশঃ' কবিতায়ও কবি কালিদাসের আরেকটি রূপকল্প গ্রহণ করেছেন। কালিদাস রঘুর দিগ্‌বিজয়-প্রসঙ্গে বলেছেন :

মত্তেভরদনোৎকীর্ণব্যক্তবিক্রমলক্ষণম্।
ত্রিকূটমেব তত্রোচ্চৈর্জয়স্তম্ভং চকার সঃ॥ ৪।৫৯

"রঘুসৈন্যের মদমত্ত হস্তিগণের বিশাল দন্তের আঘাতে ত্রিকূট পর্বত একেবারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে মনে হইল, বিজয়ী রঘু বুঝি তাঁহার দিগ্‌বিজয়ী বিক্রমের ইতিবৃত্ত উল্লিখিত করিয়া—ঐ পর্বতকেই অভ্রভেদী বিজয়স্তম্ভরূপে প্রোথিত করিয়া গেলেন।"

[অনুবাদ—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ]

মধুসূদন তাঁর দ্বিতীয় চতুষ্কে বলেছেন :

অথবা খোদিনু তারে যশোগিরি-শিরে,
গুণ-রূপ যন্ত্রে কাটি অক্ষর সুক্ষণে,—
নারিবে উঠাতে যাহে, ধুয়ে নিজ নীরে,
বিস্মৃতি, বা মলিনিতে মলের মিলনে ?—

আমরা 'যশঃ' কবিতার সঙ্গে স্পেন্সারের সনেটের ভাবসাদৃশ্যের কথা বলেছি। মধুসূদনের কবিকল্পনা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকবি-গণের বিভিন্ন কাব্যমালঞ্চে মধুকরের মতই নিত্যসন্ধানী ছিল। ক্ষেমেন্দ্রের ভাষায় তিনি ছিলেন 'ভুবনোপজীব্য' কবি। কিন্তু চতুর্দশপদীতে মধুসূদন মুখ্যত ভারত-পথিক। ভারতীয় মহাকাব্য-সিন্ধুর মন্থনলব্ধ অমৃতই তিনি রূপদক্ষ ইতালীর শিল্পসুন্দর সুচারু-পাত্রে পরিবেশন করেছেন।

সারস্বতব্রতই শ্রেষ্ঠ জীবনব্রত : চতুর্দশপদীতে কবির উদাত্ত-কণ্ঠে এই সত্যই ঘোষিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় বিদগ্ধরসিকের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল যে, এই সংসারটি একটি বিষবৃক্ষ, কিন্তু তার দুটি অমৃত-ফল আছে,—কাব্যামৃতরসাস্বাদ আর সজ্জনসংগম। মধুসূদনের দৃষ্টিতে সহৃদয় কাব্যরসিকই মহত্তম সজ্জন। 'কবিতা'য়

তিনি বলেছেন, 'মনের উদ্যান মাঝে, কুসুমের সার কবিতা কুসুম-রত্ন।' সেই কাব্যকুসুমের সুরভি ও সৌন্দর্যে যার মন মোহিত হয় না সে 'দুর্মতি', অন্ধ ও বধিরের মতই জীবনের শ্রেষ্ঠ অমৃত-রস থেকে সে বঞ্চিত। প্রকৃত সারস্বত-সাধক কবিতা-অমৃত-রসেই জীবনের পরম চরিতার্থতার সন্ধান পান। 'মাৎসর্য-বিষ-দশনে'র দংশনে তিনি জর্জরিত হন না। 'দ্বেষ' শীর্ষক সনেট-যুগলে তাই 'ইন্দিরা সুন্দরী'র কাছে কবির একান্ত মিনতি, 'সুখী দেখি পরে, দাসের পরান যেন কভু নাহি জ্বলে।' জীবনে লক্ষ্মীর উপাসনার প্রয়োজন নেই, একথা বলা অবশ্য কবির উদ্দেশ্য নয় ; ধনদা রমার দাক্ষিণ্য জীবনে চাই। 'কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা'য় প্রবাসী কবি হৃদয়মন্দিরে দেবীর বন্দনা করে বলছেন, "থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে মা, হাসে চিররুচি কোকনদ।" বাঙালী জাতি লক্ষ্মীর প্রসন্নতা লাভ করুক, এই তো স্বদেশবৎসল কবির কাম্য! কিন্তু বাণীপুত্রের নিজের ধনের প্রতি কোনো লোভ নেই, তিনি জানেন কবিত্বই মানবজীবনে শ্রেষ্ঠ ধন। কেননা শুধুমাত্র কাব্যধনে যে ধনী সেই অমরত্বের অধিকারী হয়। 'অর্থ' কবিতার ষট্‌কাংশে সারস্বত-সম্পদের প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

> তার ধন অধিকারী হেন জন নহে,
> যে জন নির্বংশ হলে বিস্মৃতি-আঁধারে
> ডুবে নাম, শিলা যথা তল-শূন্য দহে।
> তার ধন-অধিকারী নারে মরিবারে।—

এই অমর সম্পদের অধিকারী হওয়া—কবিরূপে সে সম্পদ সৃষ্টি করা এবং সহৃদয়রূপে সে সম্পদ আস্বাদন করা,—মধুসূদনের দৃষ্টিতে এই হল মানব-জীবনের নিঃশ্রেয়স, মর্ত্যলোকের 'সর্বসাধ্যসার'।

মধুসূদন নিজে শুধু মহৎ কবিপ্রতিভারই অধিকারী ছিলেন না,

তিনি একজন গুণগ্রাহী সহৃদয়ও ছিলেন। সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অনুপ্রবেশ কত অন্তরঙ্গ ছিল চতুর্দশপদীর 'কবিতর্পণ' ও 'কাব্যরসোদ্গার' পর্যায়ে বিন্যস্ত কবিতাগুলি পড়লেই বুঝতে পারা যাবে। সংস্কৃত আলংকারিকগণের ভাষায় বলা যায় যে, কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে তাঁর বিশদীভূত মনোমুকুর তন্ময়ীভবন-যোগ্যতা লাভ করেছিল। ধনদা রমার প্ররোচনায় আশার কুহকে ভুলে কবি ফ্রান্সের নিঃসঙ্গ প্রবাসজীবনে অশেষ দুর্গতি ভোগ করেছেন। 'ইন্দিরা সুন্দরী'র প্রলোভনে প্রলুব্ধ সারস্বত সন্তান তাঁর প্রবাস-জীবনের বিড়ম্বনাকে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের বন্দিদশার সঙ্গে তুলনা করেছেন। ভার্সাই শহরে ১৮৬৩ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর 'দ্রৌপদীস্বয়ম্বর' কাব্য আরম্ভ করতে গিয়ে কবি বাগ্‌দেবীর বন্দনায় বলছেন :

> আইস মা, এ প্রবাসে বঙ্গের সংগীতে
> জুড়াই বিরহজ্বালা, বিহঙ্গম যথা
> রঙ্গহীন কুপিঞ্জরে কভু কভু ভুলে
> কারাগারদুখ সাধি কুঞ্জবনস্বরে।

'সুভদ্রাহরণে' এরই শেষ দুপংক্তির ঈষৎ পরিবর্তিত রূপ দেখতে পাওয়া যাবে—

> কারাগার পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
> কারাগার দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে!

দেখা যাচ্ছে, প্রবাসে বঙ্গের সংগীতই ছিল কবির বিরহজ্বালা জুড়াবার একমাত্র উপায়, বাসনার ফাঁসে পিঞ্জরাবদ্ধ কবিবিহঙ্গের মুক্তির একমাত্র আকাশ ছিল কাব্যের অমৃতলোক। কিন্তু কবি প্রথম জীবনে যে-সব য়ুরোপীয় মহাকবিগণকে দুঃসাধ্য তপস্যায় আয়ত্ত করেছিলেন চতুর্দশপদীতে তাঁদের কথা তাঁর মনে পড়ে নি,

মনে পড়েছে ভারতবর্ষের 'দেবভাষা' সংস্কৃতের, আর বিশেষ করে 'ভারতরত্ন' বঙ্গভাষার পূর্বসূরিবৃন্দকে।

বাংলার কবিদের মধ্যে জয়দেব, কাশীরাম ও কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রই মধুসূদনকে বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করেছিলেন। আর, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের রসিকমাত্রেরই জানা আছে যে, গীতিকাব্য মহাকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের মুক্তত্রিবেণীধারাতেই প্রাচীন বাংলার কাব্যধারা প্রবাহিত। মধুসূদনের কবিতর্পণপদ্ধতিটিও লক্ষ্য করবার মত। চতুর্দশাক্ষর পংক্তির মাত্র চোদ্দটি চরণের সংকীর্ণ সীমাতেই তিনি কবিপ্রতিভার মর্মলোক নির্বারিত করেছেন। জয়দেবকে কবি স্মরণ করেছেন তমালের তলে রাধাশ্যামের প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করার সঙ্গীরূপে। কিন্তু গোকুল-ভবনে মাধবের সাক্ষাৎ নাও যদি পাওয়া যায় কবির তাতে বিশেষ আপত্তি নেই, কেন না—

> না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
> পুরিও নিকুঞ্জরাজি বেণুর স্বননে !
> ভুলিবে গোকুল-কুল এ তোমার ছলে,—

কবি জানেন 'মাধবের রব, কবি, ও তব বদনে'! অর্থাৎ মধুসূদনের দৃষ্টিতে জয়দেবের হাতে গীতিকাব্যের যে বাঁশরী বেজেছে তা শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনির মতই মধুর ও চিত্তাকর্ষক। এই রসাস্বাদন-পদ্ধতি কাব্যশাস্ত্রালোচনার দ্বারা আয়ত্তগম্য নয়, তা সমানধর্মা সহৃদয়েরই হৃদয়সংবেদ্য। কাশীরামের কথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। মহাকবি কৃত্তিবাসের কবিকীর্তি উপমিত হয়েছে পবন-নন্দনের সার্থক সাগর-লঙ্ঘনের সঙ্গে—

> পবননন্দন হনু লঙ্ঘি ভীমবলে
> সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে

সীতার বারতা-রূপ সংগীত-লহরী ;—
তেমতি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি !

সংস্কৃত থেকে বাংলায় রামায়ণরচনা যেন 'রাঘবের কানে সীতার বারতা-রূপ সংগীত-লহরী' পরিবেশন করা ! রামায়ণকথা সম্পর্কে বাঙালীর পিপাসিত চিত্তের এর চেয়ে সার্থক উপমান আর কি হতে পারে ! মঙ্গলকাব্যের রসাস্বাদনেও কবি অনুরূপ সাংকেতিকতারই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কবিকঙ্কণ সম্পর্কে 'কমলে কামিনী' ও 'শ্রীমন্তের টোপর', আর ভারতচন্দ্র সম্পর্কে 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি' ও 'ঈশ্বরী পাটনী'—এই প্রতীকগুলিই কবিকৃতির মহিমা ব্যাখ্যানে ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্যের সৌন্দর্যসন্ধানই যদি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা হয় তাহলে মধুসূদনের এই সনেটগুলিও শ্রেষ্ঠ কবিভাষ্য।

কাব্যরসিক হিসাবে মধুসূদন শুধু অন্তরঙ্গ সহৃদয়ই নন, পূর্বসূরির প্রতি আনুগত্য ও অনুরক্তিতে তিনি শ্রদ্ধাপরায়ণ। 'ঈশ্বর গুপ্ত' কবিতাটি তারই উজ্জ্বল নির্দশন। জীবদ্দশায় যিনি গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন মৃত্যুর পরে তাঁর যশোরশ্মি নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে দেখে কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে :

আছিলে রাখাল-রাজ কাব্য-ব্রজধামে
জীবে তুমি ; নানা খেলা খেলিলা হরষে ;
যমুনা হয়েছ পার ; তেঁই গোপগ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা ? স্মরণ-নিকষে
মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে
নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে ?

কাব্যব্রজধামে যিনি রাখালরাজ ছিলেন, যমুনা পার হয়েছেন বলেই তাঁকে গোপগ্রাম বিস্মৃত হয়েছে, এই কল্পনায় কবির অনুযোগ কাব্যরসিক সমাজেরই বিরুদ্ধে। পূর্বগামী সম্পর্কে অনুগামীর এই শ্রদ্ধাসুন্দর দৃষ্টির মধ্যেই মধুমানসের স্বরূপটি ধরা পড়েছে।

সংস্কৃত কবি ও কাব্য সম্পর্কিত তাঁর প্রীতিতর্পণ তন্ময়ীভূত সহৃদয়ের আনন্দ-সংবিদ্ থেকেই স্বতঃ-উৎসারিত। সংস্কৃত ভাষাতে সংরক্ষিত কাব্য-সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ছিল মধুসূদনের একান্ত-বাঞ্ছিত সাধনার ধন। তাঁর দৃষ্টিতে 'সংস্কৃত, দেব-ভাষা মানবমণ্ডলে।' সংস্কৃতের মাধুর্য শক্তি ও প্রকাশক্ষমতার স্বরূপবর্ণনা করে তিনি বলেছেন :

> সাগর-কল্লোল-ধ্বনি, নদের বদনে,
> বজ্রনাদ, কম্পবান্ বীণা-তার-গণে !—

এই সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবনে কবি আনন্দিত হয়ে বলছেন, 'রাজাশ্রম আজি তব !' কাণ্ডারীবিহীন তরি সিন্ধুজলে দীর্ঘদিন ঝড়ঝঞ্ঝা সহ্য করে অবশেষে অনুকূল পবনে চালিত হলে যেমন কালে কূল লাভ করে, সৌভাগ্যবশত সংস্কৃতেরও তেমনি সুদশা ঘটেছে দেখে তিনি আহ্লাদিত। বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে মুখ্যত রামমোহনের সাধনাতেই নব্যবঙ্গের নাগরিক শিক্ষিত সমাজে সংস্কৃত বিদ্যা ও জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন হয়েছে। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের নবভগীরথ হলেন বিদ্যাসাগর। গদ্যসাহিত্যে তাঁর 'শকুন্তলা' ও 'সীতার বনবাসে'র গুরুত্ব কি ও কতটুকু সে ইঙ্গিত পূর্বেও দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, বিদ্যাসাগরই সংস্কৃত সাহিত্যরসে বাঙালীকে নব-দীক্ষা দান করলেন। সংস্কৃতে অনুপ্রবেশের সহজতর পন্থার তিনিই আবিষ্কর্তা। পরবর্তী জীবনে বাল্মীকির রামায়ণ (সটীক), মহা-ভারতের উপক্রমণিকা ভাগ (গদ্য), কালিদাসের রঘুবংশ কুমার-সম্ভব ও মেঘদূত, ভবভূতির উত্তরচরিত, ভারবির কিরাত-আর্জুনীয়ম্,

মাঘের শিশুপালবধ, বাণভট্টের হর্ষচরিত ও কাদম্বরী প্রভৃতি কাব্য-নাট্যগ্রন্থাদি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছে। এই সম্পর্কে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব'—শীর্ষক সংক্ষিপ্ত পরিচিতি-গ্রন্থখানিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যাসাগর-প্রবর্তিত পথেই পরবর্তী কালে উত্তরচরিত-প্রভৃতি প্রবন্ধ-রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব; এবং মধুসূদন সংস্কৃত কবি ও কাব্য সম্পর্কে কবির ছন্দে যে আস্বাদন ও শ্রদ্ধাতর্পণের রীতি প্রবর্তন করলেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' ও বিবিধ কবিতায় সেই রীতিরই সার্থকতর অনুসরণ নবনব সাফল্যে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

'কাব্যরসোদগার' শ্রেণীতে বিন্যস্ত সনেটগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারা যাবে সংস্কৃত কাব্যলোকে মধুসূদনের অনুপ্রবেশ কত গভীর ছিল। মেঘনাদবধকাব্যের কবিচিত্তে বাল্মীকির রামায়ণ এবং কালিদাসের রঘুবংশের প্রভাব থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক, কিন্তু বেদব্যাসের মহাকাব্যখানিও যে নব্যভারতের মহাকবিকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে তারও বহু নিঃসংশয় প্রমাণ 'চতুর্দশ-পদী'তে রয়েছে। 'কল্পনা' কবিতায় কবি 'বাগ্‌দেবীর প্রিয়সখী' 'হেমাঙ্গী কল্পনা'কে সঙ্গে নিয়ে ত্রিভুবন-পরিক্রমার যে কল্পচিত্র রচনা করেছেন তাতে রাধাকৃষ্ণ-লীলার গোকুল-কানন, রামায়ণের লঙ্কা এবং মহাভারতের কুরুক্ষেত্র-চিত্রই কবিমানসে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এবং এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয় যে, 'চতুর্দশপদী'তে মধুসূদন কোথাও রাবণ-প্রশস্তি রচনা করেন নি, এমন কি রাবণের প্রতি তাঁর কোনো সহানুভূতি ছিল এমন কোনো আভাসও এই কাব্যে কোথাও নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে, 'সীতাদেবী' কবিতায় রাবণ কর্তৃক সীতাহরণকে তিনি রাবণের 'মূঢ়তা' বলেছেন, এবং 'রাক্ষসে'র এই 'বিড়ম্বনা'তেই

রক্ষোবংশের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে, এই ভৎর্সনা-বাণীও উচ্চারিত হয়েছে। 'রামায়ণ' কবিতায় গুরুকৃপায় দিব্যচক্ষু লাভ করে কবি বলছেন, 'দেখিনু সুক্ষণে শিলা জলে।' স্পষ্টতই বুঝতে পারা যাচ্ছে, 'মেঘনাদবধের' কবি একদিন রাবণের সর্ব-বিদ্রোহী মহাশক্তির প্রতি যতই পক্ষপাত প্রদর্শন করুন না কেন, 'চতুর্দশপদী'তে রাবণের প্রতি শ্রদ্ধা দূরে থাক, বিন্দুমাত্র সমর্থন, এমন কি করুণার আভাস মাত্রও কবিমানসে নেই। বরং দেখা যাচ্ছে মহাভারতের মহারথী পার্থই 'চতুর্দশপদী'তে কবির আদর্শ হয়ে উঠেছেন। 'মহাভারত' 'কিরাত-আর্জুনীয়ম্', 'গোগৃহরণে' 'সুভদ্রা' 'উর্বশী' প্রভৃতি কবিতায় পার্থকীর্তি এবং পার্থকথাই মুখ্য বিষয়ালম্বন হয়েছে। এমন কি, একাধিকবার কবি নিজেকেই পার্থরূপে কল্পনা করেছেন। 'বঙ্গদেশে কোন এক মান্যবন্ধুর প্রতি' কবিতায় কবি তাঁর প্রবাসজীবনকে পার্থের অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন,

> অচিরে ফিরিব পুনঃ হস্তিনা-নগরে ;
> কেড়ে লব রাজপদ তব আশীর্বাদে !—

'সমাপ্তে' কবিতায়ও তাঁর কবিজীবনের সমাপ্তিকে মহাপ্রস্থানের সঙ্গে তুলনা করে কবি বলেছেন, 'এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে!'

এ সব কবিতার সাক্ষ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, মধুসূদন নিজেকে মহাভারতের সংগ্রামী বীরনায়ক অর্জুনের সঙ্গেই তুলনা করেছেন। অর্জুনের মধ্যেই যে কবি তাঁর জীবনাদর্শকে প্রতিফলিত দেখেছিলেন তার বিশেষ প্রমাণ 'কিরাত-আর্জুনীয়ম্' কবিতাটি। মধুসূদনের মূলমন্ত্র ছিল 'শরীরং বা পাতয়েয়ম্ কার্যং বা সাধয়েয়ম্।' ইষ্টলাভের জন্য কঠোর তপস্যা এবং বীরচর্যাই যে মানুষের অবশ্যকৃত্য ধর্ম,—মধু-জীবন তার

প্রকৃষ্ট নিদর্শন। গহন-বনে অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব অর্জুনকে পাশুপত-অস্ত্রদানের জন্য আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু কিরাতের ছদ্মবেশে অর্জুনের বীরত্ব পরীক্ষা করে তবেই তিনি অস্ত্র-বর সমর্পণ করবেন! কবি তাই বলছেন :

> করেছ কঠোর তপঃ এ গহন বনে ;
> কিন্তু, হে কৌন্তেয়, কহি, যাচিছ যে শর,
> বীরতা-ব্যতীত, বীর, হেন অস্ত্র-ধনে
> নারিবে লভিতে কভু,—দুর্লভ এ বর !—
> কি লাজ, অর্জুন, কহ, হারিলে এ রণে ?
> মৃত্যুঞ্জয় রিপু তব, তুমি, রথি, নর !

অর্থাৎ দৈব-শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হলেও মানুষের লজ্জা নেই, এবং কার্যসাধনের জন্য শরীরপাতও বরং শ্রেয় ; কিন্তু বীরত্ব ব্যতীত কাম্যধন কিছুতেই লাভ করা যাবে না। তাই কবি অর্জুনকে বলছেন, 'বীর-বীর্যে আশা-লতা কর ফলবতী'। কবিতাটিকে এককথায় মধুসূদনের জীবনবেদ বলা যেতে পারে। কিরাত-আর্জুনীয়মের এই ব্যাখ্যা পার্থ সম্পর্কে যেমন সুপ্রযুক্ত, কবি সম্পর্কেও তেমনি সমভাবেই প্রযোজ্য। কেননা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে অর্জুনই মধুসূদন।

মধু-কাব্যে মহাভারতের প্রভাব-প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য রূপকল্পের কথাও এসে যায়। মধুসূদন যে কাব্যরসাত্মার বাঙ্‌মূর্তি নির্মাণ করেছিলেন আমরা তার আলোচনা পূর্বে করেছি। 'করুণ রসে'র মূর্তিরচনায় কবি সুন্দর নদের তীরে ক্রন্দনরত এক সুন্দরী নারীর কল্পনা করেছেন। সেই নারীর ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল নদস্রোতে পড়ে স্বর্ণপদ্ম হয়ে ভেসে যাচ্ছে। এই রূপকল্পটি মধুসূদন পেয়েছেন মহাভারতের আদিপর্ব থেকে। দ্রৌপদীবিবাহ-

পর্বাধ্যায়ে দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হবার কারণ যে কাহিনীতে বিবৃত সেখানে আছে :

সা তত্র যোষা রুদতী জলার্থিনী গঙ্গাং দেবীং ব্যবগাহ্য ব্যতিষ্ঠৎ।
তস্যাশ্রুবিন্দুঃ পতিতো জলে যস্তৎ পদ্মমাসীদথ তত্র কাঞ্চনম্॥

[মহাভারত, সিদ্ধান্তবাগীশ-সং, আদি।১৯০।১১ ॥

অর্থাৎ, সেই রমণী জলার্থিনী হয়ে গঙ্গায় নেমে রোদন করছিল, নদী-স্রোতে পতিত তার অশ্রুবিন্দুগুলি কাঞ্চনপদ্মরূপে ফুটে উঠছিল। কাশীরামেও এ কাহিনী বেদব্যাসের অনুসরণেই বিরচিত। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে তিনি 'ত্রেতাযুগে দ্বিজকন্যা আছিল দ্রৌপদী'—এই পয়ারপ্রবন্ধে সবিস্তারেই কাহিনীটি বিবৃত করেছেন। মধুসূদন মহাভারতের অশ্রুসঞ্জাত স্বর্ণপদ্মের রূপকল্পটিকে করুণ-রসের রূপক হিসাবে ব্যবহার করে তার মধ্যে নূতন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছেন। এমার্সন বলেছেন, 'কবিপ্রতিভা যেন ওস্তাদ জহুরী ; খাঁটি রত্ন দেখলেই চিনতে পারে ; তার সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্রই তাকে আহরণ করে এমন স্থানে বসিয়ে দেবে যাতে সে পূর্ণ দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে।' মধুসূদনের কবিকৃতি সম্পর্কে এই উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বেদব্যাস-কাশীরামের একটি সামান্য রূপকল্প তাঁর হাতে রসতত্ত্বের অসামান্য রূপক হয়ে উঠেছে।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র নিসর্গ-বিষয়ক সনেটগুলির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। কেননা আধুনিক বাংলা নিসর্গ-চেতনায় নব-রোমান্টিকতার সূত্রপাত সেখানেই হয়েছে। নিসর্গ-লোকে নব-নব রহস্যের সন্ধানই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান লক্ষণ। প্রাচীন মানুষের প্রকৃতিচেতনা ছিল ভীতিবিহ্বল ভক্তি ও বিস্ময়ভরা এক মিশ্র উপলব্ধি। শুধু অনন্ত রহস্যময় আকাশেই

নয়, এই পৃথিবীর জলেস্থলে, অরণ্যে-পর্বতে মানুষ অপার্থিব সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করেছে। এই নিসর্গলোক দেবতাবিহার-ভূমি বলেই ভারতীয় ও য়ুরোপীয় পুরাণকথায় প্রকীর্তিত। আদিম ভীতিবিহ্বলতাকে জয় করে যেদিন মানুষ আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হল সেদিনও এই বিশ্বচরাচরে আনন্দরূপে অমৃতরূপে অলৌকিকত্বের স্তবগানই কবিকণ্ঠে উদ্গীত হয়েছে। আধুনিক মানুষের বিশ্ববোধ মানবকেন্দ্রিক, তার দ্যুলোক-ভূলোক-ব্যাপী নিসর্গচেতনাও এই নবমানবতাবাদের দ্বারা অনুরঞ্জিত। নিসর্গ-জগৎকে অবলম্বন করে মানবীয় রসপুষ্ট নবপুরাণ রচনাই রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

মধুসূদন 'তারা' কবিতায় 'সুচারুহাসিনী' ভোরের শুকতারাকে গিরিশিরে উদিত দেখে জিজ্ঞাসা করছেন :

> নিত্য অবগাহি দেহ শিশিরের নীরে,
> দেও দেখা, হৈমবতি, থাকিতে যামিনী।
> বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
> গিরি-তলে, সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
> ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
> কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে ?—

বসন্তকালে বনভূমির পুষ্পসজ্জা দেখে তাঁর মনে হয়েছে :

> বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে
> নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
> যেমতি।

'বউ কথা কও' পাখির কাতর কণ্ঠ শুনে কবির কৌতূহল জেগেছে, প্রিয়ার উদ্দেশে তার এই করুণ মিনতির অর্থ কি! কৌতুকভরে কবি জিজ্ঞাসা করছেন, 'নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে?'—

এ সব ক্ষেত্রে মানববোধে রঞ্জিত করেই প্রকৃতির লীলারস উপলব্ধির নবরীতি পরিস্ফুট হয়েছে। মানবচেতনাকে নিসর্গজগতে প্রসারিত করে এ এক নূতন বিশ্বাত্মবোধের আস্বাদন!

নিসর্গরহস্যের এই নবভাষ্য-রচনায় সর্বত্রই যে কবিকল্পনা সার্থক হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। যে সোনার কাঠির স্পর্শে 'নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ' হয়ে আমাদের নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে তার অভাবে একাধিক কবিতা ব্যর্থ হয়েছে। সায়ংকালে সূর্য যখন আকাশে রাশি রাশি স্বর্ণ ও রত্ন ছড়িয়ে যাচ্ছেন তখন কবি মেঘকে অলংকার-বিলাসী অঙ্গনার সঙ্গে তুলনা করে যে রূপসৃষ্টি করেছেন তা কাল্পনিকতা বা ফ্যান্সির স্তর অতিক্রম করতে পারে নি। 'ছায়াপথ'কেও নন্দন-সদনে মহেন্দ্রের সঙ্গে ইন্দ্রাণীর মিলনযাত্রার পথ রূপে কল্পনা করার মধ্যে যতই বৈশিষ্ট্য থাক, ওর মধ্যেও কবিকল্পনার অলৌকিক দীপ্তি সঞ্চারিত হয় নি। 'সায়ংকালের তারা'ও কল্পনাবিলাসের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হয়েছে বলা যাবে না। 'সূর্য' এবং 'রাশিচক্র' সনেট দুটির কবিকৃতিও গতানুগতিকতার স্তরেই পড়ে রয়েছে। কিন্তু গ্রহ-পতি 'শনি'কে কবি নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তার 'ছয় চন্দ্র রত্নরূপে সুবর্ণ টোপরে' আর 'সুকটিদেশে হৈম সারসন যেন আলোক-সাগরে!' শনির রাজমর্যাদা-বর্ণনায় কবি বলছেন :

> বাখানে নক্ষত্র-দল ও রাজ-মুরতি
> সংগীতে, হেমাঙ্গ-বীণা বাজায়ে অম্বরে!

শনির এই মহিমাব্যাখ্যানে কবিকল্পনায় অভিনবত্বের স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু ওর ষট্‌ক-বন্ধটিতে আধুনিক মানুষের মনোভাবটি আরো উজ্জ্বল। কবি বিতর্কচ্ছলে বলছেন, এমন রাজা কখনো প্রজাশূন্য হতেই পারে না! তাই তাঁর জিজ্ঞাসা, 'কোন্ জীব তব রাজ্যে আনন্দে নিবাসে?'—সেখানেও কি জীবন-কাননে পাপ বা পাপজাত মৃত্যু

কীটরূপে কুসুমকে বিনষ্ট করে? বলাই বাহুল্য, শনিগ্রহেও মর্ত্য-মানবের অনুরূপ জীবনলীলা সম্পর্কে এ প্রশ্ন জ্যোতিষী বা জ্যোতির্বিদের নয়, আধুনিক মানুষের কৌতূহলই এখানে কবিকণ্ঠে উচ্চারিত।

তবে নিসর্গ-রচনায় মধুসূদনের কবিকল্পনা ভূলোকের বিষয়ালম্বনেই অধিকতর উজ্জ্বল বলে মনে হয়। এবং সেক্ষেত্রেও নৈশ-প্রকৃতির সৌন্দর্যই তাঁকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। নদী বা সরোবরের ঊর্মিমালায় জ্যোৎস্নার নৃত্যসৌন্দর্য তাঁকে বার বার মুগ্ধ করেছে। 'উদ্যানে পুষ্করিণী'তে তিনি বলেছেন :

> নিশায় রাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
> লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে!

অসংখ্য ঢেউ, কিন্তু প্রত্যেকের বুকে একই চাঁদের নৃত্যলীলা, তাই রাসের রূপকটি এখানে অপূর্ব সুন্দর! 'নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষতলে শিব-মন্দির'-এও তাঁর দৃষ্টি নদীজলে কৌমুদী-নৃত্যের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে :

> কৌমুদী, দেখ, রজত-চরণে
> বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর, চঞ্চলে
> নাচিছে।

এখানে শুধু নৃত্যলীলাই নয়, নূপুর-নিক্কণও কবির শ্রুতিগোচর হয়েছে। স্বভাবতই মধুসূদনের এই রূপকল্পগুলি রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতার 'আলোর নাচ নাচায় চাঁদ', অথবা 'আলোক-ছায়া শিব-শিবানী সাগরজলে দোলে'-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। নূপুর-নিক্কণও অন্যত্র হয়েছে মাণিক্য-কিঙ্কিণী।

'নিশাকালে নদী-তীরে বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দিরে' আকাশ-পৃথিবীব্যাপী শিবপূজার উৎসব-চিত্রটি মহাকবিরই কল্পনাপ্রসূত।

কবি দেখছেন, রাজসূয় যজ্ঞে যোগদানকারী রতন-মুকুট-শিরে রাজন্যবৃন্দের মত অগণ্য জোনাকীব্রজ রজনীযোগে বৃষভ-বাহনকে পূজা করার জন্যে তরুতলে ছুটে এসেছে। মলয়বাহিত অদূর-কাননের পুষ্পসৌরভই হয়েছে পূজার ধূপ। নদীজলে ঊর্মিমালার নূপুর পরে কৌমুদী নৃত্যপরায়ণা। আচার্য-রূপে তরুপতি বীজমন্ত্র উচ্চারণ করছে। আকাশে তারাগণসহ চন্দ্র শংকরের আরাধনা করে নীরবে প্রণতি নিবেদন করছেন। কল্লোলিনীও মহাব্রতে ব্রতী হয়ে তার বর-কলেবরকে দিব্যসাজে সজ্জিত করেছে।

'সাগরে তরি' কবিতায়ও রাত্রির অন্ধকার পটভূমিতে বিভিন্ন বর্ণের দীপাবলী-সজ্জিত অর্ণবপোতের বর্ণনাটি সুন্দর। কবির মনে হচ্ছে যেন এক মহাকায়া নিশাচরী মায়া-বলে বিহঙ্গিনী-রূপ ধরে 'রঙ্গে সুধবল পাখা' আকাশে মেলে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। সমুদ্রের নীলমণিময় পথ আলোকিত করে তার গতিভঙ্গিটিও আভিজাত্যমণ্ডিত :

> চলিছে গুমরে বামা পথ আলো করি,
> শিরোমণি-তেজে যথা ফণিনীর গতি।

এ সব ক্ষেত্রে নিসর্গসৌন্দর্য কবিসৃষ্টিতে নবতর সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু রোমান্টিক কল্পনা তুচ্ছ ও নগণ্যবস্তুতেও অসামান্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে। কীট-দষ্ট কুসুমকে দেখে কবি যখন বলেন, 'কানন-চন্দ্রিমা তুমি যেন রাহু-গ্রাসে', অথবা রাত্রির অন্ধকারে জোনাকীব্রজকে যখন তিনি রতন-মুকুট-শিরে রাজন্যবর্গের সঙ্গে তুলনা করেন, তখন তাঁর রোমান্টিক কবিমানসেরই পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, কবি সামান্য একটি সংকেতের মধ্যেই চিরন্তন জীবনসত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত করে তোলেন। এই মর্ত্য-

জীবনের অনিত্যতাকে ভাষা দিতে গিয়ে মধুসূদন দূর্বাদলে নীর-বিন্দুর রূপকই ব্যবহার করে বলেছেন, 'কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যঃপাতি ?' পৃথিবীর এই অনিত্য জীবনের বৈসাদৃশ্যে 'নন্দন কাননে'র আনন্দ ও সৌন্দর্যের নিত্যতার পরিকল্পনা! একটি নগণ্য বস্তুর সংকেতেই সেই নিত্যতার দ্যোতনা সৃষ্টি করে কবি বলেছেন, 'যথা শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে সদা সদ্যঃ'। এখানে 'ফুল্ল ফুলদলে সদা সদ্যঃ' শিশিরের বিন্দুই নন্দন কাননের চিরস্থায়ী অমৃতসিন্ধুর আভাস বহন করে এনেছে।

রোমান্টিক কবিকল্পনা দূরযানী; অনাদি অতীত এবং অনাগত ভবিষ্যতে সে সুদূরাভিসারী। 'পৃথিবী' কবিতায় মধুসূদনের অতীতায়ন একেবারে বসুন্ধরার সৃষ্টিলগ্নে উপনীত হয়েছে। বিশ্ব-মাঝে যেদিন সৃষ্টিকর্তা বসুন্ধরাকে সৃষ্টি করলেন সেদিন,

> অতি হৃষ্ট মনে
> চারি দিকে তারাচয় সুমধুর রবে
> (বাজায়ে সুবর্ণ বীণা) গাইল গগনে,
> কুল-বালা-দল যথা বিবাহ-উৎসবে
> হুলাহুলি দেয় মিলি বধূ-দরশনে।

শুধু তাই নয়, স্বর্ণমেঘাসনে সমাসীন হয়ে আদি-প্রভা শূন্য-রূপ সুনীল অম্বরে নব-রমণীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি দেখবার জন্যে ছুটে এলেন। বসন্ত শ্যাম-বাসে তাঁর বর-কলেবর আবৃত করে দিলে; দেবীর আদেশে তিনি 'কটিতে মেখলা রূপে পরিলা সাগরে।' সনেটের সংকীর্ণ সীমায় পৃথিবীর জন্মকথার এমন কাব্যরূপায়ণ মধুসূদনের মত মহাকবির পক্ষেই সম্ভব!

চতুর্দশপদীর নিসর্গচেতনায় 'বটবৃক্ষ' সনেটের উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কবি বটবৃক্ষকে ভারত-সংসারে

তরু-রূপে বিধির করুণা বলেই কল্পনা করেছেন। জীবকুল-হিতৈষিণী সুন্দরী ছায়া তাঁরই দুহিতা। তপন-তাপদগ্ধ-জীবনে বটবৃক্ষ ভূচর-খেচর সবারই সুশীতল আশ্রয় :

> শত পত্রময় মঞ্চে, তোমার সদনে,
> খেচর—অতিথি-ব্রজ, বিরাজে সতত,
> পদ্মরাগ ফুলপুঞ্জে ভুঞ্জি হৃষ্ট-মনে,—

তিনি তাঁর আশ্রিত জনকে সর্বদা মৃদুভাষে মিষ্টালাপে পরিতৃপ্ত করে তাদের জীবনের জ্বালা দূর করেন। কবি বলছেন, 'দেব নহ, কিন্তু গুণে দেবতার মত!' মধুসূদনের হাতে নিসর্গলোক এইভাবেই মানবীয় রসে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চতুর্দশপদীতে প্রেমের কবিতার সংখ্যা বেশি নয়, কিন্তু তাদের কাব্যোৎকর্ষের কথা চিন্তা করলে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় বলতে হয়, 'Alas, too few!' আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের ঐতিহাসিক বিচারেও তারা বিশেষ সম্মান দাবি করতে পারে। আধুনিক গীতিকাব্যে যাকে বলা হয়েছে কবির আপন মনের কথা, শুধু তাই নয়, এই প্রেমের কবিতাগুলি যেন মধুসূদনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের নিভৃতচিন্তার স্বগতভাষণ ; যেন নিজের মর্মলোক নির্বারিত করে সহৃদয়ের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপন! মেঘদূত ১, পরিচয় ১-২, নিশা ও শততম কবিতাটিই [প্রফুল্ল কমল যথা] এই শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত। অবশ্য শৃঙ্গার রসের তিনটি উদাহরণ, 'বউ কথা কও' এবং 'পুরুরবা'কেও প্রেমকাব্যের বিষয়ীভূত করা যেতে পারে, কিন্তু এগুলি হয় প্রেমতত্ত্বের বাণীরূপ, নয় তাদের আলম্বন-বিভাব কাব্যসংসারের নায়ক-নায়িকা। আমরা যাকে প্রেমিক কবির মর্মলোক নির্বারিত-করা নিভৃত আলাপন বলেছি তার নিদর্শন আছে পূর্বোক্ত পাঁচটি সনেটের মধ্যেই।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সংখ্যক 'পরিচয়' শীর্ষক সনেট-যুগলে কবি আত্মপরিচয় দিয়ে বলছেন, 'জননী ভারতী ; তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !' স্বভাবতই পাঠকমনে কৌতূহল জাগবে, কাকে সম্বোধন ক'রে কবি নিজের এই পরিচয় দিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ফ্রান্সে কবি যখন সপরিবারে বিপন্ন তখন এক ফরাসি মহিলার সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। বিদ্যাসাগর মশাইকে মধুসূদন লিখছেন, 'আপনি শুনে আনন্দিত হবেন যে কারাবাসের অপমান থেকে একটি ফরাসি ভদ্রমহিলা আমাকে রক্ষা করেছেন ; এই তরুণী সুন্দরী ও করুণাময়ী নারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ট্রেনের কামরায়। সেই থেকে সর্বদা তিনি আমাদের খোঁজখবর নিচ্ছেন, দুর্দিনে আমাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং অর্থ দিয়ে আমাদের সাহায্য করছেন।' সম্ভবত এই সনেটযুগল সেই করুণাময়ী সুন্দরী তরুণীকেই লক্ষ্য করে লেখা। প্রথম সনেটে কবিমাতৃভূমির পরিচয়ই মুখ্য ; অর্থাৎ যে দেশের আকাশে-বাতাসে প্রেম, সে দেশের কবি হয়ে আমি যে প্রেমিক হব এ তো স্বতঃসিদ্ধ ! দ্বিতীয় সনেট শুরু হয়েছে এই সিদ্ধান্ত দিয়ে যে, কবিরা প্রেমিক,—'কে না জানে কবিকুল প্রেম-দাস ভবে,'— অতএব 'ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে এ বৃথা সংশয় কেন ?' তাছাড়া

কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি,

কবিতাটির অষ্টক-বন্ধ এই ভাবেই কবির আত্ম-রাগে অনুরঞ্জিত। কিন্তু ষট্‌ক-বন্ধটি উপমার গতানুগতিকতায় বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে

পড়েছে। প্রিয়ার তনু-লাবণ্যকে 'কামের নিকুঞ্জে'র সঙ্গে তুলনা করে কবি যে সাঙ্গ-রূপকমালার সৃষ্টি করেছেন সেগুলি সাহিত্য-ক্ষেত্র থেকে সমাহৃত বহুজন-ব্যবহৃত উদাহরণ মাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে ; রূপ বা রূপকল্পসৃষ্টির দিক দিয়ে গীতিকাব্যোচিত অপূর্বত্ব লাভ করতে পারে নি। 'মেঘদূত' সনেট-যুগলের প্রথম সনেটে প্রবাস-বিপ্রলম্ভের সুরই অনুরণিত। প্রবাসে বসে কবি যাঁর রূপ স্মরণ করে অধীর হয়েছেন তাঁর কাছেই দূত করে পাঠাচ্ছেন মেঘরাজকে। তাঁর প্রেরিতব্য বার্তা হল, 'কয়ো তারে, এ বিরহে মরি !' কবি যখন এই মেঘদূতের স্বপ্নলোকে বিহার করছেন তখন কবিজায়া তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন, কাজেই কবিতাটি নিতান্তই মানস-বিরহের কল্পনাকেলি মাত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যে ভাবের উদয়ে পরিচিত গৃহকে প্রবাস বোধ হয় এবং অপরিচিত বিশ্বের জন্য মন কেমন করিতে থাকে', সেই রোমান্টিক মনোভঙ্গি থেকেই এই কবিতার উদ্ভব। মেঘদূতে বিরহ-চিন্তা যে গৌণ তার প্রমাণ, দ্বিতীয় সনেটে প্রেম একেবারেই অনুপস্থিত।

'নিশা' এবং 'প্রফুল্ল কমল যথা'—এই দুটি সনেটই মধুসূদনের প্রেমকাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। 'নিশা'র সমগ্র অষ্টক-বন্ধে নৈশ প্রকৃতি হয়েছে কবিচিত্তের প্রতিবিম্ব :

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি !—সুহাস মুখে সরসীর জলে,
চন্দ্রিমা করিছে কেলি প্রেমানন্দ মনে।
কত যে কি কহিতেছে মধুর স্বননে
পবন—বনের কবি, ফুল্ল ফুল-দলে,
বুঝিতে কি পার, প্রিয়ে ? নারিবে কেমনে,
প্রেম-ফুলেশ্বরী তুমি প্রমদা-মণ্ডলে ?

এখানে সরসীবক্ষে চন্দ্রমার প্রেমকেলি শেলির 'And the moonbeams kiss the sea'—পংক্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদন অবশ্য রূপকল্পটিকে সম্পূর্ণতা দিয়েছেন, এবং অষ্টকের এই অলংকার-প্রসাধন ষট্‌ক-বন্ধে পৌঁছে কবির মূল বক্তব্যকেই উজ্জ্বল করে তুলেছে :

> এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—
> চন্দ্রিমার রূপে এতে তোমার মূরতি !

কিন্তু সরসীর রূপক রচনা করে নিসর্গলোক ও মানসলোককে একীভূত করেও কবির বক্তব্য শেষ হয় নি। আমরা পূর্বেই বলেছি, নৈশপ্রকৃতির সৌন্দর্য মধুসূদনকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করে। রাত্রির শ্যাম-রূপের মধ্যে কবি যেন নিজের শ্যামল রূপের মহিমা দেখতে পান। তাই তিনি বলছেন :

> কাল বলি অবহেলা, প্রেয়সি, যে করে
> নিশায়, আমার মতে সে বড় দুর্মতি।
> হেন সুবাসিত শ্বাস, হাস স্নিগ্ধ করে
> যার, সে কি কভু মন্দ, ও লো রসবতি ?

এইখানে পৌঁছেই মধুসূদনের প্রেমচেতনার অন্তরঙ্গ রূপায়ণ সম্পূর্ণ হল। কিন্তু 'এহ বাহ্য!' কবির আজীবন-সঙ্গিনী, তাঁর গৃহলক্ষ্মী অঁারিয়েতের উদ্দেশে সমর্পিত সনেটেই তাঁর প্রেমানুভূতির মহত্তম প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। কবিকল্পনার পবিত্র-সুন্দর জ্যোতিঃ-বিচ্ছুরণেই কবিতাটির আরম্ভ :

> প্রফুল্ল কমল যথা সুনির্মল জলে
> আদিত্যের জ্যোতিঃ দিয়া আঁকে স্ব-মূরতি,
> প্রেমের সুবর্ণ রঙে, সুনেত্রা যুবতি,
> চিত্রেছ যে ছবি তুমি এ হৃদয়-স্থলে,

মোছে তারে হেন কার আছে লো শকতি
যত দিন ভ্রমি আমি এ ভব-মণ্ডলে ?—

'প্রফুল্ল কমল' 'সুনির্মল জল' ও 'আদিত্যের জ্যোতিঃ'—এই তিনের সমন্বয়ে কবি প্রেমের সুন্দর নির্মল ও জ্যোতির্ময় যে রূপটি ধ্যান করছেন তার তুলনা রোমান্টিক প্রেমকাব্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু কবিকল্পনা তাতেও তৃপ্ত হয়নি, কবি তার মধ্যে বিশুদ্ধি সঞ্চারিত করেছেন ভারতীয় ঐতিহ্যে তাকে পরিস্নাত করে :

সাগর-সঙ্গমে গঙ্গা করেন যেমতি
চির-বাস, পরিমল কমলের দলে,
সেই রূপে থাক তুমি।

সাগর-সংগমে গঙ্গার চির-বসতি শুধু চিরস্থায়িত্বের কামনাকেই ভাষা দেয়নি, এর ব্যঞ্জনা সর্বাত্মক। কবিতাটির অন্তিম ত্রিক-বন্ধে কবির দাম্পত্যপ্রেম-চেতনার মর্মবাণীই যেন উচ্চারিত হয়েছে :

প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোক আঁধারে !
অধিষ্ঠান নিত্য তব স্মৃতি-সৃষ্ট মঠে,—
সতত সঙ্গিনী মোর সংসার-মাঝারে।

এই কবিতায় কবি তাঁর নিত্যপ্রেরণাময়ী জীবনসঙ্গিনীকে কাব্য-লোকে অমর করে রেখে গেলেন। কাব্যসংসারে পত্নীবিয়োগে শোকার্ত কবিহৃদয় থেকে উৎসারিত বিরহী-প্রেমের কবিতার অভাব নেই। কিন্তু যে-প্রেম প্রতিমুহূর্তে উপচীয়মান প্রেরণা রূপে জীবনকে মধুর সুন্দর ও নির্মল করে সেই সারাজীবনব্যাপী দাম্পত্যপ্রেমের এমন পবিত্র-সুন্দর কাব্যরূপ যে-কোনো দেশের সাহিত্যেরই পরম গৌরব !

গীতিকাব্যের কবি হিসাবে মধুসূদন তাঁর উত্তরসূরিবৃন্দের উপর কি ভাবে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিলেন চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কাব্যবিচার প্রসঙ্গে সে আলোচনাও অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকেই আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যলোকের 'ভোরের পাখি' বলেছেন। 'সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে-সুর তাহার নিজের।··· আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ হয় কবির নিজের কথা।' রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্য ষাট বছরের অধিক কাল ধরে বাংলা সাহিত্যে নির্বিচার স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। কিন্তু এই রবীন্দ্র-প্রত্যয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে পরীক্ষারও প্রয়োজন আছে।

মধুসূদনের গীতিকাব্যসাহিত্যের মধ্যে পড়ে তাঁর 'ব্রজাঙ্গনা', নীতিগর্ভ কাব্যমালা, 'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গভূমির প্রতি' এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী।' ছন্দ, মিল ও বিচিত্র ধরনের স্তবক-নির্মিতির দিক দিয়ে 'ব্রজাঙ্গনা'র মূল্য নগণ্য নয়! নীতিকবিতাগুলি কবির খেলাচ্ছলে লেখা। খেলাচ্ছলে বলছি এই জন্যে যে, ওর মধ্যে কাব্য-হিসাবে যেটি সর্বাধিক উত্তীর্ণ সেই 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা' কবিতাটি সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসি কবি জাঁ দে লা ফঁতেনের 'লে শেন্ এ লে রোজো' কবিতারই মর্মানুবাদ। কিন্তু খেলাচ্ছলে লেখা হলেও ছন্দের দিক দিয়ে এদের মূল্য অপরিসীম, কেননা এই কবিতাগুলিতে মধুসূদন তানপ্রধান ছন্দের মুক্তবন্ধ বা মুক্তক-রূপসৃষ্টির যে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের হাতে তাই পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। কিন্তু 'কবির নিজের কথা' বাংলা সাহিত্যে প্রথম

স্পষ্টোচ্চারিত হল 'আত্মবিলাপে' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায়। এদিক দিয়ে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'ও বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন, 'তৎসময়ে [অর্থাৎ বিহারীলাল যখন তাঁর নিজের সুরে গান ধরেছিলেন] অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে—কিন্তু তাহা বিরল—এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংহত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।'[৩০] চতুর্দশপদীতে কবির আত্মকথা 'কঠিন ও সংহত' হয়ে আসে, রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু তাতে 'বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না', —একথা স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রহণ করা যায় না, তাহলে আধুনিক গীতিকাব্যের জনয়িতা পেত্রার্কাকেই অস্বীকার করতে হবে, এবং রবীন্দ্রনাথেরও প্রায় তিনশত কবিতা, বিশেষ করে 'কড়ি ও কোমলে'র অতুলনীয় চতুর্দশপদীগুলির প্রতি চরম অবিচার করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মধুসূদনের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পেয়ে থাকবে—কিন্তু তা বিরল! বলাই বাহুল্য, বিহারীলাল 'বাঁশির সুরে মাঠের ও বনের গান' যে-ভাবে বাজিয়েছেন তার সঙ্গে মধুসূদনের সপ্তস্বরা স্বর্ণতন্ত্রী বীণাধ্বনির তুলনা করলেই রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের সারবত্তা বুঝতে পারা যাবে। তাছাড়া মধুসূদনের কবিখ্যাতি মুখ্যত তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দ এবং মেঘনাদবধকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। কিন্তু চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন নিতান্ত বিরল নয়। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর একশ দুটি কবিতার মধ্যে বেয়াল্লিশটি প্রত্যক্ষ ভাবে কবির আত্মকথা। বাংলার সারস্বত-সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসরণ করে আনন্দে যথাবিধি আসর বন্দনা করে কবি তাঁর কাব্যের 'উপক্রম' করেছেন। কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে 'সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি'—এই

আত্মঘোষণায়। 'বঙ্গভাষা' কবির শুধু আত্মকথাই নয়, মধুসূদনের কবিজীবনের মর্মকথা ওরই মধ্যে অনুস্যূত। বঙ্গকুললক্ষ্মীর আজ্ঞা পালন করে কবি কি করে মণিজালে পূর্ণ মাতৃভাষা-রূপ খনির সন্ধান পেয়ে ধন্য হয়েছিলেন কবিতাটি তারি অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ।

চতুর্দশপদীতে এমনি করে কবির 'আমি'ই নানা ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'কমলে কামিনী আমি হেরিনু স্বপনে কালিদহে।' 'চল যাই, জয়দেব, গোকুল ভবনে তব সঙ্গে,' 'অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা, বৈদেহি!' 'তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি।' 'পূর্ব কথা কেন কয়ে, স্মৃতি, আনিছ এ বারিধারা আজি এ নয়নে?' 'লও দাসে, হে ভারতি, নন্দন-কাননে,' 'ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে!' 'কয়ো তারে এ বিরহে মরি!' 'শিখাইব শিখেছি যা ঠেকি এ কু-দায়ে,' 'তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে!' 'ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে এ বৃথা সংশয় কেন?' 'এ হৃদয়, দেখ, এবে ওই সরোবরে,—' 'এই ভাবি, কৃপাময়ি, ভাবি গো তোমারে!' 'সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।' 'হায়, গতিহীন আমি দৈব বিড়ম্বনে,' 'হায় রে, কব তা কারে, কব তা কেমনে!' 'লিখিনু কি নাম মোর বিফল যতনে বালিতে,' 'দূরে কি নিকটে, যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে;' 'বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে, হৃদয়-মণ্ডপ হায় অন্ধকার করি ও প্রতিমা;' এই ভাবে কবির 'আমি'ই চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মানবরসের মুখ্য আলম্বন। আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যে কবির আত্মনিবেদন, অর্থাৎ অন্তরঙ্গ বিশ্রম্ভালাপের সূত্রপাত চতুর্দশপদীতেই হয়েছে। কবি-ওয়ালার দল, ঈশ্বর গুপ্ত আর রঙ্গলালে কবিসত্তা যেন জীবনরঙ্গ-মঞ্চের নেপথ্যবিধান শেষ করে চতুর্দশপদীতে একেবারে পাদ-প্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ালো। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে

পারা গেল, কবিকুঞ্জে যে লীলাভিনয় হচ্ছে স্বয়ং কবিই তার প্রধান নায়ক।

উত্তমপুরুষ এক-বচনের স্বগত-ভাষী মধুসূদন-প্রবর্তিত এই নব্যরীতিই বিহারীলালে ব্যাপকতা পেল। অন্যান্য দিক দিয়েও বিহারীলালের উপর মধুসূদনের প্রভাব উপেক্ষণীয় নয়। মধুসূদনের গীতিকাব্যসমূহে যে বিচিত্র ছন্দ ও স্তবকবন্ধ গ্রথিত হয়েছে বিহারীলালের উপর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। বিহারীলালের প্রথম দুখানি কাব্য 'বন্ধুবিয়োগ' (রচনাকাল ১২৬৬ সাল) ও 'প্রেমপ্রবাহিণী' (রচনাকাল ১২৬৭) প্রচলিত পয়ার ছন্দে রচিত। 'নিসর্গ-সন্দর্শনে'ই [রচনাকাল ১২৭০-১২৭৪] কবি প্রথম স্তবকবন্ধে কাব্য-রচনা শুরু করলেন। এই কাব্যের প্রতিটি স্তবক পদান্তর-পর্যায়ে বিন্যস্ত মিলের পয়ার-চতুষ্ক দিয়ে গড়া। 'বঙ্গ সুন্দরী' ['অবোধ-বন্ধু'তে ১২৭০-৭৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত] কাব্যের 'উপহার' অংশে যে স্তবকবন্ধ রচিত হয়েছে তার প্রথম দ্বিতীয় ও পঞ্চম পংক্তি ৪+৬=১০ অক্ষরের, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ পংক্তি ৮ অক্ষরের পয়ারজাতীয় ছন্দেরই সংমিশ্রণ। 'বঙ্গসুন্দরী'র অবশিষ্ট অংশ ৬+৬+৬+৫ অক্ষরের দুই চরণের স্তবকে, লিপিরূপে চার পংক্তিতে, আদ্যোপান্ত সজ্জিত। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছেন, 'বিহারী চক্রবর্তী মহাশয় তাঁহার বঙ্গ-সুন্দরী কাব্যে যে-ছন্দের প্রবর্তন করিয়াছিলেন তাহা তিনমাত্রা-মূলক, যেমন—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুর-নদীর জলে
অপরূপ এক কুমারী রতন
খেলা করে নীল নলিনীদলে।

...তাহার এই বেগবান গতির নৃত্য যেন ঘনঘন ঝংকারে নূপুর বাজাইতে থাকে। একদা এই ছন্দটাই আমি বেশি করিয়া ব্যবহার করিতাম।'[৩১] রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি, অর্থাৎ এই 'তিনমাত্রামূলক' ছন্দ বিহারীলালই প্রবর্তন করেছিলেন, একথা ঐতিহাসিক বিচারে সমর্থন যাবে না। 'বঙ্গসুন্দরী' রচনার অর্ধযুগ পূর্বে ১২৬৮ সালের আষাঢ় মাসে মধুসূদনের বিচিত্র ছন্দ ও স্তবকবন্ধে রচিত 'ব্রজাঙ্গনা' প্রকাশিত হয়। রাজনারায়ণ বসুকে এক পত্রে [১৮৬০ খ্রীঃ, ১৪ই জুলাই] মধুসূদন লিখেছিলেন, 'ভগবান বিরূপ না হলে অমিত্রচ্ছন্দে তিনটি ছোট কবিতা এবং পরে মিত্রচ্ছন্দে কিছু লিখবার ইচ্ছা রইল। ভেবোনা তোমাদের উপর পয়ার ও ত্রিপদীর বোঝা চাপাব। ইতালীয় 'Ottava Rima'র মত স্তবক-গ্রন্থনের বাসনাই আমার মনে আছে...।[৩২] কবির এই সংকল্পই তাঁর মিত্রাক্ষর-কাব্য-রচনায় ভাষা পেয়েছে। 'ব্রজাঙ্গনা'তে বিচিত্র স্তবকবন্ধ-রচনার যে রীতি মধুসূদন প্রবর্তন করলেন, তাই বিহারীলালকে অনুপ্রাণিত করেছিল। 'ব্রজাঙ্গনা'র 'ময়ূরী' ও 'গোধূলি'র স্তবকই ঈষৎ-পরিবর্তিত আকারে 'বঙ্গসুন্দরী'র উপহারে অনুসৃত হয়েছে। তাছাড়া 'তিনমাত্রামূলক' ছন্দও ব্রজাঙ্গনার কবির হাতেই 'বংশী-ধ্বনি' [৬+৫] এবং 'কুসুম' [৬+৬+৫] কবিতায় বাংলা গীতি-কাব্যসংগীতের ভাবী সম্ভাবনার আভাস প্রথম বহন করে এনেছিল। 'কুসুমে'র—

কেনে এত ফুল তুলিলি, সজনি—
ভরিয়া ডালা?
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা?—

এই ছন্দের সঙ্গে বিহারীলালের 'একদিন দেব তরুণ তপন'-এর সুরসাদৃশ্য আবিষ্কার করা শক্ত নয়।

বিহারীলালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'সারদামঙ্গল' [রচনারম্ভ ১২৭৭ বঙ্গাব্দ] এবং 'সাধের আসন' [১২৯৫-৯৬ বঙ্গাব্দ] কাব্যদ্বয়ে কবি যে স্তবক ব্যবহার করেছেন তাও মধুসূদনের কাব্য থেকেই গৃহীত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সারদামঙ্গলের ছন্দ নূতন নহে, তাহা প্রচলিত ত্রিপদী, কিন্তু কবি তাহা সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।…'সারদামঙ্গলের' গীতসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।'[৩৩] প্রকৃত প্রস্তাবে মধুসূদনই 'প্রচলিত ত্রিপদী'কে 'সংগীতে সৌন্দর্যে সিঞ্চিত' করে তুলেছিলেন, কাজেই এ প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য। 'সারদামঙ্গল' সুস্পষ্ট স্তবকবন্ধে রচিত, 'প্রচলিত ত্রিপদী' হলেও তার চিত্ররূপটি মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি' এবং 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'র মধ্যেই বিহারীলাল আবিষ্কার করেছিলেন। উদাহরণে বক্তব্য স্পষ্ট হবে। মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি'—

> রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
> সাধিতে মনের সাধ,
> ঘটে যদি পরমাদ,
> মধুহীন করো না গো তব মনঃ-কোকনদে।
> প্রবাসে, দৈবের বশে,
> জীব-তারা যদি খসে
> এ দেহ-আকাশ হতে,—নাহি খেদ তাহে।
> জন্মিলে মরিতে হবে,
> অমর কে কোথা কবে,
> চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে ?

বিহারীলালের সারদা-মঙ্গলের তৃতীয় সর্গের প্রারম্ভে যে সারদার প্রতি গীতি-আবেদন কবি রচনা করেছেন এবার তার দিকে লক্ষ্য করা যাক্ :—

বিরাজ সারদে কেন এ ম্লান কমল-বনে !
আজো কিরে অভাগিনী ভালবাস মনে মনে !
মলিন নলিন বেশ,
মলিন চিকন কেশ,
মলিন মধুর মূর্তি, হাসি নাই চন্দ্রাননে !

* * *

জীবন-কিরণ-রেখা
অস্তাচলে দিল দেখা,
এ হৃদি-কমল দেবী ফুটিবে না আর ।
যাও বীণা লয়ে করে,
ব্রহ্মার মানস-সরে,
রাজহংস কেলি করে স্বুবর্ণ নলিনী-সনে ।

ভাবানুষঙ্গের দিক থেকে দুটি কবিতা যে সমানধর্মা কবিমানস থেকেই উৎসারিত একথা সহৃদয়-হৃদয়-সংবেদ্য। মধুসূদনের 'এ দেহ-আকাশ' আর বিহারীলালের 'এ হৃদি-কমল' একই বাগ্‌ভঙ্গির যুগ্মরূপ। মধুসূদন তাঁর 'সমাপ্তে' কবিতায় আক্ষেপের সুরে বলেছেন, সংসারের ধর্ম-কর্ম ভুলে যার গন্ধামোদে তাঁর মন আকৃষ্ট হয়েছে 'শুখাইল দুরদৃষ্ট যে ফুল্ল কমলে' ; বিহারীলালেও সেই একই আক্ষেপ, 'এ হৃদি-কমল দেবী ফুটিবে না আর !' মধুসূদন তাঁর 'বঙ্গভূমি' কবিতায় তাঁর প্রথম জীবনের বিফল তপস্যার কথা স্মরণ করে বলেছিলেন, 'কেলিনু শৈবলে ভুলি কমল-কানন !' মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গেও কবিগুরু বাল্মীকির কাছে 'কবিতা রসের সরে রাজহংস-কুলে' মিলিত হয়ে কাব্যকেলিশিক্ষা কবি কামনা করেছেন ! বিহারীলালও সারদাকে তাঁর ম্লান কমল-বন পরিত্যাগ করে ব্রহ্মার মানস-সরে যেতে বলছেন, সেখানে 'রাজহংস কেলি করে স্বুবর্ণ নলিনী-

সনে।' 'শ্যামা জন্মদা' বঙ্গভূমির কাছে মধুসূদনের অন্তিম মিনতি ছিল :

তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে !—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে,
মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে !

বিহারীলালও তাঁর সারদামঙ্গলের শেষ সর্গের অন্তিম স্তবকে বলছেন :

পুন কেন অশ্রুজল,
বহ তুমি অবিরল !
চরণ-কমল আহা ধুয়াও দেবীর !
মানস-সরসী-কোলে
সোনার নলিনী দোলে,
আনিয়ে পরাও গলে সমীর সুধীর !

বলাই বাহুল্য, মধুসূদন-কল্পিত মানস-সরোবরের 'মধুময় তামরস'ই বিহারীলালের 'মানস-সরসী-কোলে সোনার নলিনী' হয়েছে। তাছাড়া 'সারদামঙ্গল' কাব্যে আদ্যন্ত যে স্তবকবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে মধুসূদনের 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'য় তার প্রাক্‌রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে :

মলয় বহিলে হায়,
নতশিরা তুমি তায়,
মধুকর ভরে তুমি পড় লো ঢলিয়া ;
হিমাদ্রিসদৃশ আমি
বন-বৃক্ষ-কুল-স্বামী,
মেঘলোকে উঠে শির আকাশ ভেদিয়া !

এই ৮+৮+১৪ অক্ষরের চরণ অক্ষর-সংখ্যার দিক দিয়ে ঠিক প্রচলিত ত্রিপদী না হলেও ভারতচন্দ্রে চরণের এই দৈর্ঘ্য দু-এক স্থানে পরিদৃষ্ট হয়েছে ; কিন্তু এই মাপের চরণকে নিয়ে স্তবকনির্মাণের দিক দিয়ে মধুসূদন যে আলেখ্য-সৌন্দর্য রচনা করেছেন বিহারীলালের 'সারদামঙ্গলে' তারই সার্থক অনুসৃতি গীতিকাব্যের নবসংগীতে উৎসারিত হয়েছে।

বিহারীলালের সারদাসূক্ত—'ব্রহ্মার মানস-সরে ফুটে ঢল্‌ঢল্‌ করে'—এই শ্লোকে কবি যে অপরূপ রূপকল্প ব্যবহার করেছেন তার উৎস-কথা আমরা মধুসূদনের 'করুণ রস' সনেটের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। এই শ্লোকরচনায় কবি তিনটি রূপকল্প ব্যবহার করেছেন, 'ব্রহ্মার মানস-সর', 'নীল জলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী' এবং 'ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী'। এই তিনটি রূপকল্প সমাহৃত হয়েছে মধুসূদনের 'বাল্মীকি,' 'করুণ রস' ও 'নন্দন-কানন'—এই তিনটি সনেট থেকে। 'বাল্মীকি'র অষ্টক-বন্ধে দস্যু-রত্নাকর-কাহিনী শেষ করে কবি 'সে দুরন্ত যুবজন' কি করে ভারতের কবি-কুল-পতি হল সেই কথা ষট্‌ক-বন্ধে বলেছেন। স্বপ্নের দৃশ্যপট পরিবর্তিত হলে কবি সুধাময় গীত-ধ্বনি শুনতে পেলেন ; তাঁর মনে হল 'আপনি ভারতী, মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ, স্বর্ণবীণা করে, আরম্ভিলা গীত যেন।' মধুসূদনের 'মোহিতে ব্রহ্মার মনঃ'ই বিহারীলালের 'ব্রহ্মার মানস-সরে' পরিবর্তিত হয়েছে ; আর মধুসূদনের 'নন্দন-কাননে'র 'কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণশশী'ই হয়েছে 'ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী'।

মধুসূদনের 'নন্দন-কাননে'র সদৃশ 'নন্দন কানন' বিহারীলালও রচনা করেছেন তাঁর 'সাধের আসনে'র চতুর্থ সর্গে। মধুসূদনের 'ফুল্ল ফুলদল' সেখানে হয়েছে 'চিরফুল্ল ফুলদল'। 'শরৎকাল' কবিতায়ও বিহারীলাল 'ফুল্ল ফুল-বনে'র স্বপ্ন দেখেছেন। মধুসূদন

'নিশা' কবিতায় সান্ধ্য আকাশে তারকার উদয়কে বসন্ত-বনভূমিতে পুষ্পপ্রস্ফুটনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন :

বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি!

বিহারীলাল 'নন্দন কাননে' পারিজাত ফুটতে দেখে বলছেন :

ফুটিয়াছে পারিজাত, যেন কত শুকতারা
উঠিয়াছে নীলাকাশে মাখিয়া সুধার ধারা!

'সাধের আসনে'র দ্বিতীয় সর্গে নিশীথ-আকাশের দিকে তাকিয়েও কবির মনে হয়েছে 'বিচিত্র ফুটিয়া আছে তারকার ফুলবন!'

মধুসূদন 'সায়ংকালে'র আকাশের বর্ণনায় বলেছেন, সূর্য যখন আকাশে রাশি রাশি স্বর্ণ ও রত্ন ছড়িয়ে অস্তাচলগামী হয়েছেন তখন কাদম্বিনী তার সুনীল আঁচলে সেই স্বর্ণ ও রত্নরাশি কুড়িয়ে আকাশে নানা মায়ারূপ রচনায় ব্যস্ত :

সাজাইবে গজ বাজী ; পর্বতের শিরে
সুবর্ণ কিরীট দিবে ; বহাবে অম্বরে
নদস্রোতঃ, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ নীরে!
সুবর্ণের গাছ রোপি, শাখার উপরে
হেমাঙ্গ বিহঙ্গ থোবে!

বিহারীলাল 'গোধূলি' কবিতায় বলছেন :

দিগন্তে রয়েছে ঘিরে মেঘের ধবলা-গিরি,
সোনার শিখর তার দেখি আমি ফিরি ফিরি।
হেথায় বেগুনি মেঘ পরী যেন উড়ে যায়,
ছড়ায়ে দিয়েছে কিবে জরদ ওড়না গায়।

মগন তপন কাছে ধূমল আবরি ওঠে,
কিবে তার বুক বয়ে লাল লাল নদী ছোটে !

মধুসূদন কোটি মণির কিরণে উজ্জ্বল 'ছায়াপথ' দেখে শশিপ্রিয়া বিভাবরীকে জিজ্ঞাসা করেছেন :

এ সুপথ দিয়া কি গো ইন্দ্রাণী সুন্দরী
আনন্দে ভেটিতে যান নন্দন-সদনে
মহেন্দ্রে,—সঙ্গেতে শত বরাঙ্গী অপ্সরী,
মলিনি ক্ষণেক কাল চারু তারাগণে—
সৌন্দর্যে ?

বিহারীলাল 'সাধের আসন'-এর পঞ্চম সর্গে 'অমরাবতীর প্রবেশ-পথ'কে দেখেও বলেছেন 'ঠিক যেন ছায়াপথ !' তাঁরও মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে—

এই পথ দিয়া বুঝি সে সুধাংশুময়ীগণে
পুজিতে যোগেন্দ্রবালা গেছেন কমলবনে ?

সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করে মধুসূদন বসন্ত-কাননের পুষ্পসজ্জাকে বধূসজ্জার সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন :

বসন্তে কানন-রাজি সাজে নানা ফুলে,
নব বিধুমুখী বধূ যাইতে বাসরে
যেমতি ;

বিহারীলাল 'নিসর্গ-সন্দর্শন' কাব্যের সপ্তম সর্গে উপবনেশ্বরীকে অনুরূপ বধূবেশিনীরূপেই কল্পনা করেছেন :

এ কি দশা হেরি তব উপবনেশ্বরি,
কাল তুমি সেজেছিলে কেমন সুন্দর !
বিবাহের মাঙ্গলিক বেশ-ভূষা পরি—
যেমন রূপসী কনে সাজে মনোহর ;

মধুসূদন 'শ্মশানে' মূর্তিমান মৃত্যুকে দেখে বলেছেন :

নীরবে আসীন হেথা দেখি ভস্মাসনে
মৃত্যু—তেজোহীন আঁখি, হাড়-মালা গলে
বিকট অধরে হাসি, যেন ঠাট-ছলে !

মধুসূদনের এই বিভূতিভূষণ মহাকালই বিহারীলালের 'শ্মশান ভূমি'তে 'পাগলিনী যোগিনীর বেশ' গ্রহণ করেছেন—

পাগলিনী যোগিনীর বেশ ;
ছেঁড়া বাস, ছেঁড়াখোঁড়া কেশ ;
বিষম কালিমা ঢাকা
কলেবর ভস্মমাখা,
হাড়মালে ঢাকা গলদেশ ।

মধুসূদন তাঁর মেঘনাদবধের অন্তিম দৃশ্যকে বিজয়ার প্রতিমা-বিসর্জনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই রূপকল্পটিই বিশদীভূত হয়েছে চতুর্দশপদীর 'সমাপ্তে' কবিতায়। সেখানেই কবি তাঁর কাব্যজীবনের উপসংহার কল্পনা করে বলছেন, হৃদয়মণ্ডপ অন্ধকার করে বিস্মৃতির জলে প্রতিমা বিসর্জনের করুণ-লগ্ন উপস্থিত হয়েছে ! বিহারীলালও জীবনের অন্তিম লগ্নকে বিজয়ার সঙ্গেই তুলনা করে বলেছেন :

সেই বিজয়ার দিনে
বাজায়ে প্রাণের বীণে,
ভরি ভরি দু-নয়ন
তোর এই শুভানন
দেখিতে দেখিতে হই কালের সাগরে লীন !

বলাই বাহুল্য এ সব ক্ষেত্রে ভাষা ভাব বা বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্যই বড় কথা নয়, দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশগত বৈশিষ্ট্যই মুখ্য। অর্থাৎ কবিকৃতি

ও কলাকৃতির দিক দিয়ে রোমাণ্টিক কবি হিসাবে মধুসূদন ও বিহারীলালের সাধর্ম্যই বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়।

চতুর্দশপদীর কবিমানসের সঙ্গে রবীন্দ্র-মানসের সাধর্ম্য কি ও কতটুকু সে বিষয়ও ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন। কেননা তা হলেই আধুনিক গীতিকবিতার সূত্রনির্দেশ সত্যনির্ভর হবে। এ পর্যন্ত আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের বংশলতিকায় বিহারীলালকেই আদি-পুরুষ বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যে ঐতিহাসিক বিচারে অভ্রান্ত নয় সে কথা আমরা বলেছি। মধুসূদন থেকেই এই বংশলতিকার আরম্ভ, এবং উত্তরাধিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের কাব্যসংসার থেকেও প্রভূত ভাবসম্পদ লাভ করেছেন। এই প্রসঙ্গে কবি-জীবিত সম্পর্কে আচার্য ক্ষেমেন্দ্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-সূত্র মনে পড়ে। 'কবি-কণ্ঠাভরণে' তিনি বলেছেন :

> ছায়োপজীবী পদকোপজীবী পাদোপজীবী সকলোপজীবী
> ভবেদথ প্রাপ্তকবিত্বজীবী স্বোন্মেষতো বা ভুবনোপজীব্যঃ ॥

কবিত্বপ্রাপ্তি সম্পর্কে রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ যেমন স্বোন্মেষণশীল তেমনি তা 'সকলোপজীবী' হয়েও 'ভুবনোপজীব্য'। রাজশেখরের 'কাব্য মীমাংসা'র পরিভাষায় বলা যায় রবীন্দ্রনাথের 'স্বীকরণ' বিশ্বগ্রাসী ; বিশ্ব-কাব্য-সম্পদ 'স্বী-কৃত' করেই তিনি বিশ্বকবি। এবং এ বিষয়ে এমার্সনের উক্তি—'The greatest genius is the most indebted man',—শেক্‌স্‌পীয়রের মত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও সমভাবেই প্রযোজ্য। কাজেই পূর্বসূরির কাছে ঋণ-স্বীকারে রবীন্দ্র-নাথের মত মহাকবির পক্ষে গৌরবহানির কোনো সম্ভাবনা নেই। উত্তমর্ণের ভাণ্ডার থেকে তিনি যেটুকু গ্রহণ করেছেন তাকে বহুগুণে সুন্দর ও সমৃদ্ধ করেই কাব্যসংসারে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মধুসূদনের কাছে রবীন্দ্রনাথ কি পেয়েছেন তার পূর্ণ আলোচনার স্থান এ নয়; আমরা শুধু চতুর্দশপদী কবিতাবলীর মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন যুগে বিহঙ্গের রূপকটিকে একটি অতিপ্রিয় রূপকল্প রূপে বার বার ব্যবহার করেছেন। ভারতীয় সাহিত্যে পাখির রূপক নূতন নয়; আমাদের লোক-সাহিত্যে যেমন 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'র কথা আছে, তেমনি আছে সংস্কৃতে মুণ্ডকোপনিষদে 'দ্বা সুপর্ণা' সূক্তে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে মধুসূদনই প্রথম এই রূপকটিকে নূতন রূপে ব্যবহার করলেন। তিনি অবশ্য পেত্রার্কার কাছেই পেয়েছেন এই রূপকল্পটি। পেত্রার্কার অষ্টম সনেটে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গকে 'feathered captives' রূপে বর্ণনা করে কবি তাদের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা করে বলেছেন, অন্যের কাছে যে আত্মবিক্রীত তার বন্দিদশা আরো দুঃসহ, তার শৃঙ্খল আরো কঠোর! লরার মৃত্যুর পর লেখা তেতাল্লিশ সংখ্যক সনেটে বুলবুলের গান কবির নিজের দুর্ভাগ্যকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। নব্বই সংখ্যক সনেটেও পাখির বিষণ্ণ সংগীত শুনে তাঁর নিজের নিষ্করণ নিয়তির কথাই মনে পড়ছে। রবীন্দ্রনাথ সতেরো বৎসর বয়সে যখন ভারতীতে 'পিত্রার্কা ও লরা' প্রবন্ধ লেখেন তখন শেষোক্ত সনেটটিকে অনুবাদ করেছিলেন। মধুসূদন চতুর্দশপদীতে 'বউ কথা কও', 'বসন্তে একটি পাখির প্রতি' এবং 'শ্যামা পক্ষী'—পাখিকে নিয়ে এই তিনটি সনেট লিখেছেন। 'বউ কথা কও' সনেটে পক্ষিজীবন সম্পর্কে কবির কৌতূহল ভাষা পেয়েছে কবিতাটির অষ্টক-বন্ধে :

কি দুখে, হে পাখি, তুমি শাখার উপরে
বসি, বউ কথা কও, কও এ কাননে ?—
মানিনী ভামিনী কি হে, ভামের গুমরে,
পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ?

তেঁই সাধ তারে তুমি মিনতি-বচনে ?
তেঁই হে এ কথাগুলি কহিছ কাতরে ?
বড়ই কৌতুক, পাখি, জনমে এ মনে,—
নর-নারী-রঙ্গ কি হে বিহঙ্গিনী করে ?

এই 'কৌতুক'ই রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রে'র একখানি চিঠিতে অনুরূপ জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে—'কোকিলটা তো সারা হয়ে গেল! সে কেন যে এত অবিশ্রাম ডাকে এ পর্যন্ত বোঝা গেল না—* * আবার আর-খানিকটা দূরে আর-একটা কী পাখি নিতান্ত মৃদুস্বরে কুক্-কুক্ করছে—তাতে কিছুমাত্র উৎসাহ আগ্রহের ঝাঁজ নেই, লোকটা যেন নেহাৎ মন-মরা হয়ে গেছে, সমস্ত আশা-ভরসা ছেড়ে দিয়েছে, * *। বাস্তবিক, ঐ ডানাওয়ালা ছোটো ছোটো নিরীহ জীবগুলি, অতি কোমল গ্রীবাটুকু বুকটুকু এবং পাঁচমিশালি রঙ নিয়ে গাছের ছায়ায় বসে আপন আপন ঘরকন্না করছে—ওদের আসল বৃত্তান্ত কিছুই জানি নে। বাস্তবিক বুঝতে পারিনে ওদের এত ডাকবার কী আবশ্যক।' ৩৪

মধুসূদন 'কল্পনা'-শীর্ষক সনেটে নিজের অবস্থার বর্ণনা করে বলেছেন :

হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ-বিহারী পাখী পিঞ্জর-ভিতরি !

ফ্রান্স-প্রবাসে 'দ্রৌপদী-স্বয়ম্বর' এবং 'সুভদ্রাহরণ' নামে যে দুটি কাব্য আরম্ভ করে কবি অসম্পূর্ণ অবস্থায়ই ফেলে রেখে দেন সে দুটি কাব্যেও কবি মাতৃভূমিকে কবিবিহঙ্গের কুঞ্জবন আর প্রবাসকে 'রঙ্গহীন কুপিঞ্জর' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর বন্দিদশা ও মুক্তি-পিপাসাকে খাঁচার পাখি ও বনের পাখির রূপকেই প্রকাশ করেছেন। মধুসূদনের এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা হল 'শ্যামা পক্ষী'। এই

কবিতায় পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গের সঙ্গে 'কবির কুভাগ্য' একই সূত্রে গ্রথিত। কবি বলছেন :

আঁধার পিঞ্জরে তুই, রে কুঞ্জ-বিহারী
বিহঙ্গ, কি রঙ্গে গীত গাহিস্ সুস্বরে ?
ক মোরে, পূর্বের সুখ কেমনে বিস্মরে
মনঃ তোর ? বুঝা রে, যা বুঝিতে না পারি !
সংগীত-তরঙ্গ-সঙ্গে মিশি কি রে ঝরে
অদৃশ্যে ও কারাগারে নয়নের বারি ?
রোদন-নিনাদ কি রে লোকে মনে করে
মধুমাখা গীতধ্বনি, অজ্ঞানে বিচারি ?

রবীন্দ্রনাথও 'কড়ি ও কোমলে'র 'কবির অহংকার' কবিতায় এরই প্রতিধ্বনি তুলেছেন :

খাঁচার পাখির মত গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি-অন্ত মানব-জনমে।

'শ্যামা পক্ষী'র অন্তিম চরণে কবিজীবনের এই নিয়তিকে নিয়ে কবি মধুসূদন একটি দার্শনিক সত্যে পৌঁছেছেন : 'মোহে গন্ধে গন্ধরস সহি হুতাশনে!' রবীন্দ্রনাথের ভাষায়ও এই দুঃখ-দহন-দীক্ষার বাণীরূপ হল : 'আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে!'

কিন্তু 'শ্যামা পক্ষী'র প্রভাব রবীন্দ্রমানসে আরেক ভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। ছেলেবেলা জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' পড়ে বালক-কবি কি ভাবে তার রসাস্বাদন করতেন সে প্রসঙ্গে 'জীবন স্মৃতি'তে বলেছেন, 'জয়দেব যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু * * ছন্দের ঝংকারের মুখে 'নিভৃতনিকুঞ্জগৃহং' এই একটি মাত্র কথাই আমার পক্ষে প্রচুর ছিল।' কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' সম্পর্কেও কবির একই অনুভূতি : 'কেবল 'মন্দাকিনী-

নির্ঝরশীকর' এবং 'কম্পিতদেবদারু' এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল।'[৩৫] অর্থাৎ পূর্বসূরির ভাব এবং রূপকল্পের সৌন্দর্য যেমন কবিকে সর্বদাই মুগ্ধ করেছে তেমনি পঠিত কাব্যের বিশিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছও তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। 'শ্যামা পক্ষী'র অন্ধকার পিঞ্জর, কারাগারে বন্দী বিহঙ্গ, রোদন-নিনাদ ও মধুমাখা গীতধ্বনি···এই শব্দগুলি কি ভাবে কবিমানসে সুরক্ষিত এবং নবসৃষ্টির লগ্নে ব্যবহৃত হয়েছে তার ইঙ্গিত পাওয়া যাবে 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের 'বাক্‌সাতুর্গস্থ রাজবন্দীর প্রতি' [১৩৩৮ বঙ্গাব্দ] কবিতায়। সেখানে কবি বলছেন :

> নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
> পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।

মধুকাব্যের শব্দসম্ভার রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে অভিভূত করেছিল তার আরো দু একটি উদাহরণ এই সূত্রে সংগ্রহ করা যেতে পারে। মধুসূদন 'নন্দন-কাননে' 'উর্বশী'কে বলেছেন, 'কামের আকাশে বামা চির-পূর্ণশশী'। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে 'সৌন্দর্যলক্ষ্মী'ও আবির্ভূত হয়েছেন 'উর্বশী' রূপে। দুটি কবিতার শব্দবিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, মধুসূদনের 'নন্দন-কাননে'র 'অলকা-রূপসী'ই হয়েছেন রবীন্দ্রনাথের 'নন্দনবাসিনী' 'সুন্দরী রূপসী'। মধুসূদনের উর্বশী 'নাচে করতালি দিয়া বীণার স্বননে', তাঁর অলকা-রূপসীরা 'মোহে মন স্বর-বরিষণে', রবীন্দ্রনাথের 'ভুবনমোহিনী' উর্বশীর 'বিলোল-হিল্লোল' নৃত্যে 'অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা, নাচে রক্তধারা'। মধুসূদনের 'বামা' 'কামের আকাশে' 'চির পূর্ণশশী', রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যলক্ষ্মী কখনো 'স্বর্গের উদয়াচলে' 'মূর্তিমতী উষসী', কখনো 'অস্তাচলবাসিনী' 'গৌরবশশী'।

মধুসূদন 'পৃথিবী' কবিতায় বলেছেন :

দেবীর আদেশে তুমি, লো নব রমণি,
কটিতে মেখলা-রূপে পরিলা সাগরে।

রবীন্দ্রনাথও 'বসুন্ধরা'কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন

ইচ্ছা করিয়াছে,
সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ;

বলাই বাহুল্য, সংস্কৃত সাহিত্যে পৃথিবীর মেখলারূপে সমুদ্রের কল্পনা দুর্লভ নয়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের তৃতীয় অংকে রাজা অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বলছেন, তাঁর কুলের শ্লাঘা দুটি : 'সমুদ্ররসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্'। রঘুবংশেরও ষষ্ঠ সর্গের তেষট্টি সংখ্যক শ্লোকে 'রত্নানুবিদ্ধার্ণবমেখলায়া'র অনুরূপ কল্পনা রয়েছে। বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র প্রথমেই রাজা শূদ্রকের পরিচয়ে পাই 'চতুরুদধিমালা মেখলায়া ভুবো ভর্তা'। কিন্তু 'কটি', 'মেখলা' এবং 'সাগর' এই তিনটি শব্দের ধ্বনি-সন্নিবেশ দেখে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, রবীন্দ্রনাথ এই রূপকল্পের বাংলা রূপটি মধুসূদনের নিকটেই পেয়েছেন। শব্দ-সাদৃশ্যের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল বর্ণ-ক্রমান্বয়ে 'শ্বেত রক্ত নীল পীতে'র পুনরুক্তি। মধুসূদন মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে স্বর্ণলঙ্কার রাজসভায় 'শ্বেত রক্ত নীল পীত' সারি সারি স্তম্ভের বর্ণনা করেছেন। কাশীরামের মহাভারতেই মধুসূদন এই বর্ণবৈভবের সন্ধান পেয়েছিলেন। আদিপর্বে কৃষ্ণার্জুনের মিলন উপলক্ষে রৈবতকের নরনারী 'শ্বেত পীত নীল রক্ত বিবিধ বসনে' সজ্জিত হয়েছিল। মধুসূদন এই বর্ণসজ্জার নবক্রম রচনা করে বর্ণাঢ্যতাকে চরম সৌন্দর্যে পৌঁছে দিয়েছেন। নিশাকালে 'সাগরে তরি'র মায়া-বিহঙ্গিনী রূপের বর্ণনায় তিনি এই বর্ণচতুষ্টয়ের সঙ্গে আবার পিঙ্গলকেও মিশিয়েছেন :

রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে
দীপাবলী, মনোহরা নানা বর্ণ করে,—
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, মিশ্রিত পিঙ্গলে।

রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' কাব্যের 'তপোভঙ্গে' পাই—

একদা সে দিনগুলি তোমার পিঙ্গল জটাজালে
শ্বেত রক্ত নীল পীত নানা পুষ্পে বিচিত্র সাজালে,
গেছ কি পাসরি।

এখানে একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের যখন চার বৎসর বয়স তখন 'চতুর্দশপদী' প্রকাশিত হয়েছে, আর কবি যখন বাষট্টি বৎসর বয়সে 'তপোভঙ্গ' লিখছেন তখনও মধুসূদনের বর্ণ ও শব্দধ্বনি তাঁর 'তপোভঙ্গে'র মতো মহত্তম সৃষ্টিতেও পুনরাবর্তিত হচ্ছে।

মধুসূদনের বিচিত্রসুন্দর রূপকল্পমালাও রবীন্দ্রনাথকে কম প্রভাবিত করেনি। কবির পরিচয় কি—এই জিজ্ঞাসার উত্তরে 'কবি' সনেটে মধুসূদনের বক্তব্য হল :

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।

'ভাবের সংসারে' এই অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ সুবর্ণ কিরণের অপূর্ব আলেখ্যটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কিছুতেই এড়াতে পারে না। 'বিহারীলাল' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের ভাষাতেই তাঁর কবিগুরু-প্রশস্তি রচনা করে বলেছেন, 'সূর্যাস্তকালের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো 'সারদা মঙ্গলে'র সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়…।'[৩৬] তাছাড়া 'কবিতা-কল্পনালতা'কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও 'সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা' নীরবে ভুঞ্জন করেছেন।

'কবি'-পরিচিতির শেষ স্তরে মধুসূদন বলেছেন :

মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে !

রবীন্দ্রনাথও আশি বৎসর বয়সে 'ঐকতান' কবিতায় অখ্যাত জনের অনাগত কবিকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন :

প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।

মধুসূদন ভোরের শুকতারাকে প্রত্যহ গিরিশিরে উদিত দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন :

বহে কলকল রবে স্বচ্ছ প্রবাহিণী
গিরি-তলে ; সে দর্পণে নিরখিতে ধীরে
ও মুখের আভা কি লো, আইস, কামিনি,
কুসুম-শয়ন থুয়ে সুবর্ণ মন্দিরে ?—

রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া'র 'নির্ঝরিণী' কবিতায় বলেছেন :

ঝর্‌না, তোমার স্ফটিকজলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য-তারা।

মধুসূদনের কল্পনায় যে দিন 'পৃথিবী'র জন্ম হল সেদিন

আইলেন আদি প্রভা হেম-ঘনাসনে,
ভাসি ধীরে শূন্যরূপ সুনীল অর্ণবে,
দেখিতে তোমার মুখ।

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় আদিজননী সিন্ধুর সন্তান-রূপে যেদিন বসুন্ধরার জন্ম-সম্ভাবনা দেখা দিল সেদিন

প্রতি প্রাতে উষা এসে
অনুমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিন,
নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি-নিশি নিমেষবিহীন
শিশুহীন শয়নশিয়রে।

বলাই বাহুল্য, উভয়ত একই কল্পনা, একই রূপকল্প; কেবল মধুসূদনের 'আদি প্রভা' রবীন্দ্রনাথে 'উষা' হয়েছে।

রবীন্দ্রকাব্যে পল্লবিত ও পুষ্পিত আকারে এমন অনেক কল্পনার সন্ধান পাওয়া যাবে যার বীজ রয়েছে চতুর্দশপদীতে। 'সুভদ্রাহরণ' কবিতায় মধুসূদন বলেছেন :

ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?

রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থের 'ফুল ফোটানো' কবিতাটির 'তোরা কেউ পারবিনে গো, পারবিনে ফুল ফোটাতে' মধুসূদনের উদ্ধৃত দুটি পংক্তিরই পুষ্পিত রূপ। 'পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্‌ডস্টুকর' সনেটে মধুসূদন বাল্মীকির 'মহা গীতধ্বনি' সম্পর্কে বলেছেন—

বাজায়ে সুকল বীণা বাল্মীকি আপনি
কহেন রামের কথা তোমায় আদরে ;
বদরিকাশ্রম হতে মহা গীত-ধ্বনি
গিরি-জাত স্রোতঃ-সম ভীম-ধ্বনি করে !

মধুসূদন-কল্পিত এই 'গিরি-জাত স্রোতঃসম ভীমধ্বনি'ই রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় (যেদিন হিমাদ্রিশৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়) 'মহানদ ব্রহ্মপুত্রের' 'তরঙ্গের ডম্বরু'-নিনাদে রূপান্তরিত হয়েছে।

এহ বাহ্য! মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কল্পনা ও প্রকাশগত সাদৃশ্যের স্ফুটতর প্রমাণও চতুর্দশপদীতে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের

অহল্যা, মেঘদূত, বসুন্ধরা প্রভৃতি কবিতায় যে [প্র]বহমান সমিল পয়ার ব্যবহৃত হয়েছে তার আদর্শ মধুসূদনের চতুর্দশপদীতেই সন্ধান করতে হবে। বলাই বাহুল্য, চতুর্দশপদীতে ভাব ও ভাষার যে ঘনীভূত রূপ অত্যাবশ্যক ছিল রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত কবিতাগুলিতে তা প্রয়োজন হয়নি বলেই সেখানে গীতিকাব্যের সংগীত অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত ও লীলায়িত। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্বসূরি ও উত্তর-সূরির অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের সন্ধান দুঃসাধ্য নয়। মধুসূদন 'কালিদাস' কবিতায় বলেছেন :

শৈলেন্দ্র-সদনে,
লভি জন্ম মন্দাকিনী (আনন্দ জগতে !)
নাশেন কলুষ যথা এ তিন ভুবনে ;
সংগীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে
(পুণ্যভূমি !) হে কবীন্দ্র, সুধা-বরিষণে,
দেশ-দেশান্তরে কর্ণ তোষে সেই মতে !

রবীন্দ্রনাথও 'মানসী' কাব্যে 'মেঘদূত' কবিতায় কালিদাস সম্পর্কে বলেছেন :

তাদের সবার গান তোমার সংগীতে
পাঠায়ে কি দিলে, কবি, দিবসে নিশীথে
দেশে-দেশান্তরে খুঁজি বিরহিণী প্রিয়া।
শ্রাবণে জাহ্নবী যথা যায় প্রবাহিয়া
টানি লয়ে দিশ-দিশান্তের বারিধারা
মহাসমুদ্রের মাঝে হতে দিশাহারা।

মধুসূদনের মন্দাকিনীধারা রবীন্দ্রনাথের জাহ্নবীপ্রবাহে বিশালতোয়া হয়েছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই কবি-সংগীতের উপমান হয়েছে মর্ত্যলোক-প্রবাহিণী সুরধুনীধারা।

মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক-প্রতিষ্ঠার জন্য আশা করি আর বেশি সূত্র-নির্দেশের প্রয়োজন নেই। আরেকটি মাত্র সংকেত দিয়েই এ প্রসঙ্গের উপসংহার রচনা করব। নবীন যৌবনে রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে দেহসৌন্দর্যমুগ্ধ প্রেমের আরতি যে ভাষায় করেছিলেন, মনে হয় কোমল-কাব্য-কৌশল-কলায় বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। কিন্তু উত্তমপুরুষ এক-বচনের সেই অসংকোচ আত্মপ্রকাশের বলিষ্ঠ রীতি চতুর্দশপদীতেই প্রথম প্রবর্তিত হয়েছে। চতুর্দশপদীর প্রেমচেতনার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। মধুরীতি রবীন্দ্রকাব্যে কি ভাবে আবর্তিত হয়েছে তার সূত্র সন্ধানের জন্য তিনটি অংশ পুনরায় উদ্ধার করব :

কে না জানে কবি-কুল প্রেম-দাস ভবে,
কুসুমের দাস যথা মারুত, সুন্দরি,
ভাল যে বাসিব আমি, এ বিষয়ে তবে
এ বৃথা সংশয় কেন? কুসুম-মঞ্জরী
মদনের কুঞ্জে তুমি। কভু পিক-রবে
তব গুণ গায় কবি ; কভু রূপ ধরি
অলির, যাচে সে মধু ও কানে গুঞ্জরি, [পরিচয়—২

যথা শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে
সদা সত্যঃ ; যথা অলি সতত গুঞ্জরে ;
বহে যথা সমীরণ বহি পরিমলে ;
বসি যথা শাখা-মুখে কোকিল কুহরে ;
লও দাসে ; [নন্দন-কানন

নন্দনের পিক-ধ্বনি সুমধুর গলে ;
পারিজাত-কুসুমের পরিমল শ্বাসে ;
মানস-কমল-রুচি বদন-কমলে ;
অধরে অমৃত-সুধা ; সৌদামিনী হাসে ; [শকুন্তলা

উদ্ধৃত পংক্তিনিচয়ে মধুসূদন 'কামের নিকুঞ্জে' যে সৌন্দর্যস্বর্গ রচনা করেছেন তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে তা ছিল একান্তই অভিনব। ঈশ্বরগুপ্তের ইন্দ্রিয়বেদ্য বস্তুজগতের বৈসাদৃশ্যে রোমান্টিক কবিমানসের এই কল্পনাভিসার এক নতুন স্বপ্নলোকের সন্ধান দিয়েছিল। আর সেই স্বপ্নসরণির অনুসরণেই 'কড়ি ও কোমলে'র কবি 'মানসী'র 'লক্ষ্মীর বিলাসপুরী অমর ভুবনে' 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে' পৌঁছেছিলেন। 'কড়ি ও কোমলে'র একটি সনেটের অষ্টক-বন্ধ এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে :

> ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
> এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী,
> শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
> টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
> চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
> সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
> ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
> মুখে পড়ে মোহ ভরে পূর্ণিমার হাসি।

যে-দৃষ্টিতে প্রিয়ার বরতনু কুসুম-মঞ্জরীর সৌন্দর্য ও সুরভিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তারি প্রসাদলোভী কবিভৃঙ্গ প্রেমগুঞ্জরণে মুখর হয়, যে-দৃষ্টিতে একটি ক্ষুদ্র দেহের মধ্যেই কবিপ্রেমিক আকাশভুবনব্যাপী সৌন্দর্যকে নবনব রূপে সৃষ্টি করতে পারে, উভয় কবির কাব্যেই সেই দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পার্থক্য এই যে, মধুসূদনে তার আরম্ভ মাত্র, আর রবীন্দ্রনাথে তার সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক পরিণতি।

তপন-উদয়ে পূর্ণচন্দ্রেরও মহিমার ক্ষয় হয়। রবীন্দ্রাদিত্যের আবির্ভাবে মধু-রশ্মিও যে ম্লান হবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই! বরং মধুসূদনের গৌরব এই যে, এই নব-অভ্যুদয়ের ভূমিকা তিনিই রচনা করেছেন। গীতিকাব্যের ভাষায় কবির আত্মকথা আমরা তাঁর কণ্ঠেই প্রথম শুনতে পেলাম। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যেই কবির অন্তর্লোক সর্বপ্রথম সহৃদয়-সমাজে নির্বারিত হল। মধুসূদনের ব্যক্তিপুরুষ এবং কবিপুরুষ—উভয়েরই অন্তরঙ্গতম আত্মপরিচয় তাঁর এই শেষ কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত। কিন্তু মহাকবির আত্মকথার মধ্যেই জাতীয় জীবনের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাওয়া যায়। তাই 'চতুর্দশপদী'তে মধুসূদনের আত্মকথাই নবজাগ্রত বাঙালীর মর্মকথা হয়ে উঠেছে। মহাকবির কণ্ঠে জাতীয় জীবনের সেই মর্মবাণীকে উদ্ঘাটিত করার জন্যে মধুসূদনের ভাগ্যদেবতা নিঃসম্বল প্রবাসজীবনের চরম অগ্নিপরীক্ষায় অহোরাত্র দগ্ধ করে তাঁকে এই মহত্তর সৃষ্টির জন্যে প্রস্তুত করেছেন। আমরা বলেছি, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' কবিজীবনের পূর্ণাহুতি। 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'মেঘনাদবধ', 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা'তে যে কৃত্য অসম্পূর্ণ রয়ে গেল তাই পূর্ণ হল 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে। এই গ্রন্থ-চতুষ্টয়ে মহাকবি তাঁর অসামান্য কল্পনাবলে অতীতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কিন্তু নানা বাধা ও বন্ধনের মধ্যে অন্যের কণ্ঠেই কবিকে নিজের কথা বলতে হয়েছে। আপেক্ষিক সাফল্য সত্ত্বেও তা স্বতঃ-উৎসারিত নবজীবনের বাণী হয়ে ওঠে নি। পেত্রার্কাও সে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু লাটিন ভাষায় লিখিত তাঁর মহাকাব্য 'আফ্রিকা'ও শেষ পর্যন্ত তাঁর

আত্মপ্রকাশের অন্তিম বাহন সনেটের কাছে পরাজিত হল। কেন না, নবজন্মোত্তর পৃথিবীতে কবির ব্যক্তিত্ব-স্বাক্ষরিত গীতিকাব্যই কবিকথার শ্রেষ্ঠ বাহন। গীতিকাব্যের নব কলাকৃতিতে কবির আত্মকথাই এ যুগের মহাকাব্য। নবযুগের বাংলা কাব্যের স্রষ্টাও তাঁর জীবনের মহত্তর মহাকাব্য রচনা করলেন গীতিকাব্য-বন্ধে। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গীতিকাব্যের আকারে বাংলার নবজন্মের মহাকাব্য। তাঁর 'মেঘনাদবধ' ছিল এপিক-ট্রাজেডি, তাঁর নবতর মহাকাব্য হল Vita Nuova বা Epic of New Birth. একখানি মৃত অতীতের বিষাদাত্মক বীরগাথা, আরেকখানি চিরায়ত কালের আনন্দময় জীবন-সংগীত!

মধুসূদনের এই অভিনব মহাকাব্য, তাঁর জীবনের মহত্তম কবিকীর্তির সামান্য পরিচয় সংকলন করে এই মধু-প্রসঙ্গের উপসংহার করব। যে নিসর্গলোক এই মহাকাব্যের পটভূমি তার পরিচয় কবিকণ্ঠেই শোনা যাক :

> যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,
> ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
> প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
> ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
> জাহ্নবী ; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে
> (তুষারে বপিত বাস ঊর্ধ্ব কলেবরে,
> রজতের উপবীত স্রোতঃ-রূপে গলে,)
> শোভেন শৈলেন্দ্র-রাজ, মান-সরোবরে
> (স্বচ্ছ দরপণ !) হেরি ভীষণ মূরতি ;—
> দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
> চাঁদের আমোদ সদা কুমুদ-সদনে ;—

পৃথিবীর সেই নিসর্গ-স্বর্গই বঙ্গমহাকবির নবমহাকাব্যের প্রতিষ্ঠা-

ভূমি। স্বর্গাদপি গরীয়সী এই নিসর্গ-সৌন্দর্য-বর্ণনায় কবির লেখনীতে 'চতুর্দশপদী'র অক্টোপাস-বন্ধনও বার বার উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এই নিসর্গ-স্বর্গের অধিবাসী কারা ?—

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান···

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই জাতির অতীত গৌরব আজ তমসাচ্ছন্ন। এই বীর জাতি আজ পরপদানত, শৃঙ্খলাবদ্ধ। তাই পরম ক্ষোভের সঙ্গে কবি প্রশ্ন করেছেন :

বামন দানবকুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—

মাতৃভূমির এই দুর্দশা দেখে স্বদেশপ্রেমী কবির মনে আক্ষেপও জেগেছে :

কার শাপে, তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ, সুধা তিত অতি ?

কিন্তু জাতীয় জীবনের এই কৃষ্ণপক্ষের অবসান অবশ্যম্ভাবী জেনেই অত্যাসন্ন সুদিনের প্রতীক্ষায় ধৈর্যচ্যুত কবিমানসে জিজ্ঞাসা জেগেছে :

পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারতশশী ভাতিবে সংসারে ?

বলাই বাহুল্য, এসব কবিতায় পরাধীনতার মর্মবেদনাই কবিকণ্ঠে উচ্চারিত ; এবং সমগ্রভাবে ভারতচেতনাই কবিচিত্তে বিরাজমান। কিন্তু তার মধ্যেও বঙ্গভাষা ও বঙ্গভূমিই যেন কবির নিত্যধ্যেয়। বঙ্গভাষা তাঁর দৃষ্টিতে 'ভারত-আকাশে' 'নব শশিকলা', 'নবফুল বাক্য-বনে, নব মধুমতী'। বঙ্গভূমিও তাঁর কল্পনায় ভারত-রত্ন। অর্থাৎ

অব্যবহিত পরবর্তী যুগে বঙ্কিমচন্দ্র সপ্তকোটি কণ্ঠের কলকল নিনাদে যে মাতৃবন্দনা করেছেন সেই সপ্তকোটি সন্তানের দেশ বঙ্গভূমিই মধুমানসেরও মাতৃভূমি।

অতীত গৌরবের গরিমা এবং নবজাগরণের উদ্দীপনায় ক্রান্তিদর্শী কবির কল্পনায় তাঁর মাতৃভূমিতে এক চিরজয়ী চিরজীবী নবজাতকের জন্ম হয়েছে। ষড়ৈশ্বর্যময়ী বঙ্গজননী স্বর্ণসিংহাসনে সেই নবজাত শিশুকে কোলে করে বসে আছেন। নবজন্মের উৎসবে দিগ্‌দিগন্ত নিনাদিত। কখনও আশ্বিন মাসে সুশ্যামাঙ্গ বঙ্গের মহাব্রত। বৎসরের পরে ভক্তের ঘরে মহিষমর্দিনী-রূপে উমা ফিরে এসেছেন :

বামে কমকায়া রমা, দক্ষিণে আয়ত-
লোচনা বচনেশ্বরী, স্বর্ণবীণা করে ;
শিখীপৃষ্ঠে শিখীধ্বজ, যাঁর শরে হত
তারক—অসুরশ্রেষ্ঠ ; গণদল যত,
তার পতি গণদেব…
এক পদ্মে শতদল ! শত রূপবতী—
নক্ষত্রমণ্ডলী যেন একত্রে গগনে !—

কখনও মধু-বসন্তে ভেসে আসে এক দিব্য-সংগীত :

ওই যে শুনিছ ধ্বনি ও নিকুঞ্জ-বনে,
ভেবো না গুঞ্জরে অলি চুম্বি ফুলাধরে ,
ভেবো না গাইছে পিক কল-কুহরণে,
তুষিতে প্রত্যূষে আজি ঋতু-রাজেশ্বরে।…
স্বর্গীয় বাজনা ওই ! পিককুল কবে,
কবে বা মধুপ করে হেন মধুধ্বনি ?
কিন্নরের বীণাতান অপ্সরার রবে !
আনন্দে কুসুম-সাজ ধরেন ধরণী,—
নন্দন-কানন-জাত পরিমল ভবে
বিতরেন বায়ু-ইন্দ্র পবন আপনি !

কিন্তু এই বাইরের উৎসবই শেষ নয়, এই জাতির অন্তর্লোকেও চলেছে আর এক চিন্ময় জীবনোৎসব। তারই কথা ভেবে কবি বলছেন :

> নহে দিন দূর, দেবি, যবে ভূভারতে
> বিসর্জিবে ভূ-ভারত, বিস্মৃতির জলে,
> ও তব ধবল-মূর্তি সুদল-কমলে ;—
> কিন্তু চিরস্থায়ী পূজা তোমার জগতে !···
> কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে ;
> সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
> পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে
> দশ দিশে,···
> কি কাজ মাটির দেহে তবে, সনাতনে ?

সারস্বত ব্রতই এই বীর জাতির মুখ্য ধর্ম। তাই নবজন্মের মহোৎসবে আবির্ভূত হয়েছেন জাতীয় জীবনের অমর সহচরবৃন্দ। এসেছেন বাঙালীর কবিকুলগুরু জয়দেব—মাধবের রব যাঁর মধুর বেণুধ্বনিতে। এসেছেন কবীশদলে পুণ্যবান ভগীরথকীর্তি কাশীরাম, এসেছেন চিরকীর্তিবাস কবি কৃত্তিবাস, এসেছেন কমলে-কামিনীর কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ, এসেছেন অন্নপূর্ণার ঝাঁপি হাতে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। সারস্বত জীবনের এই অমর সহচরবৃন্দের গৌরবমণ্ডিত উত্তরাধিকারের প্রেরণায় নবযুগের নব নব সাধকেরও আবির্ভাব হচ্ছে। তাঁদেরই প্রতিনিধিরূপে দেখা দিয়েছেন অম্লানকিরণে উজ্জ্বল, হেমাদ্রির হেমকান্তিসদৃশ পুরুষপ্রবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জাতির এই নবজন্মের উৎসবে বিদেশাগত অতিথিরাও এসেছেন ;—এসেছেন পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্‌ড্‌স্টুকর : অতিথি-তোষণে নিযুক্ত হয়েছেন প্রবীণতম পূর্বসূরিবৃন্দ—বাল্মীকি বেদব্যাস কালিদাস। ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে, গৌরবে ও গরিমায় অপরূপ এই নবজন্মের মহাসংগীত। বাংলার জাতীয় জীবনের এই অমর দিব্যসংগীত

শেষ করে মহাকবি তাঁর অন্তিম প্রার্থনা নিবেদন করছেন :

> বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
> (হৃদয়-মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি !)
> ও প্রতিমা।...
> এবে—ইন্দ্রপ্রস্থ ছাড়ি যাই দূর বনে !
> এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
> জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ—ভারত-রতনে।

মহাকবি মধুসূদনের কাব্যসাধনার পূর্ণাহুতি এখানেই। তারপর কবিজীবনের অন্তিম দৃশ্য। যোগীন বসুর হাসপাতাল-কাহিনী নয়, ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে মহাপ্রস্থানের পথে আজীবন-যোদ্ধৃ পুরুষের মহাযাত্রা। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন শনিবার। বাংলার নবতর যুগের স্রষ্টা, মধুসূদনের সুযোগ্যতম উত্তর-সারথি, প্রজ্ঞাক্ষেত্রে সে-যুগের মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে'র মহাসত্রে নবজীবনের তপস্যা করছিলেন। পরমবিস্ময়ে এই মহাপ্রস্থান-দৃশ্যের প্রতি তিনি সজলনেত্রে তাকিয়ে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আঁচলে চোখের জল মুছে পূর্বসূরির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র লেখনী তুলে নিলেন হাতে। 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় তাঁর মুক্তাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে উঠল :

> যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য-গর্বিত ইউরোপীয় আমাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি ?—বাঙ্গালির মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কি ? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।...
> ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহাতে নাম লেখ, 'শ্রীমধুসূদন'। [৩৭]

॥ উল্লেখ-পঞ্জি ॥

১ 'হেমবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্যের শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না।'—রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ; দ্বিতীয় খণ্ড; পৃষ্ঠা ৭৬।

২ "He was nothing of a Bengali scholar," said Rabindranath once, when we were discussing the Meghnadbadh; "he just got a dictionary and looked out all the sounding words. He had great power over words. But his style has not been repeated. It isn't Bengali."—Edward Thompson, Rabindranath Tagore: Poet & Dramatist; পৃ° ১৫।

৩ 'তাই এপিক-আকারের তলে তলে অন্তঃসলিলা হইয়া লিরিকের ফল্গুস্রোত বহিয়াছে। এই লিরিক-সুর কবির সুপ্ত আত্মারই ক্রন্দনধ্বনি, ইহাকে নিবারণ করা কবির পক্ষে অসাধ্য ছিল।'—মোহিতলাল মজুমদার, কবি শ্রীমধুসূদন, পৃ° ২৫।

৪ যোগীন্দ্রনাথ বসু, মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত, ষোড়শ অধ্যায়।

৫ বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা, পৃ° ২৮।

৬ যোগীন্দ্রনাথ বসু, অষ্টত্রিংশ পত্র পৃ° ৪২৭ ও চত্বারিংশ পত্র পৃ° ৪৩৩।

৭ 'বঙ্গদেশে এক মান্য বন্ধুর উদ্দেশে' শীর্ষক সনেট।

৮ মানসী, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ° ১৪০।

৯ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ° ৪২৪।

১০ Knowledge of a great European language is like the acquisition of a vast and well-cultivated state......

১১ শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, 'মাইকেল মধুসূদনের সনেট' প্রবন্ধ, শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকা, ১৩৬০, পৃ° ১৪-১৫।

১২ চতুর্দশপদী কবিতাবলীর ৭০টি সনেটে আবর্তন সৃষ্টি আছে, ৩২টিতে নেই।

১৩ এগারোটি সনেটে দুটি চতুষ্কই সংবৃত, ৪৭টিতে দুটিই বিবৃত ; ২৮টিতে প্রথমটি সংবৃত দ্বিতীয়টি বিবৃত এবং ১৫টিতে প্রথমটি বিবৃত দ্বিতীয়টি মিল-বিন্যাসের সংবৃত। ১৩টি সনেটে বিবৃত চতুষ্ক-যুগল-রচনায় দক্ষিণাবর্ত ও বামাবর্ত মিল-বিন্যাসের ফলে সমগ্র ভাবে অষ্টক-বন্ধ সংবৃতি-ধর্মী হয়ে উঠেছে।

১৪ আটানব্বইটি সনেট দুই মিলের ষট্‌কবন্ধে রচিত। সর্বত্রই পদান্তর-পর্যায়ে বিন্যস্ত মিল। কেবল 'মেঘদূতে' ব্যতিক্রম—তপপ : তপত। তিন মিলের ষট্‌কবন্ধ আছে মাত্র চারটি কবিতায় : বঙ্গভাষা, কমলে কামিনী, কাশীরাম দাস, জয়দেব। কমলে কামিনীর মিল : তপন : তপন।

১৫ চারটি নয়, তিনটি। বঙ্গভাষা, কাশীরাম দাস ও জয়দেব।

১৬ Enid Hamer, The English Sonnet, ভূমিকা, পৃ° xiv.

১৭ মধুসূদন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই স্বরান্ত অক্ষরে চরণ শেষ করেছেন। সেই জন্যে যুগ্মাক্ষর স্বরান্ত মিল তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য-রূপে দেখা দিয়েছে।

১৮ চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে অষ্টক ও ষট্‌কবন্ধে বন্ধনরচন ও বন্ধন-মোচন অর্থাৎ আমাদের প্রতিপাদ্য 'আসক্তি-মুক্তি-তত্ত্বে'র স্বরূপ বিচিত্র-রূপে প্রকাশিত। কখনো অষ্টকে উপমান ষট্‌কে উপমেয় [যথা, কাশীরাম দাস], কখনো সামান্য থেকে বিশেষ [মেঘদূত], তেমনি, বিশেষ থেকে সামান্য [নদীতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিব মন্দির], জিজ্ঞাসা থেকে উত্তর ['বউ কথা কও', সায়ংকালের তারা], স্মৃতি থেকে বাসনা [কপোতাক্ষ নদ], পূর্বপক্ষ থেকে উত্তরপক্ষ [অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, অর্থ], বিশ্বকথা থেকে আত্মকথা [কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা], ব্যক্তিকথা থেকে বিশ্বকথা [যশঃ, ভূতকাল], নিসর্গলোক থেকে মানবলোক [নিশা], অপ্রাকরণিক থেকে প্রাকরণিক [শ্যামা পক্ষী], কারণ থেকে কার্য [হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু], পূর্বভাগ থেকে উত্তর ভাগ [রামায়ণ, বাল্মীকি] সংলাপ-বন্ধে একপক্ষ থেকে অন্যপক্ষ [উর্বশী]॥

১৯ ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ মুখোপাধ্যায়-বিরচিত 'আধুনিক বাংলা কাব্য'. গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, 'করুণরসের অপরিহার্য

স্ফুরণ ব্যতীত বীররসের অভিব্যক্তি অসম্ভব। মহাকাব্যীয় বীররস যেন শোক-পারাবারের মধ্যে অর্ধ-নিমগ্ন, ইন্দ্র-বজ্রাহত মৈনাক।'

মধুসূদন সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের ন'টি রসের মধ্যে আদি করুণ বীর ও রৌদ্র —এই চারটি রসকেই মুখ্য বলে মনে করতেন। অসমাপ্ত 'পাণ্ডব-বিজয়' কাজের প্রথম স্বর্গে 'কবি-মাতা'কে বন্দনা করে কবি বলছেন :

দাসের রসনা আসি রস নানা রসে,
কভু রৌদ্রে, কভু বীরে, কভু বা করুণে—
দেহ ফুলশরাসন, পঞ্চফুলশরে।

[মধুসূদন গ্রন্থাবলী, পরিষৎ সং, বিবিধ খণ্ড, পৃ° ৪৩ ॥

২০ বাল্মীকি রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ডম্, একাদশাধিকতমঃ সর্গঃ। শ্লোক ২, ৭, ৯, ১১ ॥ বঙ্গানুবাদ : বঙ্গবাসী সংস্করণ ॥

২১ দ্রষ্টব্য। মোহিতলাল মজুমদার, আধুনিক বাংলা সাহিত্য, প্রথম সং, পৃ ৭-৮।

২২ যোগীন্দ্রনাথ বসু, পৃ° ৪৫৬।

১৩ 'কবি শ্রীমধুসূদন', পৃ° ৩০-৩১।

২৪ বাংলা কবিতার ছন্দ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ° ১৮৪-১৮৫ ॥

২৫ The Cambridge Milton for Schools, Sonnets, Edited by Verity, Introduction, পৃ° xxix.

২৬ পেত্রার্কার কাব্যগ্রন্থ Canzoniere-এ সবসুদ্ধ ৩৬৬টি কবিতা আছে। তন্মধ্যে ৩১৭টি সনেট, ২৯টি ওড্, ৯টি সেস্তিনা, ৭টি বালাদ, ৪টি মাদিগ্রাল, ও 'বিজয়' নামে [Triumphs] একটি সর্গবন্ধ কাব্য। এই শেষোক্ত কাব্যটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত : প্রেম, সতীত্ব, মৃত্যু, যশ ও অমরতার বিজয়বার্তা পাঁচটি সর্গে বিঘোষিত হয়েছে। বিজয়-কাব্যকে বাদ দিয়ে সমগ্র গ্রন্থে ত্রিশটি সনেট ও পাঁচটি ওড্ ছাড়া সবগুলিই প্রেমের কবিতা।

২৭ The Elizabethan Love Sonnet, পৃ° ২৪৮।

২৮ তদেব, পৃ° ২৬৯।

২৯ তদেব, পৃ° ২৬৯-২৭০।

৩০ 'আধুনিক সাহিত্য', 'বিহারীলাল' প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ° ৪১২।

৩১ জীবনস্মৃতি, স° অগ্রহায়ণ ১৩৫০; পৃ° ১২৬-১২৭।

৩২ দ্রষ্টব্য মধুসূদন-গ্রন্থাবলী, পরিষৎ স°। ব্রজাঙ্গনা কাব্য, ভূমিকা, পৃ° ।৶০ ॥

৩৩ 'বিহারীলাল' প্রবন্ধ। রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ° ৪২০ ॥

৩৪ ছিন্নপত্র, পত্র-সংখ্যা ৫০। পৃ° ১১০ ॥

৩৫ জীবনস্মৃতি, পৃ° ৪৮ ॥

৩৬ বিহারীলাল, রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ° ৪২০ ॥

৩৭ 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত।'—বঙ্গদর্শন, ভাদ্র ১২৮০, পৃ° ২০৯-২১০ ॥

॥ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র পাঠসংস্কার ॥

চতুর্দশপদী কবিতাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ বাজারে চালু রয়েছে। বিভিন্ন সংস্করণে কিছু কিছু পাঠভেদ পরিলক্ষিত হয়। দীননাথ সান্যাল সম্পাদিত সংস্করণ এদিক দিয়ে অনেকখানি নির্ভরযোগ্য। আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণে মুদ্রিত পাঠের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সংস্কার প্রয়োজনীয় মনে করি—

সনেট সংখ্যা ৮ ॥ জয়দেব ॥ শেষ চরণ ॥

'কে আছে ভারতে ভক্ত নাহি ভাবি মনে ?'— 'ভাবি' স্থলে 'ভাবে' হবে।

সনেট সংখ্যা ৩০ ॥ সীতা দেবী ॥ দ্বিতীয় চতুষ্ক : তৃতীয় পংক্তি : 'কোথা দাশরথি শূর—কোথা মহারথী'—স্থলে হবে 'কোথা দাশরথি শূর—মহারথী কোথা…'। লিপিকালে কবির অনবধানতাবশত এই ত্রুটি হয়ে গেছে। অষ্টক-বন্ধের মিল-রচনার দিক দিয়ে এই চরণ শেষ হবে 'কোথা' দিয়ে।

সনেট সংখ্যা ৩২ ॥ নন্দন-কানন ॥ অষ্টক-বন্ধের প্রথম চরণ 'যথায় শিশিরের বিন্দু…' স্থলে হবে 'যথা শিশিরের বিন্দু…'।

সনেট সংখ্যা ৬৫ ॥ উদ্যানে পুষ্করিণী ॥ একাদশ ও দ্বাদশ চরণ ॥

আছে : নিশায় বাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে !

হবে : নিশায় রাসের রঙ্গ তোর, রসবতি,
লয়ে চাঁদে,—কত হাসি প্রেম-আলিঙ্গনে !

এখানে 'বাসের' অর্থহীন। র-এর বিন্দু লিপিকালে ভুলে পড়ে নি। তাই 'রাসের' স্থলে প্রথম থেকে 'বাসের'ই চলছে।

সনেট সংখ্যা ৮২ ॥ কবিগুরু দান্তে ॥ দ্বাদশ চরণ ॥

'পাপ প্রাণ' স্থলে হবে 'পাপী প্রাণ'। দ্রষ্টব্য : দান্তের ষট্‌শতবার্ষিকীতে কবিপ্রেরিত ও তাঁর স্বহস্তলিখিত কবিতার চিত্রলিপি। শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের প্রবন্ধে মুদ্রিত। 'দেশ', শারদীয়া সংখ্যা, ১৩৬০, পৃ° ১১ ॥ এই কবিতার বিরতি-চিহ্নাদিও উক্ত চিত্রলিপির সাহায্যে সংস্কার করা বাঞ্ছনীয়।

সনেট সংখ্যা ৯১ ॥ পৃথিবী ॥ দ্বিতীয় চতুষ্ক, প্রথম পংক্তি।

'কুল-বালা-দল যবে' স্থলে হওয়া উচিত 'কুল-বালা-দল যথা' :

সনেট সংখ্যা ৯৪ ॥ বাল্মীকি ॥ দ্বিতীয় চতুষ্ক, প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ : অন্ত্যমিল পরপর দুই চরণে 'কারণে' ও 'বচনে' স্থলে হবে 'কারণ' ও 'বচনে'। 'কারণে' ও 'বচন'ও মিলের দিক দিয়ে সিদ্ধ; কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে প্রথম বিকল্পই গ্রাহ্য।

তৃতীয় অধ্যায়

॥ বাংলা সাহিত্যে সনেট ঃ রবীন্দ্রনাথের মানসলক্ষ্মী ॥

১

রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর মহত্তম গীতিকবি। মধুসূদনের আলোচনায় আমরা বলেছি, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে তাঁর আত্মকথা গীতিকাব্যের আকারে বাঙালী-জীবনের মহাকাব্য। রবীন্দ্রনাথের আত্মকথা গীতিকাব্যের আকারে মানব-জীবনের মহাসংগীত। মর্ত্যের মধুরতম আসক্তি এবং আকাশের নির্মলতম মুক্তির কড়ি ও কোমলেই সেই মহাসংগীত বিরচিত। বিশুদ্ধ সনেটের সূক্ষ্ম যন্ত্রে একবারই মাত্র সে সংগীত বেজেছিল। তার পরে সুদীর্ঘ জীবনে রবীন্দ্রনাথ কখনও বিচিত্র যন্ত্র-সহযোগে, কখনও বা যন্ত্র ফেলে শুধু মধুমাখা কণ্ঠে, তাঁর প্রাণের সংগীত বিচিত্র সুরে গেয়েছেন, কিন্তু পেত্রার্কার 'small lute'টি তিনি আর দ্বিতীয়বার হাতে তুলে নেন নি।

মধুসূদনের মহাকাব্য আর রবীন্দ্রনাথের মহাসংগীত রূপে ও রসে, সুরে ও স্বাদে স্বতন্ত্র। বীর-রসই মধুসূদনের মহাকাব্যের অঙ্গী রস; কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যলোকের অঙ্গী রস হল শান্ত রস। এই পার্থক্যের হেতু-বিশ্লেষণে উভয়ের চেতনার উৎসমূলে পৌঁছলে দেখা যাবে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজন্মের পরে উভয় কবির চেতনায় প্রাচীন ভারতের পুনরুজ্জীবনের স্তরভেদের ফলেই এই পার্থক্য দেখা দিয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির মুখ্যত তিনটি স্তর: বৈদিক, বৌদ্ধ ও মহাভারতীয়। বৈদিক স্তরের জীবন-সাধনার বাণী সংকলিত হয়েছে উপনিষদের মধ্যে। ভারতীয় নবজন্মের আদিপুরুষ রামমোহনের প্রজ্ঞা-সাধনায় বৈদিক স্তরেরই উজ্জীবন হয়েছিল, ঔপনিষদ-তত্ত্বসমন্বিত 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্য

সত্যধর্ম'ই ছিল তাঁর নবধর্মের মূলে। রামমোহন-শিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সন্তান-হিসাবে রবীন্দ্রনাথের মানসক্ষেত্রে উপনিষদের বীজই উপ্ত হয়েছিল। মধুসূদন তাঁর নিজের সাধনায় প্রাচীন ভারত ও গ্রীসের মহাকাব্যের জীবনচেতনাকে উজ্জীবিত করেছিলেন। স্বভাবতই যোদ্ধৃবেশী বীরপুরুষের চেতনাই তাঁর মধ্যে পরিস্ফুরিত। প্রাণান্ত সংগ্রামে অন্তহীন উৎসাহই তাঁর বীররসাশ্রিত কাব্যের মর্মকথা। তাঁর কাব্যে তাই ক্ষত্রিয়ের ওজোগুণই প্রাধান্য পেয়েছে। রবীন্দ্র-মানসে উপনিষদের ঋষির চেতনা অনুস্যূত। ব্রাহ্মণের সত্ত্বগুণই সেখানে প্রধান। এ জন্যেই মধু-সাহিত্যের অঙ্গী রস বীর রস, আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের অঙ্গী রস শান্ত রস। একজনের কাব্যে ক্ষত্রিয়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠের প্রচণ্ড শক্তি, আর একজনের কাব্যে ব্রাহ্মণের সমাহিত চিত্তের সংযত সৌন্দর্য। তা ছাড়া, মধুসূদন বাংলার বাক্স্পন্দ ও ছন্দঃস্পন্দের অনুশীলনের যে সূত্রপাত করেন, রবীন্দ্রনাথে তারই সার্থকতম পরিণতি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কলাকৃতি মধুসূদনের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম ও সুকুমার। রবীন্দ্রনাথের বাগ্‌দেবী অনেক বেশী লাবণ্যময়ী। রবীন্দ্রনাথের সনেটও বাহ্য এবং আভ্যন্তর উভয় সঙ্গতির দিক দিয়েই সূক্ষ্ম সৌকুমার্যের পরাকাষ্ঠা।

স্বভাবতই আমরা সনেটের আভ্যন্তর সঙ্গতির মূলতত্ত্ব অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের বন্ধন-রচন ও বন্ধন-মোচনের যে রস-রহস্যকে সনেট রচনায় সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছি, রবীন্দ্রনাথের সনেট-আলোচনার প্রারম্ভেই সে প্রসঙ্গ এসে পড়ে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির স্বরূপ কি এবং তার উৎসই বা কোথায় ?

রবীন্দ্রনাথের জন্ম উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং সুদীর্ঘ একাশী বৎসরের জীবন-পরিক্রমা শেষ করে তিনি

পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে। এ দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবেই আধুনিক পৃথিবীর মানুষ, মধুসূদনের চেয়েও অনেক বেশি আধুনিক। অথচ তাঁর মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছে অন্তত তিন সহস্র বৎসর পূর্বের প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনবাসী ঋষির সাধনা। আধুনিক পৃথিবীর মানুষ মৃৎসত্ত মানুষ, প্রাচীন তপোবনের ঋষি চিৎসত্ত মানুষ। প্রাচীনে ও আধুনিকে মিলে রবীন্দ্র-মানসে এই চিৎসত্ত ও মৃৎসত্ত দুটি মানুষ বাসা বেঁধেছে। একজন ঋষি, আর একজন রসিক ; একজন বিবাগী, আর একজন বিষয়ী ; একজন জীবধর্মা, আর একজন বিশ্বধর্মা। কখনও জীবধর্মা পুরুষের মৃন্ময় আসক্তিই জয়ী হয়েছে, কখনো জয়ী হয়েছে বিশ্বধর্মা পুরুষের চিন্ময় মুমুক্ষা। রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তায় এই জীবলীলা ও বিশ্বলীলারই দ্বন্দ্ব ও সংগতি। রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও তারই বিচিত্র প্রকাশ বিভিন্ন যুগে বিচিত্র রূপে ঘটেছে। কবি তাঁর মানস-দ্বন্দ্বকে বিভিন্ন সময়ে যে সব প্রতীক, উপমা বা রূপকল্পের সাহায্যে প্রকাশ করেছেন আমরা তা থেকে পাঁচটি উদাহরণ গ্রহণ করব :

প্রথম : নিষ্ফলতা ও ঔদাস্য

'আমার মধ্যে দুটো বিপরীত শক্তির দ্বন্দ্ব চলচে। একটা আমাকে সর্বদা বিশ্রাম এবং পরিসমাপ্তির দিকে আহ্বান করছে, আর একটা আমাকে কিছুতে বিশ্রাম করতে দিচ্চে না। আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত-প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করচে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি আর একদিকে চিন্তার প্রতি

আকর্ষণ। এইজন্যে সবসুদ্ধ জড়িয়ে একটা নিষ্ফলতা এবং ঔদাস্য।'[১]

দ্বিতীয় : প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনা

'আমি সত্য বুঝতে পারি নে আমার মনে সুখদুঃখ বিরহ-মিলনপূর্ণ ভালবাসা প্রবল, না সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা প্রবল। আমার বোধ হয় সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক জাতীয়, উদাসীন গৃহত্যাগী; নিরাকারের অভিমুখী। আর ভালবাসাটা লৌকিক জাতীয় সাকারে জড়িত। একটা হচ্চে শেলির Skylark আর একটা হচ্চে ওয়ার্ডস্বার্থের Skylark। একজন অনন্ত সুধা প্রার্থনা করচে, আর একজন অনন্ত সুধা দান করচে। সুতরাং স্বভাবতই একজন সম্পূর্ণতার আর একজন অসম্পূর্ণতার অভিমুখী। যে ভালবাসে সে অভাব-দুঃখ-পীড়িত অসম্পূর্ণ মানুষকে ভালবাসে, সুতরাং তার অগাধ ক্ষমা সহিষ্ণুতা প্রেমের আবশ্যক—আর যে সৌন্দর্যব্যাকুল, সে পরিপূর্ণতার প্রয়াসী, তার অনন্ত তৃষ্ণা। মানুষের মধ্যে দুই অংশই আছে, অপূর্ণ এবং পূর্ণ—যে যেটা অধিক ক'রে অনুভব করে।'[২]

তৃতীয় : সীমা ও অসীম

'আমার ত মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটিমাত্র পালা। সে-পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে, সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।'[৩]

চতুর্থ : খাঁচার পাখি ও বনের পাখি

'আমাদের প্রকৃতির মধ্যে একটি বন্ধন-অসহিষ্ণু স্বেচ্ছাবিহার-প্রিয় পুরুষ এবং একটি গৃহবাসিনী অবরুদ্ধ রমণী দৃঢ় অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া আছে। একজন জগতের সমস্ত নূতন নূতন

দেশ, ঘটনা এবং অবস্থার মধ্যে নব নব রসাস্বাদ করিয়া আপন অমর শক্তিকে বিচিত্র বিপুল ভাবে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য সর্বদা ব্যাকুল,. আর একজন শতসহস্র অভ্যাসে বন্ধনে প্রথায় প্রচ্ছন্ন এবং পরিবেষ্টিত। একজন বাহিরের দিকে লইয়া যায়, আর একজন গৃহের দিকে টানে। একজন বনের পাখি, আর একজন খাঁচার পাখি।'[৪]

এই বনের পাখি ও খাঁচার পাখির কল্পনাই 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে 'নীড় ও আকাশে'র বদলে 'ঘর ও পথে'র উপমানকে আশ্রয় করেছে। কবি বলেছেন :

'পশুরা যদি বিচারক হোত মানুষকে বলত জন্ম-পাগল।'

* * *

'সকল জীবের মধ্যে মানুষই কেবল অমিতাচারী। তাকে পেতে হবে অমিত, তাকে দিতে হবে অমিত। কেননা তার মধ্যে আছে অমিত মানব। সেই অমিত মানব সুখের কাঙাল নয়, দুঃখভীরু নয়। সেই অমিত মানব আরামের দ্বার ভেঙে কেবলি মানুষকে বের করে নিয়ে চলেছে কঠোর অধ্যবসায়ে।'

* * *

'পশু বলচে সহজ ধর্মের পথে ভোগ করো, মানুষ বলচে, মানবধর্মের দিকে তপস্যা করো। যাদের মন মন্থর, যারা বলে, যা আছে তাই ভালো, যা হয়ে গেছে তাই শ্রেষ্ঠ, তারা রইল জন্তু-ধর্মের স্থাবর বেড়াটার মধ্যে, তারা মুক্ত নয়, তারা স্বভাব থেকে ভ্রষ্ট।'

* * *

'মানুষ যথার্থই অনাগারিক। জন্তুরা পেয়েচে বাসা, মানুষ পেয়েচে পথ। মানুষের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক।'[৫]

'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থ থেকে সংকলিত এই উদ্ধৃতিগুলি বিশ্লেষণ করলে সহজেই বুঝতে পারা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষের পথিকসত্তাকেই তার মানবসত্তা বলেছেন। 'মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক।' কবি রামমোহনকে বলেছিলেন 'ভারতপথিক'। অবশ্য রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত শতাব্দীব্যাপী জীবনসাধনায় বাংলার ভারতপথিক সংস্কৃতি বিশ্ব-পথিক হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথকে তাই ভারতপথিক না বলে বিশ্বপথিক বলাই সমীচীন। কোন বিশেষ দেশ বা বিশেষ কাল নয়, কোন বিশেষ তন্ত্র বা বিশেষ মন্ত্র নয়,—দেশে-দেশে কালে-কালে উদ্‌যাপিত মানবজীবনের সার্বভৌম সাধনাই আলো ফেলেছে রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে। সেই বিচিত্র আলোকের সহস্র রশ্মিতেই রবীন্দ্রনাথের মানসকমল উন্মীলিত। তাঁর কাব্যলোকে সৌন্দর্যের যে ইন্দ্রধনুচ্ছটা দেখতে পাওয়া যায়—তারও মূলে রয়েছে সর্বযুগের মানব-সাধকগণের প্রাণের আলো। আর তাঁর মানসকমলের মর্মকোষে যে প্রেমের অমৃত দিনে দিনে সঞ্চিত হয়েছে, সর্বমানবের প্রাণের মধু আহরণ করেই তার অমিত মাধুর্য। তাই উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাংলার মাটিতে মহাকাল যাঁর ঘর বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি সর্বদেশ ও সর্বকালের মানবসাধনতীর্থের পথে পথে মাধুকরী-বৃত্ত পরিব্রাজকে রূপান্তরিত হলেন।

পঞ্চম : জীবভাব ও বিশ্বভাব

জীবনের পথে এই যাত্রার তিনটি স্তর। 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষের জন্মভূমি তিনটি', অর্থাৎ মানুষ ত্রিজ। তার প্রথম জন্ম পৃথিবীতে, পৃথিবীর সর্বত্রই তার বাসস্থান। তার দ্বিতীয় জন্ম স্মৃতিলোকে। মানব-সভ্যতার সমস্ত অতীত সাধনাকে সংহরণ করে মহাকাল যে স্মৃতিলোক

রচনা করেছেন সেখানে জন্মগ্রহণ করে মানুষ সার্বভৌম মানব-সাধনার উত্তরাধিকারী। সেখানে সকল মানুষের সঙ্গে তার মিলন। তার এই দ্বিতীয় জন্ম নিখিল ইতিহাসে। মানুষের তৃতীয় জন্ম আত্মিক লোকে; তাকে বলা যেতে পারে সর্বমানব-চিত্তের মহাদেশ।[৬] কিন্তু ব্যক্তিচেতনা থেকে এই বিশ্বচেতনায় যাত্রা দেশকালের যাত্রা নয়, তা আত্মিক লোকের অভিসার। মানুষের অন্তরেই যে নিত্যপ্রকাশপরায়ণ অভিব্যক্তির প্রেরণা রয়েছে—বার্গসঁ যাকে বলেছেন 'Elan Vital'—সেই প্রেরণাই, রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণে, মানুষকে অহং থেকে আত্মায়, জৈবসত্তা থেকে মানবসত্তায়, ব্যক্তিসত্য থেকে বিশ্বসত্যে পরিচালিত করে নিয়ে চলেছে। তাই ভুললে চলবে না যে, সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্বমানব মনের মহাদেশ সৃষ্ট হয় নি, ব্যক্তিমনই অভিব্যক্তি-নিয়মে বিশ্বমনে বিকশিত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিসত্তা থেকে এই বিশ্বসত্তায় বিকশিত হয়ে ওঠাই মানুষের তৃতীয় জন্ম। আত্মিক লোকে মানুষের এই জীবনায়ন মানুষের অন্তরে-অন্তরেই ঘটে থাকে। অহং থেকে আত্মায়, ছোট-'আমি' থেকে বড়-'আমি'তে, ব্যক্তি থেকে বিশ্বে, মানবচেতনার এই অভিসার বাইরের দেশে-কালে বিচারণীয় নয়। কাজেই মানুষের পথিক-সত্তার লীলা তার ত্রিজন্মের প্রথম দুটি স্তরে যথাক্রমে নিখিল বিশ্বে ও নিখিল ইতিহাসে অর্থাৎ দেশে ও কালে পরিক্রমণশীল হলেও তৃতীয় স্তরে সে লীলা তার আত্মিক লোকে। সেখানে যাত্রার অর্থ আত্মোপলব্ধি, আত্মবিকাশ ও আত্মব্যাপ্তি। ব্যক্তিপরিচ্ছেদের প্রাচীর ভেঙে, গীতায় যাকে বলা হয়েছে 'পৌরুষং নৃষু',—মানুষের সেই সনাতন ও পুনর্নব পৌরুষে বা মনুষ্যত্বে বিকশিত হয়ে ওঠাই জীবভাব থেকে বিশ্বভাবে পৌছনো। রবীন্দ্রসত্তায় আমি যাকে মৃৎসত্ত ও চিৎসত্ত পুরুষের কথা বলেছি, কবির নিজের ভাষায় তাকে জীবভাব ও বিশ্বভাব বলা যেতে পারে।

২

রবীন্দ্র-জীবনের সর্বস্তরে, বহির্লোকে ও অন্তর্লোকে, এই ছোট-আমি ও বড়-আমি, এই সীমা ও অসীম, এই ব্যক্তি ও বিশ্ব, এই খাঁচার পাখি ও বনের পাখি, এই ঘর ও পথ, এই জীবভাব ও বিশ্বভাবের বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির বিচিত্র লীলাই কাব্যরসে বিলসিত হয়েছে। কবির অশীতিবর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ জীবন মূলত পঞ্চপর্বে বিভাজ্য। প্রথম পর্বে জোড়াসাঁকোর 'হৃদয়-অরণ্যে'র রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয়ে মানুষের মহামোহময় সংসার ছেড়ে নির্জন প্রকৃতির শান্তিলোকে পলাতক—গাজিপুরের রবীন্দ্রনাথ, তৃতীয়ে পদ্মাতীরে প্রকৃতি ও মানুষের সংগমতীর্থে সৌন্দর্যচারী পরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথ, চতুর্থে শান্তিনিকেতনের তপোবনে ঘর ও পথের মধ্যবর্তী 'ঘরেও নহে পারেও নহে'র রবীন্দ্রনাথ, এবং পঞ্চমে দ্যুলোক-ভূলোকব্যাপী মহাবিশ্বচেতনায় প্রবুদ্ধ বিশ্বভুবনের রবীন্দ্রনাথ। এই পঞ্চপর্বাধ্যায়ী রবীন্দ্র-জীবনের প্রতিপর্বে কবিমানসে আসক্তি ও মুক্তির লীলারস বিচিত্ররূপেই আস্বাদিত হয়েছে। আমরা এখানে শুধু কবিজীবনের পঞ্চম পর্বের দিকে একবারের জন্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে হংসবলাকার ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত পাখায় ভর করে এই পঞ্চম পর্বের মূলসুর কবিমানসে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কবি বললেন :

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।[১]
শুনিলাম আপন অন্তরে

অসংখ্য পাখির সাথে
দিনে রাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।'

বলাই বাহুল্য, এখানে উপনিষদের 'চরৈবেতি' মন্ত্রের সঙ্গে বার্গসঁর সৃজনাত্মিকা বিবর্তনী-শক্তি বা Creative Evolution-এর বিশ্ব-গতিলীলারই তত্ত্ব কবিচিত্তের ধ্যান হয়ে উঠেছে। যে-মন্ত্রে পর্বত বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ হতে চায়, তরুশ্রেণী চায় পাখা মেলে চকিতে দিশাহারা হতে, সেই মন্ত্রকেই কবি আপন অন্তরে অনুভব করেছেন। এই বিশ্বের অসংখ্য পাখির সঙ্গে তাঁরও চিত্তের বাসাছাড়া পাখিটি আলো-অন্ধকারের অন্তহীন নিরুদ্দেশযাত্রায় 'কোন্ পার হতে কোন্ পারে' ছুটে চলেছে।

'বলাকা'র এই নভঃপ্লাবী গতিবাদের পরেই দেখি 'পূরবী'তে ধরণীর এক কোণে ছোট্ট একটি নীড়ের জন্যে কবিমানসের আকুল আকুতি :

বহু দিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে,
ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা
করেছিনু আশা।'

'বলাকা'র কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হল বন্ধনবিহীন মানবাত্মার নিত্য-মুক্তির জয়ধ্বনি :

জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
স্মরণের গ্রন্থি টুটে
সে যে যায় ছুটে
বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।'৮

'বলাকা'র এই মুক্তিতত্ত্ব পরবর্তী কাব্যগ্রন্থেই ইহজীবনের মহামোহময় পরমাসক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে। জীবনের অপরাহ্ললগ্নে প্রাণপ্রবাহিণী যখন বর্ষাশেষের নির্ঝরিণীর মত শীর্ণ হয়ে আসছে বলে কবি অনুভব করছেন, তখন তিনি এই পৃথিবীর কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনা-সংগমের লীলারসকেই পরম মূল্য দিয়ে বলছেন :

তাই যারা আজ রইল পাশে এই জীবনের অপরাহ্নবেলায়
তাদের হাতে হাত দিয়ে তুই গান গেয়ে নে থাকতে দিনের আলো,—
বলে নে ভাই, এই যা দেখা, এই যা ছোঁওয়া, এই ভালো, এই ভালো।
এই ভালো আজ এ সংগমে কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।
এই ভালো রে, প্রাণের রঙ্গে এই আসঙ্গ সকল অঙ্গে মনে
পুণ্য ধরার ধুলো মাটি ফল হাওয়া জল তৃণ-তরুর সনে।

রবীন্দ্র-মানসে এই আসক্তি ও মুক্তির বিপরীত আকর্ষণ, তাঁর 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের পরিভাষায় অহং ও আত্মার জীবভাব ও বিশ্বভাবের বিপরীত লীলা, কবি-জীবনের পঞ্চম পর্বে, একেবারে শেষ স্তরে, মর্ত্য থেকে বিদায়ের আসন্ন গোধূলিলগ্নে কবি-চেতনার অন্তিম দীপ্তির আলোকে আরও ভাস্বর আরও হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছে। সেখানে দেখি কবির 'আমি', কবির বিশ্বভাব অসংশয় বিশ্বাসে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করছে :

যে চৈতন্যজ্যোতি
প্রদীপ্ত রয়েছে মোর অন্তরগগনে
নহে আকস্মিক বন্দী প্রাণের সংকীর্ণ সীমানায়
আদি যার শূন্যময়, অন্তে যার মৃত্যু নিরর্থক,
মাঝখানে কিছুক্ষণ
যাহা-কিছু আছে তার অর্থ যাহা করে উদ্ভাসিত।
এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ-অমৃতরূপে—
আজি প্রভাতের জাগরণে
এ বাণী উঠিল বাজি মর্মে মর্মে মোর,
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তারা
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।
[রোগশয্যায়, ২৮ ॥

হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত। [জন্মদিনে, ২৩।

পক্ষান্তরে কবির 'অহং', অর্থাৎ কবিমানসের 'জীবভাব' কিন্তু 'আত্মার এই মর্ত্যনিকেতন' কিছুতেই ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নয়। জীবনগোধূলিতে যখন ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে বিকল হয়ে আসছে, চক্ষুকর্ণের শক্তি আসছে হ্রাস হয়ে, যখন রূপ-রস-শব্দ-গন্ধময়ী এই পৃথিবীর লীলারস থেকে কবি তিলে তিলে বঞ্চিত হচ্ছেন, তখন শিশুর মত অভিমান-ভরে তাঁর কণ্ঠে নালিশের ভাষা ফুটে উঠেছে :

হে বসুধা,
নিত্য নিত্য বুঝায়ে দিতেছ মোরে,—যে তৃষ্ণা, যে ক্ষুধা
তোমার সংসার-রথে সহস্রের সাথে বাঁধি মোরে
টানায়েছে রাত্রিদিন স্থূল সূক্ষ্ম নানাবিধ ডোরে,
নানা দিকে নানা পথে, আজ তার অর্থ গেল কমে
ছুটির গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে। তাই ক্রমে
ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা, চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো ; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য-পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ ;
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ।

[সেঁজুতি, জন্মদিন

যৌবনলগ্নে সর্বানুভূতির কবি 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে 'বসুন্ধরা' কবিতায় এই মর্ত্যজীবনরসপানের যে মহাপিপাসাকে অন্তরে লালন করেছিলেন, প্রৌঢ় জীবনের অনাসক্ত দৃষ্টিতে কবি বাসনার সেই অত্যাসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে বুঝতে পেরেছেন, জীবপালিনী এই মহাধরিত্রী তার খণ্ডকালের যে ছোট ছোট পিঞ্জরে আমাদের পুষেছে, 'তারই মধ্যে সব খেলার সীমা, সব কীর্তির অবসান' [পত্রপুট, পৃথিবী]। তবু মৃত্যুর পদধ্বনি শুনে অসহায় কাতর প্রার্থনায়, ভিখারীর মত কাঙাল কবিকণ্ঠে সকরুণ আর্তনাদ ফুটে উঠেছে :

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন করো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মতো

[প্রান্তিক, ৬

প্রাণের প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে সম্রাটের মত যিনি সুদীর্ঘকাল এই মর্ত্যলীলা উপভোগ করেছেন তাঁর এই অন্তিম কাঙালপনা মর্ত্যজীবনের প্রতি কবিমানসের অনিঃশেষ আসক্তিরই বাণীরূপ।

এই মর্ত্যনিকেতনের প্রতি আসক্তি ও মুক্তির এই বিপরীত-লীলা, কেন্দ্রানুগ ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ রবীন্দ্রমানসে নিত্যবিরাজমান ছিল। কিন্তু কবির কাব্যলোকে একই কবিতার মধ্যে এই বিপরীত লীলার দ্বন্দ্ব কদাচিৎ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রজীবনের নানা রঙের দিনগুলি কবিমানসের বিচিত্র রশ্মিরাগে অনুরঞ্জিত। ঋষিকবির জ্ঞানে ও প্রেমে, বাসনায় ও বৈরাগ্যে, ব্যক্তি-পরিচ্ছেদ ও বিশ্বাত্মবোধে চেতনার বিচিত্র স্তরে নানা রসাশ্রিত নানা ভাবের লীলা। কখনও তাদের বিপরীত-মুখিতা বিস্ময়কর মানসদ্বন্দ্বের প্রতীক হয়ে ফুটে ওঠে, কখনও তারা মহত্তর সংগতিময় জীবনের 'সিম্‌ফনি' বা ঐকতান সংগীতের স্বতন্ত্রবাদী সুর হয়ে বাজতে থাকে। রবীন্দ্র-গীতিকাব্যসাধনায় মানব-জীবনের মহাসংগীত এইভাবেই বহু বিপরীতকোটিক প্রাণ-চেতনার বিচিত্র সমন্বয়ে সার্থক সম্পূর্ণতা পেয়েছে।

কিন্তু কবিমানসের এই মধুরতম আসক্তি এবং উদারতম মুক্তির রসরহস্য তাঁর সনেট-দেহে যে লাবণ্য ও ব্যঞ্জনা পেয়েছে অন্যত্র তা পায় নি। রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সনেট অল্পই লিখেছেন। কিন্তু তাঁর জীবনের উত্তীর্ণ-কৈশোরের প্রথম ঘুমভাঙা প্রভাতে যখন নতুনফোটা বেলফুলের মালার গন্ধে ভোরের স্বপ্ন ছিল বিহ্বল, তখন কবিকিশোর প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন আধুনিক পৃথিবীর আদিকবি পেত্রার্কার কাছে। সেদিনকার 'তরুণ যৌবনের বাউল' যে যন্ত্রে তাঁর সুর বেঁধেছিলেন তা হল সনেটরূপী পেত্রার্কারই 'small lute'। কবি তাঁর 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থে তাঁর সেই প্রথম সনেটগুচ্ছকে বাংলার রসিক-সমাজের

হাতে উপহার দিয়েছেন। সেই সনেটগুচ্ছের আদিতে একটি কবিতা আছে, তাকে বলা যেতে পারে সনেট-পরিচিতি। সনেট সম্পর্কে একাধিক বিদেশী কবি একাধিক সনেট রচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথের সনেটটিও তাদের একই পংক্তিতে আসন পাওয়ার যোগ্য। সনেটকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ছোটোফুল'। রবীন্দ্র-গীতিকাব্য-মালঞ্চে এই 'ছোটোফুল'টি অবজ্ঞাত হয়ে আছে, তাই তার পূর্ণ পরিচয় প্রয়োজন :

আমি শুধু মালা গাঁথি ছোটো ছোটো ফুলে,
সে ফুল শুকায়ে যায় কথায় কথায়,
তাই যদি, তাই হোক, দুঃখ নাহি তায়,
তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।
যারা থাকে অন্ধকারে, পাষাণ-কারায়,
আমার এ মালা যদি লহে গলে তুলে,
নিমেষের তরে তারা যদি সুখ পায়,
নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথা যদি যায় ভুলে।
ক্ষুদ্র ফুল, আপনার সৌরভের সনে
নিয়ে আসে স্বাধীনতা, গভীর আশ্বাস—
মনে আনে রবিকর নিমেষ-স্বপনে,
মনে আনে সমুদ্রের উদার বাতাস।
ক্ষুদ্র ফুল দেখে যদি কারো পড়ে মনে
বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।

বলাই বাহুল্য, কলাকৃতির দিক দিয়ে এটি একটি বিশুদ্ধ পেত্রার্কান সনেট। ওর চতুর্দশ চরণে মাত্র চারটি মিলের লীলা। অষ্টক-বন্ধে আছে দুই মিলের যুগল-চতুষ্ক ; প্রথমটি সংবৃত, দ্বিতীয়টি বিবৃত। ষট্‌ক বন্ধও বিবৃত ত্রিকযুগলের বন্ধনহীন গ্রন্থিতে গ্রথিত। আবর্তন-সন্ধিতে ভার-সাম্য রক্ষা করে বিশেষ থেকে সামান্যের, ব্যক্তিসত্য থেকে বিশ্বসত্যের

ভাবব্যঞ্জনাও সার্থক হয়েছে। সনেটের ক্ষুদ্র দেহে 'বৃহৎ জগৎ আর বৃহৎ আকাশে'র মুক্তি-রচনার ইঙ্গিতই এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রমানসও সেদিন বাসনার পাষাণ-কারাগারের অন্ধকারে নিষ্ঠুর বন্ধন-ব্যথায় জর্জরিত। সনেটের মধ্যেই সেদিনকার তরুণ কবিমানসের নিগূঢ় বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির বাসনা অভিলষিত শিল্পমুক্তি লাভ করেছে। একটিমাত্র উদাহরণের সাহায্যেই আমাদের প্রতিপাদ্য প্রমাণের চেষ্টা করব। 'কড়ি ও কোমলে'র 'পূর্ণমিলন' সনেটটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক :

নিশিদিন কাঁদি সখী মিলনের তরে,
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।
লও লও বেঁধে লও কেড়ে লও মোরে,
লও লজ্জা লও বস্ত্র লও আবরণ।
এ তরুণ তনুখানি লহ চুরি ক'রে,
আঁখি হতে লও ঘুম, ঘুমের স্বপন।
জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হ'রে
অনন্ত কালের মোর জীবন-মরণ।
বিজন বিশ্বের মাঝে, মিলন-শ্মশানে,
নির্বাপিত সূর্যালোক লুপ্ত চরাচর,
লাজমুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।
এ কি দুরাশার স্বপ্ন হায় গো ঈশ্বর,
তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে।

রসিক পাঠক আশা করি স্বীকার করবেন, এটিও একটি বিশুদ্ধ সনেট। এর অষ্টক-বন্ধ দুটি মিল-যুক্ত দুটি বিবৃত চতুষ্ক দিয়ে গড়া। বিবৃত চতুষ্ক এখানে যুগলের চির-অতৃপ্ত মিলনলীলারই প্রতীক হয়ে উঠেছে। সংবৃত চতুষ্কে মিলন দৃঢ়পিনদ্ধ হত বটে, কিন্তু

অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা লুপ্ত হয়ে যেত। ষট্‌ক-বন্ধের—তপত = পপত—এই মিলবিন্যাসও ভাবমোক্ষ-রচনায় বিশেষ তাৎপর্যবান হয়ে উঠেছে। 'বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন-শ্মশানে' দুটি পিপাসার্ত দেহ-মন-প্রাণের পূর্ণ-মিলনের ব্যর্থ বাসনা পূর্ণতা পেয়েছে ঈশ্বরাসক্তির অসীম মুক্তিলোকে। তাই ষট্‌ক-বন্ধে আদি-চরণের সঙ্গে অন্ত্য-চরণের মিলই এখানে সার্থক: 'তোমা ছাড়া এ মিলন আছে কোন্‌খানে।'

ভাবের দিক দিয়ে এবার সনেটটিকে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দেহের পাত্রে প্রাণের অমৃতপ্রাসন, মরজীবনে মর্ত্যপৃথিবীর আসক্তিই এ কবিতার আলম্বন। রবীন্দ্রকাব্যলোকের অন্য কোনও পর্বে যা আর কখনও পাওয়া যাবে না, ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মত দেহমিলনের এই অত্যুগ্র বাসনা, মিথুনলীলার এই নিবিড়তম আশ্লেষস্বপ্ন এই সনেটের অষ্টক-বন্ধে মূর্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু ষট্‌ক-বন্ধে এই মর্ত্য-বন্ধনের চরম ব্যর্থতা চূড়ান্ত হাহাকারে পর্যবসিত। তথাপি হাহাকারই এর শেষ কথা নয়। মর্ত্যরতি এখানে অমর্ত্যপ্রীতিরই সহোদরা। রবীন্দ্রমানসের মৃৎসত্ত্ব পুরুষ এবং চিৎসত্ত্ব পুরুষের এমন ঘনিষ্ঠ ও একাত্ম প্রকাশ আর কোথাও পরিদৃশ্যমান হয় নি। মর্ত্যের মধুরতম আসক্তিই এখানে আকাশের নির্মলতম মুক্তির সংকেত বহন করে এনেছে।

৩

দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্র-সাহিত্যে বিশুদ্ধ সনেটের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। 'কড়ি ও কোমলে' সংকলিত রবীন্দ্র-সনেটের প্রথম ফসল সংখ্যায় ষাটের কাছাকাছি হলেও সেখানেই কৌলীন্যচ্যুতির লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তারপর সারাজীবনে রবীন্দ্রনাথ প্রায় তিন

শত চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু পেত্রার্কা-গোত্রের বিশুদ্ধ সনেট-রচনায় তিনি আর কখনোই উৎসাহ প্রকাশ করেন নি। তথাপি রবীন্দ্রনাথের সনেটকল্প রচনাবলী—কবির ভাষায় কাব্যমালঞ্চের এই 'ছোটো ফুল'গুলির প্রতি স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে। রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে রবীন্দ্রকাব্যের যে স্বাদ পাওয়া যাবে অন্যত্র তা পাওয়া যাবে না। তাই প্রথমেই আমরা রবীন্দ্র-রচিত সনেট ও সনেটকল্প রচনাবলীর একটি সম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে সংকলন করলাম :

কড়ি ও কোমল ॥ প্রাণ, হৃদয়ের ভাষা, ছোটোফুল, যৌবনস্বপ্ন, ক্ষণিক মিলন, গীতোচ্ছ্বাস, স্তন [১, ২], চুম্বন, বিবসনা, বাহু, চরণ, হৃদয়-আকাশ, অঞ্চলের বাতাস, দেহের মিলন, তনু, স্মৃতি, হৃদয়-আসন, কল্পনার সাথী, হাসি, নিদ্রিতার চিত্র, কল্পনা-মধুপ, পূর্ণ মিলন, শ্রান্তি, বন্দী, কেন, মোহ, পবিত্র প্রেম, পবিত্র জীবন, মরীচিকা, গান রচনা, সন্ধ্যার বিদায়, রাত্রি, বৈতরণী, মানবহৃদয়ের বাসনা, সিন্ধুগর্ভ, ক্ষুদ্র অনন্ত, অস্তমান রবি, অস্তাচলের পরপারে, প্রত্যাশা, স্বপ্নরুদ্ধ, অক্ষমতা, জাগিবার চেষ্টা, কবির অহংকার, বিজনে, সিন্ধুতীরে, সত্য [১, ২], আত্মাভিমান, আত্ম-অপমান, ক্ষুদ্র আমি, প্রার্থনা, বাসনার ফাঁদ, চিরদিন [৪], শেষকথা ॥ মোট সংখ্যা ৫৮ ॥

মানসী ॥ তবু, নিষ্ফল প্রয়াস, হৃদয়ের ধন, নিভৃত আশ্রম ॥ ৪ ॥

সোনার তরী ॥ সোনার বাঁধন, মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ ॥ ৮ ॥

চিত্রা ॥ মরীচিকা, প্রস্তরমূর্তি, প্রৌঢ়, ধূলি ॥ ৪ ॥

চৈতালি ॥ দেবতার বিদায়, পুণ্যের হিসাব, বৈরাগ্য, সামান্য লোক, প্রভাত, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, বনে ও রাজ্যে, সভ্যতার প্রতি, বন, তপোবন, প্রাচীন ভারত, ঋতুসংহার, মেঘদূত, দিদি, পরিচয়, অনন্ত পথে, ক্ষণমিলন, প্রেম, পুঁটু, হৃদয়ধর্ম, মিলনদৃশ্য, দুই বন্ধু, সঙ্গী, সতী, স্নেহদৃশ্য, করুণা, স্নেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, অভিমান, পরবেশ, সমাপ্তি, ধরাতল, তত্ত্ব ও সৌন্দর্য, মানসী, নারী, প্রিয়া, ধ্যান, মৌন, অসময়, শেষকথা, বর্ষশেষ, অভয়, অনাবৃষ্টি, অজ্ঞাত

বিশ্ব, ভয়ের দুরাশা, ভক্তের প্রতি, নদীযাত্রা, মৃত্যুমাধুরী, স্মৃতি, বিলয়, প্রথম চুম্বন, শেষ চুম্বন, যাত্রী, তৃণ, ঐশ্বর্য, স্বার্থ, প্রেয়সী, শান্তিমন্ত্র, কালিদাসের প্রতি, কুমারসম্ভব গান, মানসলোক, কাব্য, ইছামতী নদী, শুশ্রূষা, আশীষ গ্রহণ, বিদায় ॥ ৬৮ ॥

কল্পনা ॥ আশা, অনবচ্ছিন্ন আমি ॥ ২ ॥

নৈবেদ্য ॥ ২২-৯৯ সংখ্যক কবিতাগুচ্ছ ॥ ৭৮ ॥

স্মরণ ॥ ৫-১২, ১৪-১৯, ২১-২৪ ॥ ১৮ ॥

উৎসর্গ ॥ ২২, ২৪-২৯, ৩২, ৪৬ [১, ২] ; সংযোজন ৪-১১ ॥ ১৮ ॥

গীতালি ॥ আশীর্বাদ, ১০৮ ॥ ২ ॥

পূরবী ॥ শেষ অর্ঘ্য, সমুদ্র [১, ২, ৩], অতিথি ॥ ৫ ॥

মহুয়া ॥ স্পর্ধা, রাখিপূর্ণিমা, আহ্বান, পুরাতন ॥ ৪ ॥

বনবাণী ॥ দেবদারু ॥ ১ ॥

পরিশেষ ॥ আশীর্বাদ, মুক্তি [১, ২], লেখা, আশীর্বাদ, প্রতীক্ষা, মিলন ; সংযোজন—লক্ষ্যশূন্য, পরিণয়মঙ্গল, উত্তিষ্ঠত নিবোধত ॥ ১০ ॥

প্রান্তিক ॥ ৩, ৫, ১৪, ১৬ ॥ ৪ ॥

সেঁজুতি ॥ প্রাণের দান ॥ ১ ॥

বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের বেশির ভাগ সনেটই সনেট নয়। কৌলীন্যহারা সে-সব সনেটকল্প কলাকৃতিকে ভঙ্গ-সনেট আখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। এর এক প্রান্তে আছে মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিশুদ্ধ সনেট। আর এক প্রান্তে আছে বিশুদ্ধ পয়ার-বন্ধে বিরচিত চতুর্দশচরণের বহু ছন্দ-চতুর্দশী। আকারে ও প্রকারে বিচিত্র এই কবিতাগুলি রবীন্দ্র-জীবনের বিভিন্ন ঋতুর ফসল। আর, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, রবীন্দ্রকাব্যলোকে ঋতুবদলের সঙ্গে রীতিবদলও হয়েছে বার বার। চতুর্দশচরণের কবিতা-রচনায়ও রীতিবদলের লক্ষণ যুগে যুগে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

স্বভাবতই সমালোচকের মনে প্রশ্ন জাগবে, সনেট-আলোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সনেট ও সনেটকল্প রচনাবলীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম

বিচারের মুখ্য সার্থকতা কোথায়? আমাদের মতে সে সার্থকতা চতুর্বিধ। প্রথম: রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশে ঘনপিনদ্ধ সনেট-কলাকৃতির পরিশীলনের তাৎপর্য নির্ণয়। দ্বিতীয় : রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনায় সনেটকল্প রচনাবলীর বিবর্তন ও বিচিত্র রূপায়ণ। তৃতীয় : সনেট-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-মানসলোকের অনাবিষ্কৃত মহলের রহস্যান্বেষণ। এবং, চতুর্থ : রবীন্দ্রমানসে বন্ধন ও বন্ধনমুক্তির স্বরূপসন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ স্বরূপত গীতিকাব্যের কবি। তিনি যেদিন গীতি-কাব্যকেই আত্মপ্রকাশের যোগ্যতম বাহন হিসাবে নিঃসংশয়রূপে আবিষ্কার করলেন, সেদিন 'বনফুল'-'কবিকাহিনী'র কাহিনীকাব্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর পেরিয়ে 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই যেন সত্যকার কবি-জীবনের সূত্রপাত হল। তাঁর কবিসত্তার প্রথম দিব্যোন্মেষ হল 'প্রভাত সংগীতে'র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। সে দিব্যোন্মেষের কথা কবি স্বয়ং তাঁর 'জীবনস্মৃতি' ও 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে একাধিকবার বলেছেন। তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি কবিজীবনের প্রথম প্রেরণা হিসাবে সার্থক। 'হৃদয়-অরণ্য' থেকে এখানেই জগদ্‌ব্রহ্মবাদে দীক্ষিত কবির বিশ্বলোকে নিষ্ক্রমণের প্রথম পদক্ষেপ পদচারণছন্দে গ্রথিত হয়েছে। কিন্তু গীতিকাব্য হিসাবে অতিকথনের অসংযমে কবিতাটি কলাকৃতির বিচারে তেমন সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। প্রথমে ওর দৈর্ঘ্য ছিল ২৭৬ পংক্তি। অনুপ্রাণিত তারুণ্যের প্রথম আনন্দোচ্ছ্বাসে দুর্দমনীয় ভাষার আবেগ সংযমের তটরেখা উল্লঙ্ঘন করে 'দুর্দাম দুর্বার' বেগে ছুটে চলেছে। ভাষার এই অসংযম সম্পর্কে কবি নিজেও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাই তিনি নির্মমচিত্তে বার বার কবিতাটির অঙ্গচ্ছেদ করেছেন। শেষ পর্যন্ত কবির অন্তিম পরিমার্জনে কবিতাটি মাত্র ৪৩ পংক্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। অতি-

কথনের এই অসংযমের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে রবীন্দ্র-জীবনে সনেটের কঠিন বন্ধনে আত্মপ্রকাশের পরিশীলন অত্যাবশ্যক ছিল। তারই ফলে এক দিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের গীতিকাব্যলক্ষ্মী মিতভাষিণী হয়েছেন, অন্য দিকে তেমনই বিচিত্র পর্যায়ের মিল-বন্ধন এবং স্তবক-গ্রন্থনের পথনির্দেশ পেয়েও কবির কলাকৃতি রূপদক্ষতায় সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠেছে। বাংলা ভাষার সূক্ষ্ম সংগীতের রহস্য সন্ধানের জন্যে যেমন রবীন্দ্রনাথের যৌবন-লগ্নে ব্রজবুলি ভাষার অনুসরণ অপরিহার্য ছিল, তেমনই বাংলা গীতিকাব্যের সংযমসুন্দর নানা কলাকৃতি-নির্মাণের জন্যেও কবির পক্ষে সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধবন্ধে আত্মপ্রকাশের অনুশীলন ছিল একান্তভাবেই প্রয়োজন।

৪

রবীন্দ্রনাথের শিল্পসাধনায় ভঙ্গ-সনেট বা সনেটকল্প রচনাবলীর বিবর্তন ও বিচিত্র রূপায়ণের ইতিহাসও রবীন্দ্রকাব্যরসিকের বিশেষ কৌতূহলের বিষয়। ইতালি থেকে পাওয়া বাণীকণ্ঠের এই ক্ষুদ্র রত্নটি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশে নবনবরূপে বিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তনের ফলে পেত্রার্কান সনেট কোন কোন ক্ষেত্রে রূপত ও স্বরূপত তার আসল সত্তাই হারিয়ে ফেলেছে। আমরা প্রথমেই বলেছি, মেলবন্ধনহীন গোত্রচ্যুত এই সনেটকল্প রচনাবলী কাব্য-হিসাবে মূল্যবান হতে পারে, কিন্তু সনেট-পদবাচ্য হবার যোগ্য নয়। ইংরেজি সাহিত্যের তথাকথিত শেক্‌স্‌পীয়রীয় বা ইংলণ্ডের 'স্বদেশী সনেট'কেও আমরা সনেট বলে স্বীকার করি নি। আমরা বলেছি, শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট, আর যাই হোক, সনেট নয়। রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গ-সনেটগুলিও সনেটের মর্যাদা দাবি করতে পারে না। কিন্তু

কাব্য এবং সনেটকল্প কলাকৃতির বিচিত্র বিবর্তন হিসাবে সহৃদয় রসিকের কাছে তারা বিচার-বিশ্লেষণের দাবি অনায়াসেই করতে পারে। রবীন্দ্রনাথ বাক্‌স্পন্দ এবং ছন্দঃস্পন্দের অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে আজীবন অক্লান্ত শিল্পী। বাংলা ছন্দ ও কলাকৃতির নব নব চিত্ররূপ ও গীতিধ্বনি আবিষ্কার রবীন্দ্র-বাণী-সাধনার একক মহাকীর্তি। ভঙ্গ-সনেট বা ছন্দচতুর্দশীর রূপনির্মাণেও রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সামান্য নয়। রবীন্দ্রনাথের হাতে সনেটের বিবর্তন কিভাবে ঘটেছে, বিভিন্ন যুগের কয়েকটি রচনা উদ্ধৃত করে আমরা এখানে অতি সংক্ষেপে তার ইঙ্গিত মাত্র করব। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের সনেটকল্প কলাকৃতির বিস্তৃত আলোচনা এবং কাব্য-বিচারের ক্ষেত্র এ নয়।

'কড়ি ও কোমলে'র সনেটরচনাতেই রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে পেত্রার্কার অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু, পূর্বেই বলা হয়েছে, সেখানেও তিনি গোত্রচ্যুত হয়েছেন। 'মানসী'র সনেট-চতুষ্টয় আসলে 'কড়ি ও কোমলে'রই পর্ব ও পর্যায়ভুক্ত। 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থে কবি প্রথম সজ্ঞানে সনেটপরম্পরা [Sonnet Sequence] রচনা করলেন। মায়াবাদ, খেলা, বন্ধন, গতি, মুক্তি, অক্ষমা, দরিদ্রা, আত্মসমর্পণ—১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৩০ বঙ্গাব্দে, একই দিনে রবীন্দ্রনাথ এই সাতটি ভঙ্গ-সনেট রচনা করেছিলেন। এই সাতটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যপ্রীতি এবং জীবনাসক্তির কথা সংযত-ভাষণে কাব্যরূপ পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, 'সোনার তরী'র বিখ্যাত 'বসুন্ধরা' কবিতাটি লেখা হয় ২৬শে কার্তিক। 'বসুন্ধরা'-রচনার সেই প্রেরণাকেই কবি এক পক্ষকাল পরে এই চতুর্দশী-সপ্তকে প্রকাশ করলেন। 'বসুন্ধরা' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হওয়া সত্ত্বেও অতিকথন এবং পুনরুক্তি-দোষ-দুষ্ট। তার পাশে মিতভাষিণী এই সপ্ত চতুর্দশী রবীন্দ্র-কাব্যরসিকের মুগ্ধদৃষ্টি

আকর্ষণ করবেই। সনেটের পুটপাকে গীতিকাব্যের তরলোচ্ছ্বাস সংহত ও ঘনীভূত হয়ে যে কাব্যলাবণ্য লাভ করে, 'বসুন্ধরা'র উচ্ছ্বসিত ভাষণের সঙ্গে এই সাতটি চতুর্দশীর বাণীবিন্যাসের তুলনা করলেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই চতুর্দশী-সপ্তকে কবি যেন তাঁর মর্ত্যপ্রেমের সপ্তপদী-বন্ধন রচনা করেছেন। তার অন্তিম কবিতাটির নাম 'আত্মসমর্পণ' :

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দু-একটি প্রীতিসুমধুর
প্রাণের গভীর গাথা ; দুঃখের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদ-বিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে ; কুসুমে চন্দনে
তোমারে পুজিব আমি ; পরাব সিন্দূর
তোমার সীমন্তভালে ; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি ; প্রমোদ-সিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।
মানব-আত্মার গর্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ-শ্যাম মাতৃমুখ পানে,
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।

বলাই বাহুল্য, এটি-ভঙ্গ-সনেট। অষ্টক-বন্ধে দুটি মাত্র মিল। তাদের বন্ধনরীতি হল : ককচক : চকচক ॥ ষট্‌কবন্ধে একটি বিবৃত চতুষ্ক : তপতপ ; এবং তার পরে একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে কবিতাটির উপসংহৃতি। সনেটের মুখ্য অঙ্গসন্ধি এ কবিতায় নবম-পংক্তিতে ধরা দিয়েছে। অর্থাৎ অষ্টকবন্ধে ছন্দমিলের মিলবন্ধন অষ্টম চরণে সম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ভাবের লীলা নবম পংক্তি পর্যন্ত উল্লসিত হয়ে

উঠেছে। সেইজন্যেই ছন্দের আবর্তন-সন্ধি এবং ভাবের আবর্তন-সন্ধিতে ভারসাম্য অবিচলিত থাকতে পারে নি। আর পারে নি বলেই এটি বিশুদ্ধ সনেট হয়ে উঠতে পারে নি। কবিতাটি কাব্যরূপে সার্থক, কিন্তু সনেট হিসাবে অনুৎকৃষ্ট।

'চিত্রা' পর্যন্ত মিলের বিচিত্র বিন্যাসের দিকে কবির দৃষ্টি সজাগ রয়েছে। 'চিত্রা'র 'প্রৌঢ়' কবিতায় মাত্র চারটি মিলের লীলা : কচচককচকতপপতপতপ। ভঙ্গ-সনেট হিসাবেও এই কবিতাটি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার মত। যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের সন্ধিলগ্নে কবিমানসের নূতন অনুভূতি এই কবিতার বিষয়ালম্বন। 'যৌবন-নদীর স্রোতে তীব্র বেগভরে' একদিন কবি ছুটেছিলেন, আজ দিবা-অবসানে খেলা শেষ করে কবি তীরে উঠে বসেছেন। এই ভাবনা-বিবর্তনটুকু অষ্টম পংক্তির মধ্যভাগে শুরু হয়ে যাওয়ার ফলে মিলের দিক দিয়ে কবিতাটি অষ্টক ও ষট্‌কে বিভক্ত না হয়ে সপ্তক ও সপ্তকে বিভক্ত হয়েছে। আবর্তন-সন্ধিটিও স্থানচ্যুত হয়েছে, তাই সনেট-রূপটি পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে নি। 'চিত্রা'র 'ধূলি' কবিতাটিও মিল-বিন্যাসের দিক দিয়ে লক্ষণীয়। 'ধূলি'তে মাত্র তিনটি মিল। প্রথম দ্বাদশ চরণে দুটি বিবৃত মিলের বেণীবন্ধনের পর ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ চরণ একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে গ্রথিত। কবিতাটি উদ্ধৃতির যোগ্য :

অয়ি ধূলি, অয়ি তুচ্ছ, অয়ি দীনহীনা,
সকলের নিম্নে থাক নীচতম জনে
বক্ষে বাঁধিবার তরে ; সহি সর্ব ঘৃণা
কারে নাহি কর ঘৃণা। গৈরিক বসনে
হে ব্রতচারিণী তুমি সাজি উদাসীনা
বিশ্বজনে পালিতেছ আপন ভবনে।

নিজেরে গোপন করি, অয়ি বিমলিনা,
সৌন্দর্য বিকশি তোল বিশ্বের নয়নে ;
বিস্তারিছ কোমলতা, হে শুষ্ক কঠিনা,
হে দরিদ্রা, পূর্ণ তুমি রত্নে ধান্যে ধনে।
হে আত্মবিস্মৃতা, বিশ্ব-চরণ-বিলীনা,
বিস্মৃতেরে ঢেকে রাখ অঞ্চল-বসনে।
নূতনেরে নির্বিচারে কোলে লহ তুলি,
পুরাতনে বক্ষে ধর, হে জননী ধূলি।

এ কবিতায় তুচ্ছ ধূলি দিয়েই রবীন্দ্রনাথ জীবধাত্রী মর্ত্য-জননীর মাতৃমূর্তিটি রচনা করেছেন। সনেট হিসাবে কবিতাটি ব্যর্থ, কেন না ওর অন্তর্নিহিত ভাবপ্রবাহ মিলের যুগ্মবেণীবন্ধে বহমান। আবর্তন-লীলাটি একেবারেই অনুপস্থিত। কেবল মিলের মিলন-লীলাতেই কবিতাটির কাব্যরূপ বিলসিত।

চতুর্দশপদী-রচনায় মিলের বিচিত্র বেণীবন্ধনের চারুচর্যা 'চিত্রা'তেই পরিসমাপ্ত হয়েছে। 'চৈতালি'তে রবীন্দ্রনাথ ৬৮টি চতুর্দশপদী কবিতায় যখন পদ্মাপর্বের শেষ ফসল কুড়িয়েছেন, তখন মিল নিয়ে কবির খেলা একেবারেই সাঙ্গ হয়েছে। ওই ৬৮টি কবিতার মধ্যে মাত্র ২টি ছাড়া সর্বত্রই সাতটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে চতুর্দশীর অঙ্গ-বিন্যাস হয়েছে। কাব্য হিসাবে 'চৈতালি'র 'ছোটোফুল'গুলি রবীন্দ্রবাণীমালঞ্চে বাংলার বনফুলের সহজ ও শান্ত সৌন্দর্যে নয়নাভিরাম। পদ্মাতীরের পল্লীবালিকার মতই প্রসাধনহীন লাবণ্যে তারা সুকুমার। প্রসাদগুণান্বিত কবিতার এমন সাবলীল ভঙ্গি, এমন শান্তশ্রী রবীন্দ্র-জীবনের অন্য কোন পর্বে অন্য কোন কলাকৃতির মধ্যে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে নি। পেত্রার্কার অভিজাতকুলসম্ভবা মানসকন্যা এখানে একেবারে বাংলার ঘরের মেয়ে উঠেছে। 'চৈতালি'র একটি চতুর্দশীকে দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করা যাক :

নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা
পশ্চিমী মজুর। তাহাদেরি ছোট মেয়ে
ঘাটে করে আনাগোনা ; কত ঘষামাজা
ঘটি বাটি থালা লয়ে, আসে ধেয়ে ধেয়ে
দিবসে শতেক বার ; পিত্তল কঙ্কণ
পিতলের থালি 'পরে বাজে ঠন ঠন ;
বড়ো ব্যস্ত সারাদিন, তারি ছোটো ভাই,
নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই ;
পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে
বসি থাকে উচ্চপাড়ে দিদির আদেশে
স্থিরধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে
বাম কক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে
ধরি শিশুকর ; জননীর প্রতিনিধি,
কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি।

বলাই বাহুল্য, এটি সাদাসিধে পয়ারবন্ধে রচিত একটি চতুর্দশপদী কবিতা। প্রথম যুগ্মকযুগল বিবৃত মিলের ধর্মে একটি চতুষ্ক রচনা করেছে, কিন্তু তাও যেন লক্ষ্য করবার মত নয়। কাব্যসংসারে ওটিও একটি তন্বী চতুর্দশী, এ ছাড়া গোত্রে ও বর্ণে সনেটের সঙ্গে ওর আর কোন সম্পর্ক নেই। বাংলার আটপৌরে ভাষার বসনপরা এই অজ্ঞাতকুলশীল বালিকাটি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম স্নেহে প্রতিপালিত হয়েছে বলেই ধন্য হয়েছে।

'চৈতালি'র চতুর্দশপদী কবিতাগুলি বিষয়বৈচিত্র্যে ও কাব্যোৎকর্ষে রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনবদ্য। তন্মধ্যেও দেবতার বিদায়, বৈরাগ্য, দুর্লভ জন্ম, খেয়া, সভ্যতার প্রতি, দিদি, মানসী, কাব্য প্রভৃতি কবিতা বাণীবিন্যাসের অনায়াস-ভঙ্গিতে যেন তুলনাহীন। 'চৈতালি'তে কালিদাস ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে ঋতুসংহার, মেঘদূত,

কালিদাসের প্রতি, কুমারসম্ভবগান, মানসলোক ও কাব্য—এই কবিতা-ষট্‌কে এক মহাকবি সম্পর্কে আরেক মহাকবি অভিনব দৃষ্টিতে নবভাষ্য রচনা করেছেন। ঋতুসংহারে 'ত্রিভুবন একখানি অন্তঃপুর, বাসরভবন'। মেঘদূতে 'যৌবনের বিশ্বগ্রাসী মত্ত অহমিকা' মুহূর্তে মিলায়ে গিয়ে দেখা দিল 'আষাঢ়ের অশ্রুপ্লুত সুন্দর ভুবন।' এ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবির পক্ষেই সম্ভব। বাণী এখানে মন্ত্র হয়ে মুহূর্তমাত্রে কাব্যের মর্মরহস্য অনাবৃত করে দিয়েছে। 'কালিদাসের প্রতি' ও 'কাব্য' ;—একই দিনে লেখা এই কবিতাযুগলে কাব্য-সৃষ্টির মূল রহস্যকেও রবীন্দ্রনাথ নির্বারিত করেছেন। কালিদাসের কাব্য পড়লে মনে হয়, 'ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময় অলকার অধিবাসী।' কিন্তু বাস্তব আর স্বপ্ন, ষড়যন্ত্রময় উজ্জয়িনী আর চিরানন্দময় অলকা তো এক নয়! জীবনসত্য ও কাব্যসত্যের এই অসামঞ্জস্য, এই বিরোধাভাস কোন্ সাধনায় এক মহাসঙ্গতিতে সার্থক হয়ে ওঠে তার কথাই আছে 'কাব্য' শীর্ষক চতুর্দশীতে। কবি বলেছেন :

তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব আমাদেরি মতো
হে অমর কবি। ছিল না কি অনুক্ষণ
রাজসভা ষড়চক্র, আঘাত গোপন।
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,
অভাব কঠোর ক্রূর,—নিদ্রাহীন রাতি
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি।
তবু সে সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য-কমল
আনন্দের সূর্যপানে ; তার কোনো ঠাঁই
দুঃখদৈন্য দুর্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।

জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান,
অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।

কবিমানস ও কাব্যরহস্যের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে কবিতাটি অসামান্য। কিন্তু কলাকৃতির দিক দিয়েও 'চৈতালি'র এই কবিতাটি লক্ষ্য করবার মত। মিলবিন্যাসে সনেটের বাহ্য-সঙ্গতি ওর নেই বটে, কিন্তু ভাবের আভ্যন্তর সঙ্গতির দিক দিয়ে আদর্শ সনেটের ধর্ম ওতে রয়েছে। অষ্টক-বন্ধের দুটি চতুষ্কে বাস্তব জীবনের বক্ষে শেলবিদ্ধ অশ্রুপারাবারে ষট্‌ক-বন্ধে আনন্দের সূর্যপানে কাব্যের সৌন্দর্য-কমল উন্মীলিত হয়েছে। অষ্টক ও ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তনসন্ধিতে ভাবের বক্রায়ণলীলাটি ওতে স্বতঃস্ফূর্ত।

'চৈতালি'র পরে রবীন্দ্রনাথের সনেটকল্প রচনাবলীর সর্বাধিক-সংখ্যক সংকলন হয়েছে 'নৈবেদ্য' গ্রন্থে। কবি তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের তপশ্চারী সাধক। প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠোচ্চারিত অমৃতবার্তা ভারতীয় নবজন্মের যজ্ঞশালায় কবিকণ্ঠে উদ্‌গীত হচ্ছে। স্বভাবতই 'চৈতালি'র মেঠোসুর পরিত্যাগ করে কবি এখানে পাখোয়াজ-সহযোগে ধ্রুপদে আলাপ শুরু করেছেন। 'নৈবেদ্যে'র কবিতাগুলি ভাবপরম্পরায় গ্রথিত। স্বরূপলক্ষণে এগুলিও সনেট-পদবাচ্য নয়; বহমান মিত্রাক্ষর পয়ারবন্ধের চতুর্দশপদী কবিতামাত্র। কিন্তু ধ্যানপ্রবুদ্ধ কবির কম্বুকণ্ঠ এখানে উদাত্ত-গম্ভীর। চতুর্দশীর তনুদেহে কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চারিত করা যায় 'নৈবেদ্যে' যেন তারই অন্তিম পরীক্ষা। কবিতাগুলি ভাবগৌরবে যেমন সমৃদ্ধ, শঙ্খধ্বনির জলদমন্দ্রে তেমনই পাঞ্চজন্যনিনাদী। 'নৈবেদ্যে'র "প্রার্থনা" কবিতাটি বিশেষ দৃষ্টির অপেক্ষা রাখে। একটি অখণ্ড সংকল্পের প্রতীক হিসাবে একটি বাক্যে একটি 'চতুর্দশী' গড়ে উঠেছে :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বস্থধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করে নি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা-আনন্দের নেতা,
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

মিলের দিক এ কবিতায় গৌণ। যদিও অষ্টক-ষট্কের মধ্যভাগে এর মুখ্য অঙ্গসন্ধি স্থপরিস্ফুট নয়, তবু কবিতাটি ভাববিন্যাসের দিক দিয়ে তিনটি চতুষ্কের পর একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকের সমাবেশে গড়ে উঠেছে। একটি বাক্য দিয়ে গড়া চতুর্দশপদী কবিতা রবীন্দ্রনাথ আরও লিখেছেন। 'স্মরণ' কাব্যগ্রন্থের ২২ সংখ্যক ['রমণী' শীর্ষক] কবিতাটি তারই আর একটি দুর্লভ উদাহরণ :

যে-ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি ;
যে-ভাবে স্থন্দর তিনি সর্বচরাচরে,
যে-ভাবে আনন্দ তাঁর প্রেমে খেলা করে,
যে-ভাবে লতায় ফুল, নদীতে লহরী,
যে-ভাবে বিরাজে লক্ষ্মী বিশ্বের ঈশ্বরী,

যে-ভাবে নবীন মেঘ বৃষ্টি করে দান,
তটিনী ধরারে স্তন্য করাইছে পান,
যে-ভাবে পরম এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,
দুয়ের মিলনঘাতে বিচিত্র বেদনা
নিত্য বর্ণ-গন্ধ-গীত করিছে রচনা,
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

পূর্বোদ্ধৃত কবিতা থেকে এ কবিতার স্বাদ আলাদা। এতে ভাবের বিলসন সূক্ষ্ম ও সুকুমার। ছন্দ-মিলের দিক দিয়ে অষ্টক-ষট্‌ক-বন্ধের বিভাগ এতে নেই, কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে মুখ্য অঙ্গ-সন্ধিটি সহৃদয়-দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই।

জীবনের অন্তিম পর্বে কবি কাব্যের প্রসাধনকলা যথাসম্ভব বর্জন করে চলেছেন। এমন কি মঞ্জুভাষিণী গীতিকাব্য-লক্ষ্মীর চরণযুগল থেকে অন্ত্যানুপ্রাসের মঞ্জীরও তিনি খুলে ফেলেছেন। তাঁর সনেটকল্প কলাকৃতিও শেষ পর্যায়ে সহজবিন্যস্ত মিলের গ্রন্থিবন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে। 'প্রান্তিকে'র পঞ্চম কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক অমিত্রা চতুর্দশী :

পশ্চাতের নিত্যসহচর, অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ, পিছু-ডাকা অক্লান্ত আগ্রহে
আবেশ-আবিল সুরে বাজাইছ অস্ফুট সেতার,
বাসাছাড়া মৌমাছির গুন গুন গুঞ্জরণ যেন
পুষ্পরিক্ত মৌনী বনে। পিছু হতে সম্মুখের পথে
দিতেছ বিস্তীর্ণ করি অস্তশিখরের দীর্ঘ ছায়া
নিরন্ত ধূসরপাণ্ডু বিদায়ের গোধূলি রচিয়া।

পশ্চাতের সহচর, ছিন্ন করো স্বপ্নের বন্ধন .
রেখেছ হরণ করি মরণের অধিকার হতে
বেদনার ধন যত, কামনার রঙিন ব্যর্থতা,
মৃত্যুরে ফিরায়ে দাও। আজি মেঘমুক্ত শরতের
দূরে-চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি, আমি তারি হব অনুগামী।

রবীন্দ্র-জীবনের এই সর্বশেষ সনেটকল্প কলাকৃতিটি ভঙ্গ-সনেটের একটি অসামান্য উদাহরণ। মিলের প্রসাধনকলা ওতে নেই, কিন্তু অষ্টক ও ষট্ক-বন্ধে ভাবের আভ্যন্তর সঙ্গতি যেমন সুরক্ষিত হয়েছে, তেমনই ওতে অবিচলিত রয়েছে আবর্তন-সন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য। জীবন-মরণের প্রান্তিক সীমানায় এসে কবির আত্মসমীক্ষণ তাঁর মানসলোকের মর্মকোষে সঞ্চিত অতৃপ্ত তৃষ্ণার ছায়ামূর্তিগুলিকেই উন্মীলিত করেছে। রবীন্দ্র-সত্তায় নিত্যবিরাজমান মৃৎসত্ত ও চিৎসত্ত পুরুষের মর্মকথাও এই ব্রাত্যধর্মী সনেটেই শেষবারের মত একই শিল্পদেহে একাত্ম-ঘনিষ্ঠতায় উচ্চারিত হল। রবীন্দ্র-বাণী-সাধনায় ভঙ্গ-সনেটের চূড়ান্ত বিবর্তনের রূপটিও মহাপয়ার-বন্ধে রচিত এই ঈষৎপীনতনু চতুর্দশীতেই কবির শেষ-স্বাক্ষর পেল।

৫

কিন্তু এহ বাহ্য! রবীন্দ্ররচিত সনেটপ্রসঙ্গ আলোচনার মুখ্য সহৃদয়-কৃত্য হল সনেটের আলোকে রবীন্দ্রমানসলোকের অনাবিষ্কৃত মহলের রহস্যান্বেষণ। আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ-কৈশোর-লগ্নে প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন আধুনিক পৃথিবীর কবিগুরু পেত্রার্কার কাছে। রবীন্দ্রজীবনে পেত্রার্কা তথা ইতালীয় রেনেসাঁসের প্রভাব

কি ভাবে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রসমালোচকগণের দৃষ্টি আজও আকৃষ্ট হয় নি। মহাকবি মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'-রচনাপ্রসঙ্গে পেত্রার্কার শিষ্যত্ব বরণ করেছিলেন। তিনি পেত্রার্কার এই অভিনব কলাকৃতিটিকে আহরণ করে বাংলার গীতিকাব্যলক্ষ্মীর ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন। কিন্তু মধুসূদন পেত্রার্কার কবিকৃতি ও কবিকল্পনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও পেত্রার্কার কাব্যসাধনার মূলীভূত প্রেরণা—অর্থাৎ পেত্রার্কার প্রেমসাধনার পরোক্ষ প্রভাব থেকেও দূরে ছিলেন। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রজীবনে পেত্রার্কার প্রেমসাধনার আদর্শও প্রভাব বিস্তার করেছিল। পেত্রার্কা ও লরার প্রেম রবীন্দ্রনাথের কবিমানসেও পরিশালিত হয়েছে। শুধু পেত্রার্কা ও লরাই নয়, দান্তে ও বেয়াত্রিচের প্রেমও রবীন্দ্রনাথের কৈশোর-স্বপ্নকে মুগ্ধবিস্ময়ে আবিষ্ট করে রেখেছিল। রবীন্দ্রজীবনে দান্তে ও পেত্রার্কার প্রভাবের ইঙ্গিত প্রথম পাওয়া গেল ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিনের 'ভারতী' পত্রিকার পৃষ্ঠায়। রবীন্দ্রনাথের বয়স সতেরো বৎসর চার মাস, অর্থাৎ কবি তখন অষ্টাদশবর্ষোপদেশিক পূর্ণকিশোর। রবীন্দ্রনাথ তখন পারিবারিক গণ্ডি পেরিয়ে প্রথমবার বিলেত যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। বিলেতযাত্রার প্রাক্‌কালে কবিকিশোর কিছুদিন কাটালেন আমেদাবাদে মেজদার বিরাট গ্রন্থাগারে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সেখানকার জজ। সেখানে গ্রন্থাগারের নির্জন একাকিত্বে বসে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। সে প্রবন্ধগুলি 'ভারতী'তে প্রকাশিত হল। তারই দুটি প্রবন্ধ "বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য" এবং "পিত্রার্কা ও লরা",—যথাক্রমে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্র ও আশ্বিনে প্রকাশিত।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, কবিকিশোরের চিত্ত দান্তে ও পেত্রার্কার প্রেমের প্রতি আকৃষ্ট হল কেন? এ কি নিতান্তই জ্ঞানান্বেষী তরুণচিত্তের গ্রন্থাধ্যয়নের ফল, না, এর পশ্চাতে কোনো

নিগূঢ় প্রেরণা ও আকর্ষণ ক্রিয়াশীল হয়েছে? এই প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রেমসাধনার অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের মধ্যে।

আমরা বলেছি, দান্তে ও বেয়াত্রিচে, এবং পেত্রার্কা ও লরার প্রেম ত্রুবাদুর প্রেমেরই দোসর। পেত্রার্কাকে বলা হয় মধ্যযুগ ও নবজন্মোত্তর য়ুরোপের সন্ধিলগ্নে য়ুরোপক্ষেত্রের শেষ ত্রুবাদুর। রবীন্দ্রনাথের প্রেমও ত্রুবাদুর প্রেমের দোসর। রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীতে নবজন্মোত্তর বাংলার এক অভিনব তরুণ-ত্রুবাদুর-রূপেই প্রথম যৌবনে আত্মানুশীলনে ব্রতী হয়েছিলেন। আর সে ক্ষেত্রে পেত্রার্কার প্রেম ও কাব্যসাধনাই তাঁর নিভৃত জীবনের স্বপ্নকামনাকে সঞ্জীবিত ও দীক্ষিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের সনেটও সেই একই দীক্ষার উৎস থেকে উৎসারিত। পেত্রার্কার জীবনে লরার প্রেমসংগীত মুখ্যত তাঁর সনেটের 'small lute' সহযোগেই গীত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীত গীতিকাব্যের বিচিত্র কলাযন্ত্রে বিচিত্র সুরে রচিত, কিন্তু কবিপ্রেমিক যেদিন অলজ্জ অসংকোচে তাঁর অন্তরঙ্গতম আত্মকথাকে কাব্য-লক্ষ্মীর হাতে সমর্পণ করলেন, সেদিন তাঁর আত্মপ্রকাশের বাহন হল সনেট। 'কড়ি ও কোমলে'র সেই সনেটগুচ্ছই পেত্রার্কাতন্ত্রে দীক্ষিত রবীন্দ্রনাথের সজ্ঞান ও সচেতন আত্মপ্রকাশের প্রথম ফসল। কবির আত্মকথা হিসাবে এই সনেটগুলি সে যুগে শুধু বিস্ময়করই নয়, সুচারু বাণীশীলন এবং কাব্যাস্বাদনে নূতন রুচিবোধ-সৃষ্টির দিক দিয়ে দুঃসাহসী নির্ভীকতায় বিপ্লবধর্মী। তরুণ রবীন্দ্রনাথও ওই একবারই মাত্র প্রিয়ার তনুলাবণ্যের দিকে তন্ময় প্রেমিকের চির-অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেছিলেন। তারপর তাঁর জীবনে দ্বিতীয়বার আর সে দৃষ্টি তাঁর চোখে উন্মীলিত হয় নি। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের মধ্যেই মাত্র একবারের জন্যে

দেহধারী রবীন্দ্রনাথের মর্ত্যমানুষের প্রেম বাসনা-বেদনা-ভরা আসক্তি নিয়ে কুণ্ঠাহীন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ একবারই তাঁর যৌবনরসসমৃদ্ধ মনোভবাভিভূত মানসমন্দিরের দ্বার কাব্যরসিকের সম্মুখে উন্মুক্ত করেছিলেন। তারপর চিরদিনের জন্যেই তিনি সে দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের সরণি বেয়েই রবীন্দ্রমানসের সেই মর্মমন্দিরে প্রবেশ করার একমাত্র উপায় রয়েছে। কিন্তু সেই মন্দির-প্রবেশের পূর্বে একটি কথা আমাদের চিরদিন স্মরণ রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী-জীবনে সূর্যমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ-রূপেই বিরাজমান। মর্ত্যলোকে অদিতিবংশের চিরশুদ্ধ এই অগ্নিশিশুর মর্মকোষে সংগুপ্ত সুধার সন্ধানে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সামাজিকের চেতনাকে কলুষিত কামসংস্কার থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করেই এ পথে অগ্রসর হতে হবে।

তা ছাড়া, রবীন্দ্র-মানসমন্দিরের মণিকুট্টিমে উপনীত হওয়ার পূর্বে একবার সেই দেবালয়ের দেহলি-চিত্রের দিকেও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। গ্রন্থাকারে 'কড়ি ও কোমলে'র প্রকাশকাল ১২৯৩ বঙ্গাব্দ। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঞ্চবিংশতি বৎসর উত্তীর্ণ হয়েছে। তার চার বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-রচনার যুগকে তরুণ রবীন্দ্রনাথের অন্তর্লোকের সবচেয়ে গভীর ও সুন্দর প্রেরণার যুগ বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রজীবনের সেই পর্বের দিকে একটু দৃষ্টি নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। প্রথমবার, অর্থাৎ আঠারো বৎসর বয়সে, বিলেত থেকে ফেরার কয়েক মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ আবার বিলেত যাওয়ার জন্যে পিতার অনুমতি চাইলেন। উদ্দেশ্য ব্যারিস্টার হওয়া। পিতৃদেব লিখে পাঠালেন, পুত্রের প্রতিশ্রুতি ও শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করে তিনি তাঁকে যাওয়ার অনুমতি দিতে

প্রস্তুত, কিন্তু সর্বদা মনে রাখতে হবে, 'এবার আমি তোমার সঙ্গে আছি'। যে-কারণেই হোক, সেবারও বিলেত যাওয়া হয় নি, এবং তার মাস আষ্টেক পরে যখন আবার চেষ্টা চলে তখনও কবি মাদ্রাজ থেকেই ফিরে এলেন। বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হওয়া আর তাঁর ভাগ্যে ঘটল না! মনের এই অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ আশ্রয় নিলেন জ্যোতিদাদা আর তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীর কাছে চন্দননগরে, তাঁদের বাগানবাড়িতে। 'জীবনস্মৃতি'র 'গঙ্গাতীর' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সেই দিনগুলির সম্পর্কে যা লিখেছেন তাতেই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' রচনার পরিবেশটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে :

> বিলাত যাত্রার আরম্ভপথ হইতে যখন ফিরিয়া আসিলাম তখন জ্যোতিদাদা চন্দননগরে গঙ্গাধারের বাগানে বাস করিতেছিলেন—আমি তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আবার সেই গঙ্গা! সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়, বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি! এইখানেই আমার স্থান, এইখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন-পরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্তপ্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীরমন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।...
>
> আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণবিকশিত পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হারমোনিয়ম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা-বাদর মাহভাদর' পদটিতে মনের মত সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাতমুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম; কখনো বা সূর্যাস্তের সময় আমরা নৌকা লইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম—জ্যোতিদাদা বেহালা বাজাইতেন, আমি গান গাহিতাম; পুরবী রাগিণী হইতে আরম্ভ করিয়া যখন বেহাগে গিয়া পৌঁছিতাম তখন

পশ্চিমতটের আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হইয়া গিয়া পূর্ববনান্ত হইতে চাঁদ উঠিয়া আসিত। আমরা যখন বাগানের ঘাটে ফিরিয়া আসিয়া নদীতীরের ছাদটার উপর বিছানা করিয়া বসিতাম তখন জলে-স্থলে শুভ্র শান্তি, নদীতে নৌকা প্রায় নাই, তীরের বনরেখা অন্ধকারে নিবিড়, নদীর তরঙ্গহীন প্রবাহের উপর আলো ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।[৯]

চন্দননগরের গঙ্গাতীরের এই 'আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়' পরিবেশেই গীতিকবিরূপে রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন। এই পর্বই তাঁর 'সন্ধ্যাসংগীতে'র পর্ব। 'সন্ধ্যাসংগীতে'র আগে কবি ইতস্তত দু-একটি গীতিকবিতা অবশ্যই রচনা করেছেন, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তৎকাল-প্রচলিত কাহিনী-কাব্য বা গাথাকাব্যই ছিল তাঁর ভাবপ্রকাশের মুখ্য বাহন। 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম নিজেকে আবিষ্কার করলেন। 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রাণের আনন্দে প্রকাশের আবেগে লীলাচ্ছলে যা-খুশি-তাই লেখার মহাসনদ নিয়ে কবির জীবনে দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ গীতিকাব্যের বাঁশিতে সারাজীবন যে প্রাণের সংগীত গেয়েছেন 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই তার শুরু। এই 'সন্ধ্যাসংগীতে'রই দোসর 'বিবিধ প্রসঙ্গ'। এই প্রবন্ধগুলি লীরিকধর্মী, তাই এদের নাম দেওয়া চলে গীতিগদ্য। 'বিবিধ প্রসঙ্গ' 'পুষ্পাঞ্জলি'-'লিপিকা'র অগ্রদূত, বাংলা সাহিত্যে মন্ময় গদ্যরচনার প্রথম সার্থক পরীক্ষা। বলা যেতে পারে, গদ্যপ্রবন্ধে সেই প্রথম কবির আপন মনের কথা ভাষা খুঁজে পেল।

এই গ্রন্থে 'দার্শনিকতা' ও 'প্রেম' পর্যায়ে যে প্রবন্ধগুলি শ্রেণীবদ্ধ হয়েছে, আসলে সেগুলিই 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রাণ। 'আত্মসংসর্গে' তরুণ দার্শনিক বলছেন :

> আমাদের মন গোটাকতক ক্ষুধার সমষ্টিমাত্র। ' জ্ঞানের ক্ষুধা, আসঙ্গের ক্ষুধা, সৌন্দর্যের ক্ষুধা। আমাদের দিকে অনন্ত জ্ঞানের পিপাসা, আর জগতের দিকে অনন্ত রহস্য। আমরা প্রাণের সহচর চাই, কিন্তু "লাখে না মিলল একে।" আমরা সৌন্দর্য উপভোগ করিতে চাই, অথচ সৌন্দর্যকে দুই হাতে স্পর্শ করিলেই সে মলিন হইয়া যায়। আমরা কৃষ্ণবর্ণ; সূর্যরশ্মির সমস্ত বর্ণধারা পান করিয়া থাকি, তথাপি আমরা কালো। সূর্যরশ্মি পান করিবার আমাদের অনন্ত পিপাসা। এইরূপে অনন্ত জ্ঞানের ক্ষুধা লইয়া যে রহস্য দন্তস্ফুট করিতে পারিব না তাহাকেই অনবরত আক্রমণ করা, অনন্ত আসঙ্গের ক্ষুধা লইয়া যে সহচর মিলিবে না তাহাকেই অবিরত অন্বেষণ করা, অনন্ত সৌন্দর্যের ক্ষুধা লইয়া যে সৌন্দর্য ধরিয়া রাখিতে পারিব না তাহাকেই চির উপভোগ করিতে চেষ্টা করা, এক কথায় অনন্ত মন অর্থাৎ সমষ্টিবদ্ধ কতকগুলি অনন্ত ক্ষুধা লইয়া জগতের পশ্চাতে অনন্ত ধাবমান হওয়াই মনুষ্য-জীবন।[১০]

ভাবে ও ভাষায় উদ্ধৃত অংশটি শুধু 'বিবিধ প্রসঙ্গে'রই মর্মকথা নয়, রবীন্দ্র-কবিমানসেরও মর্মকথা। জ্ঞান, প্রেম ও সৌন্দর্য—এই ত্রিবিধ মহাপিপাসাই যে মানবজীবন এবং এ সম্পর্কে অন্তহীন ঐশী অসন্তুষ্টিই যে মানবজীবনের নিয়তি, দার্শনিক-কবির প্রথম আত্মচিন্তায় তা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে। এই ঐশী অসন্তুষ্টিই 'সন্ধ্যাসংগীত'-পর্বের দুঃখ, বেদনা ও বিষাদের প্রথম স্তর রচনা করেছে।

তরুণ কবির মনকে শুধু এই দার্শনিক তত্ত্বচিন্তাই অভিভূত করে রাখে নি, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমিক-হৃদয়ের আলো-আঁধারি লীলার আনন্দ-বেদনা। সে প্রেম সম্ভোগ-মিলনের রসোদ্গার নয়, তাতে আছে বিপ্রলম্ভ-রতির পূর্বরাগ-মান-প্রবাস-প্রেমবৈচিত্ত্যের অনন্ত পিপাসা ও অনন্ত অতৃপ্তি। সে স্বাধিকার-প্রমত্ত' হয়েও চিরভিখারী। চুয়াত্তর বৎসর বয়সে 'শেষ সপ্তক' কাব্যগ্রন্থে 'পঁচিশে

বৈশাখ' কবিতায় অন্তরঙ্গতম আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে সে প্রেমের কথায় কবি বলছেন :

> তরুণ যৌবনের বাউল
> স্থর বেঁধে নিল আপন একতারাতে,
> ডেকে বেড়াল নিরুদ্দেশ মনের মানুষকে
> অনির্দেশ্য বেদনার খেপা স্থরে।

নিরুদ্দেশ মনের মানুষের সন্ধানে বাউল-চিত্তের সাধনাই সেদিনকার তরুণ কবির প্রেমচেতনার মর্মকথা। 'মনের বাগান-বাড়ি'তে সেই প্রেমাদর্শের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে। 'সংসারের কাজ-চালানে, মন্ত্রবদ্ধ, ঘরকন্নার ভালবাসা যেমনই হোক,' সে ভালবাসা তা থেকে স্বতন্ত্র। সে ভালবাসার সাধনায় 'মনের বাগান-বাড়ি' পুষ্পোদ্যান হয়ে ওঠে। সে 'ভালবাসা অর্থে আত্মসমর্পণ নহে, ...নিজের যাহা কিছু ভাল তাহাই সমর্পণ করা। হৃদয়ে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা নহে ; হৃদয়ের যেখানে দেবত্র-ভূমি, যেখানে মন্দির, সেইখানে প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা।' বলাই বাহুল্য, এ প্রেমের আদর্শ ক্রুবাতুর-প্রেমকল্পনার দ্বারাই প্রভাবিত। বর্তমান গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের ১৮ পৃষ্ঠায় ডরথি এল. সেয়ার্সের উদ্ধৃতিতে ক্রুবাতুর-প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যাত হয়েছে। এক কথায়, অপ্রাপণীয়া মানসস্থন্দরীর উদ্দেশে তদ্গতচিত্তের ঐকান্তিক আত্মনিবেদনই ছিল মধ্যযুগীয় সে প্রেমের আদর্শ। তরুণ কবির প্রেমসাধনাও ছিল তারই দোসর। বাস্তবজীবনে যে-দেবীর মধ্যে সেই আদর্শ স্বপ্নের প্রতিফলন হয়েছিল তাঁকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছিল সেদিনকার কবিমানসে, যাকে বৈষ্ণব ভক্তিশাস্ত্রের ভাষায় বলা হয় 'পরানুরক্তি', তারই বিচিত্র রূপ। সেই দেবীর সঙ্গস্থধায় তরুণ কবির প্রাণের পাত্র সেদিন পূর্ণ ছিল। সে কথা তিনি গ্রন্থশেষে অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেখানেও কবি এক-নিমেষের জন্যে তাঁর মানসমন্দিরের দ্বার

ঈষন্মুক্ত করেই আবার বন্ধ করে দিয়েছিলেন। 'নির্মমতার অনাবৃত শ্মশানক্ষেত্রে' নিজের হৃদয়খানা 'শকুনি-গৃধিনীদের দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন' হবার জন্যে কেউ খুলে রাখে না।[১১] রবীন্দ্রনাথও তা করেন নি। নির্মমতার শ্মশানক্ষেত্রচারী শকুনি-গৃধিনীদের কথা চিন্তা করেই তাঁর তরুণ হৃদয়ের অকপট ভাবনাগুলি তিনি পুনরায় প্রকাশ করা সমীচীন বিবেচনা করেন নি; তাই 'বিবিধ প্রসঙ্গ'কে দ্বিতীয় সংস্করণে নূতন জীবনের পাট্টা দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই গ্রন্থখানিতে কবি-হৃদয়ের অতিনিভৃত ও অন্তরঙ্গতম জীবনের যে চিত্রটি এর সর্বশেষ অনুচ্ছেদে অনাবৃত হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে তার মূল্য অপরিসীম। গ্রন্থশেষে উৎসর্গপত্রের উপসংহারে বলছেন :

> আর, আমার পাঠকদিগের মধ্যে একজন লোককে বিশেষ করিয়া আমার এই ভাবগুলি উৎসর্গ করিতেছি। এ ভাবগুলির সহিত তোমাকে আরও কিছু দিলাম, সে তুমিই দেখিতে পাইবে! সেই গঙ্গার ধার মনে পড়ে? সেই নিস্তব্ধ নিশীথ? সেই জ্যোৎস্নালোক? সেই দুইজনে মিলিয়া কল্পনার রাজ্যে বিচরণ? সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে গভীর আলোচনা? সেই দুইজনে স্তব্ধ হইয়া নীরবে বসিয়া থাকা? সেই প্রভাতের বাতাস, সেই সন্ধ্যার ছায়া! এক দিন সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, শ্রাবণের বর্ষণ, বিদ্যাপতির গান? তাহারা সব চলিয়া গিয়াছে! কিন্তু আমাদের এই ভাবগুলির মধ্যে তাহাদের ইতিহাস লেখা রহিল। এই লেখাগুলির মধ্যে কিছু দিনের গোটাকতক সুখ দুঃখ লুকাইয়া রাখিলাম, এক-এক দিন খুলিয়া তুমি তাহাদের স্নেহের চক্ষে দেখিও, তুমি ছাড়া আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না! আমার এই লেখার মধ্যে লেখা রহিল, এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আরেক লেখা আর সকলে পড়িবে।[১২]

পরম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ-ভরে যাঁকে তরুণ কবি তাঁর এই ভাবগুলি উৎসর্গ করেছেন তিনি হলেন জ্যোতিদাদার স্ত্রী কাদম্বরী দেবী—রবীন্দ্রনাথের 'নোতুন বৌঠান'। 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, 'এই অংশ তাঁহার বৌঠাকুরানী কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশে রচিত বলিয়া আমাদের মনে হয়।'[১৩] এই দেবী বিহারীলালের 'সাধের আসনে'র প্রেরণাদাত্রীরূপে বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। রবীন্দ্রজীবনে এই দেবী মানবীমূর্তিতে ধরা দিয়েছিলেন। তিনিই ছিলেন রবীন্দ্র-কবিমানসের মূর্তিমতী প্রেরণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই তাঁর মানস-আকাশের ধ্রুবতারারূপে বন্দনা করেছেন। ["তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা, এ সমুদ্রে আর কভু হব না কো পথহারা।"] তাঁরই প্রীতিসুন্দর সাহচর্যে সদ্য-ঘুমভাঙা ভোরের স্বপ্নে নতুন-ফোটা বেলফুলের মালার গন্ধে বিহ্বল রবীন্দ্র-জীবনপ্রভাতের নান্দীপাঠ হয়েছে 'বিবিধ প্রসঙ্গে।' তাই এই গ্রন্থখানিকে আমরা রবীন্দ্র-মানসমন্দিরের 'দেহলি-চিত্র'রূপে অভিহিত করেছি।

৬

'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের মধ্যেই রবীন্দ্রমানসমন্দিরের মণিকুট্টিম অর্গলমুক্ত হল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে আত্মজীবনকাহিনী বলতে বলতে 'কড়ি ও কোমলে' এসেই অকস্মাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। যেন আবার কবিমানসে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র সেই দ্বিধা দেখা দিয়েছে। 'নির্মমতার অনাবৃত শ্মশানক্ষেত্রে নিজের হৃদয়খানা শকুনি গৃধিনীদের দ্বারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন' হবার আশঙ্কাতেই কি কবি

দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন? কারণ যাই হোক্ না কেন, পঞ্চাশ বৎসর বয়সে আত্মজীবনী লিখতে বসে পঁচিশ বৎসরে এসেই থেমে যাওয়া বাণীবিনোদ কবির পক্ষে রহস্যময় সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে হঠাৎ চুপ করে যাওয়ার হেতু বিশ্লেষণ করেছেন 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের অন্তিম অনুচ্ছেদে :

> এবারে একটা পালা সাঙ্গ হইয়া গেল। জীবনে এখন ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাহিরের মেলামেলির দিন ক্রমে ঘনিষ্ঠ হইয়া আসিতেছে। এখন হইতে জীবনের যাত্রা ক্রমশই ডাঙার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া যে-সমস্ত ভালমন্দ সুখদুঃখের বন্ধুরতার মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইবে, তাহাকে কেবলমাত্র ছবির মতো করিয়া হালকা করিয়া দেখা আর চলে না। এখানে কত ভাঙাগড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন। এই সমস্ত বাধা-বিরোধ ও বক্রতার ভিতর দিয়া আনন্দময় নৈপুণ্যের সহিত আমার জীবনদেবতা যে একটি অন্তরতম অভিপ্রায়কে বিকাশের দিকে লইয়া চলিয়াছেন তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবার শক্তি আমার নাই। সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকুই যদি না দেখানো যায়, তবে আর যাহা-কিছুই দেখাইতে যাইব তাহাতে পদে পদে কেবল ভুল বোঝানোই হইবে। মূর্তিকে বিশ্লেষণ করিতে গেলে কেবল মাটিকেই পাওয়া যায়, শিল্পীর আনন্দকে পাওয়া যায় না। অতএব খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত আসিয়া এইখানেই আমার জীবনস্মৃতির পাঠকদের কাছ হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।[১৪]

কিন্তু কবির এই কৈফিয়তে 'জীবনস্মৃতি'র পাঠক কোনদিনই সন্তুষ্ট হবে না। খাসমহালের দরজার কাছে পর্যন্ত এসে হঠাৎ দরজা বন্ধ করে দিয়ে এবং কবিমানসের 'সেই আশ্চর্য পরম রহস্যটুকু' অনাবিষ্কৃত রেখেই বিদায় গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহৃদয়-সমাজের প্রতি সুবিচার করেন নি। 'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে 'জীবনস্মৃতি'তে ইঙ্গিত-মাত্রে বলা হয়েছে, 'আমার কবিতা এখন মানুষের দ্বারে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।…'কড়ি ও কোমল' মানুষের জীবননিকেতনের সেই সম্মুখের রাস্তাটায় দাঁড়াইয়া গান। সেই রহস্যসভার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আসন পাইবার জন্য দরবার।[১৫]…এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা এই কবিতাগুলির মূল কথা।[১৬] ..আমি আমার সেই ভৃত্যের আঁকা খড়ির গণ্ডির মধ্যে বসিয়া মনে মনে উদার পৃথিবীর উন্মুক্ত খেলাঘরটিকে যেমন করিয়া কামনা করিয়াছি, যৌবনের দিনেও আমার নিভৃত হৃদয় তেমনি বেদনার সঙ্গেই মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়াইয়াছে। সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী।'[১৭]

'কড়ি ও কোমল' সম্পর্কে কবির এই বিশ্লেষণ রসিকচিত্তে কৌতূহলই উদ্রিক্ত করে, তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। যৌবনের দিনে কবির নিভৃত হৃদয় মানুষের বিরাট হৃদয়লোকের দিকে হাত বাড়িয়েছে, কিন্তু 'সে যে দুর্লভ, সে যে দুর্গম দূরবর্তী!' কেন?—এ প্রশ্নের খানিকটা উত্তর কবি দিয়েছেন পরবর্তী কালে [১৩৪৬ বঙ্গাব্দে] 'রবীন্দ্র-রচনাবলী'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'কড়ি ও কোমলে'র ভূমিকারূপে লেখা 'কবির মন্তব্যে'। সেখানে কবি বলছেন :

> যৌবন হচ্ছে জীবনে সেই ঋতুপরিবর্তনের সময় যখন ফুল ও ফসলের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা নানা বর্ণে ও রূপে অকস্মাৎ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। কড়ি ও কোমল আমার সেই নবযৌবনের রচনা। আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন যেন প্রথম উপলব্ধি করেছিলুম। মনে পড়ে তখনকার দিনে নিজের মনের একটা উদ্বেল অবস্থা। তখন আমার বেশভূষায় আবরণ ছিল বিরল। গায়ে থাকত ধুতির সঙ্গে কেবল একটা পাতলা চাদর, তার খুঁটোয় বাঁধা ভোরবেলায় তোলা এক মুঠো বেল ফুল, পায়ে এক জোড়া চটি।…এই আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা কড়ি ও কোমলের

কবিতায় অবাধে প্রকাশ পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে, এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না। সেইজন্যেই কাব্যবিশারদ প্রভৃতি সাহিত্যবিচারকদের কাছ থেকে কটুভাষায় ভৎর্সনা সহ্য করেছিলুম।...

কড়ি ও কোমলে যৌবনের রসোচ্ছ্বাসের সঙ্গে আর একটি প্রবল প্রবর্তনা প্রথম আমার কাব্যকে অধিকার করেছে, সে জীবনের পথে মৃত্যুর আবির্ভাব। যাঁরা আমার কাব্য মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন, এই মৃত্যুর নিবিড় উপলব্ধি আমার কাব্যের এমন একটি বিশেষ ধারা, নানা বাণীতে যার প্রকাশ। কড়ি ও কোমলেই তার প্রথম উদ্ভব।[১৮]

কবির এই মন্তব্য থেকে কটি উক্তি পুনঃস্মরণের জন্যে উদ্ধার করা যেতে পারে। 'কড়ি ও কোমল' 'নবযৌবনের রচনা'; 'আত্মবিস্মৃত বেআইনী প্রমত্ততা' ওতে 'অবাধে প্রকাশ' পেয়েছিল; এই কাব্যে 'যৌবনের রসোচ্ছ্বাসে'র সঙ্গে মিলিত হয়েছে 'মৃত্যুর আবির্ভাব'। এই সঙ্গে একটুকুও স্মরণ রাখতে হবে যে, 'কড়ি ও কোমলে'র প্রকাশকাল কার্তিক ১২৯৩ বঙ্গাব্দ। অর্থাৎ কবির বয়স তখন পঞ্চবিংশতি বর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে। তার তিন বৎসর পূর্বে [১২৯০, ২৪ অগ্রহায়ণ] রবীন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথের বিবাহের ছ মাসের মধ্যেই ঠাকুর পরিবারে তিন-তিনবার মৃত্যুর আবির্ভাব ঘটে। তাঁর বিবাহের দিনটিতেই তাঁর জ্যেষ্ঠ-ভগ্নীপতি সারদাপ্রসাদের মৃত্যু হয়। 'সারদাপ্রসাদ যাবতীয় বৈষয়িক কর্মে' মহর্ষির 'দক্ষিণ হস্ত-স্বরূপ' ছিলেন। পুত্রোপম জামাতার এই অকাল-বিয়োগে মহর্ষিদেব প্রবাস থেকে তাড়াতাড়ি জোড়াসাঁকোয় ফিরে আসেন। মাত্র তিনদিন তিনি বাড়িতে ছিলেন, তারপর সেই যে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন আর কখনো সেখানে এসে বাস করেন নি। সারদাপ্রসাদের মৃত্যুর সাড়ে চার মাস পরে

লোকান্তরিত হলেন কাদম্বরী দেবী এবং তার দেড় মাস পরে রবীন্দ্রনাথের সেজদা, তাঁর শৈশবের অভিভাবক হেমেন্দ্রনাথ। কাদম্বরী দেবীর আকস্মিক মৃত্যুই রবীন্দ্রনাথের কাছে সবচেয়ে মর্মান্তিক হয়ে দেখা দিয়েছিল! 'রবীন্দ্র-জীবনী'তে বলা হয়েছে, 'রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বৌঠাকুরানীর প্রতি কী পরিমাণ অনুরক্ত ছিলেন তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকের নিকট অবিদিত নাই। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সাত বৎসর তখন কাদম্বরী দেবী বালিকা বধূরূপে [আট বৎসর বয়সে] এই গৃহে প্রবেশ করেন। তারপর মাতা সারদা দেবীর মৃত্যুর পর তিনিই মাতৃহীন শিশুদের মাতৃস্থান, বন্ধুস্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সাহিত্যজীবনের পূর্ণাঙ্গ বিকাশে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যেমন সহায়তা করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার পত্নী কাদম্বরী দেবী কনিষ্ঠ দেবরের সুকুমার চিত্তবৃত্তির সূক্ষ্ম অনুভাবগুলিকে স্নেহের দ্বারা, প্রেমের দ্বারা উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন তরুণ কবির নবীন সাহিত্যজীবনের নিত্য সহচর, শ্রোতা, সমালোচক, বন্ধু। ইঁহাকে ঘিরিয়াই প্রথম যৌবনের সাহিত্যসৃষ্টির অভিযান চলিয়াছিল। তাই এই মৃত্যুর আঘাত তাঁহাকে কিয়ৎকালের জন্য বিচলিত করিয়াছিল; এবং এই মৃত্যু-বিচ্ছেদ তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারই বেদনায় প্রকাশ পায় বিচিত্র রচনা; তাহাদের অন্যতম হইতেছে 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে গদ্য কবিতাগুচ্ছ।'[১১]

'কড়ি ও কোমলে'র পূর্ববর্তী কাব্য 'ছবি ও গান' প্রকাশিত হয় তিন বৎসর পূর্বে। বিবাহের তিন মাস পরে মুদ্রিত হলেও 'ছবি ও গানে'র কবিতাবলী রচিত হয় তার বৎসর খানেক পূর্বে। 'ছবি ও গান'ও কাদম্বরী দেবীকে উৎসর্গীকৃত। উৎসর্গে কবি বলেছেন, 'গত বৎসরকার বসন্তের ফুল লইয়া এ বৎসরকার বসন্তে মালা গাঁথিলাম। যাঁহার নয়ন-কিরণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি একটি একটি

করিয়া ফুটিয়া উঠিত তাঁহারই চরণে ইহাদিগকে উৎসর্গ করিলাম।'[২০] অর্থাৎ 'ছবি ও গানে'ই তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রাগ্‌বিবাহ যুগের শেষ ফসল সংকলিত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে' 'ছবি ও গানে'র পরবর্তী বৎসর তিনেকের বিচিত্র সুর ও বিচিত্র ভঙ্গির কবিতা সংগৃহীত। কিন্তু এর সনেটগুচ্ছ সম্ভবত খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লেখা। মনে রাখতে হবে, 'কড়ি ও কোমলে'র সনেট রচনাকালে কবির কিশোরী জীবনসঙ্গিনীর প্রতি নবানুরাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'শিশুকাল থেকে কবির জীবনে যিনি পূর্ণ নির্ভর ছিলেন' কবির প্রতিভা-বিকাশের সেই প্রেরণাদাত্রী দেবীর লোকান্তরগমনে চিরবিচ্ছেদ-জনিত কবিভক্তের শোকার্ত হৃদয়ের মর্মবেদনা। তাই 'যৌবনের রসোচ্ছ্বাস' এবং 'মৃত্যুর আবির্ভাব'—জীবনের এই সাদা কালো দুটি সুতোয় 'কড়ি ও কোমলে'র সনেট-বন্ধ গ্রথিত হয়েছে।

৭

অর্থাৎ 'কড়ি' ও 'কোমলে'র সনেটগুচ্ছ রচনাকালে তরুণ কবির হৃদয়ানুভূতি মিলন-বিচ্ছেদের যুগ্মবেণীতে বহমান। দুটি মাত্র উদাহরণের সাহায্যেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে :

ওই তনুখানি তব আমি ভালবাসি।
এ প্রাণ তোমার দেহে হয়েছে উদাসী।
শিশিরেতে টলমল ঢলঢল ফুল
টুটে পড়ে থরে থরে যৌবন বিকাশি।
চারিদিকে গুঞ্জরিছে জগৎ আকুল
সারা নিশি সারা দিন ভ্রমর পিপাসী।
ভালোবেসে বায়ু এসে দুলাইছে দুল,
মুখে পড়ে মোহ ভরে পূর্ণিমার হাসি।

পূর্ণ দেহখানি হতে উঠিছে সুবাস।
মরি মরি কোথা সেই নিভৃত নিলয়,
কোমল শয়নে যেথা ফেলিছে নিশ্বাস
তনু-ঢাকা মধুমাখা বিজন হৃদয়।
ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

বলাই বাহুল্য, এ কবিতার আলম্বন পঞ্চদশী কিশোরী-বধূ। তরুণ কবি-প্রেমিক এখানে প্রেয়সী-বধূর তনুলাবণ্যে দাম্পত্যলীলার স্বপ্নস্বর্গ রচনা করেছেন। স্তন [১, ২], চুম্বন, বিবসনা, বাহু, চরণ প্রভৃতি কবিতা সেই একই রতি-রসের বিচিত্র আলম্বন ও উদ্দীপন রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। দাম্পত্যমিলনকুঞ্জে সম্ভোগ-প্রেমের এমন অপূর্ব-সুন্দর চিত্র, দেহের পাত্রে মর্ত্যজীবনের পরম পিপাসার এমন মধুর আস্বাদন বৈষ্ণব পদাবলীর পরে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেহরতি পুষ্পসুকুমার সৌন্দর্যস্বপ্নে রূপান্তরিত হয়ে কী অসামান্য কাব্যলাবণ্য লাভ করতে পারে, এ কবিতাগুলি যেন তারই চূড়ান্ত নিদর্শন! চুম্বনকে 'গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি-ভালবাসা'র 'অধর-সঙ্গমে তীর্থযাত্রা'-রূপে কল্পনা করা, কিংবা 'অধরের এই মধুর মিলন'কে 'দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন'-রূপে ধ্যান করা নবীন কবি-প্রতিভার 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'রই পরিচায়ক। সে কবিদৃষ্টিতে 'বিবসনা'র নগ্নসৌন্দর্য 'বিকচ কমল' হয়ে ওঠে। কবি বলেন :

আসুক বিমল উষা মানব-ভবনে,
লাজহীনা পবিত্রতা—শুভ্র বিবসনে।

প্রিয়ার 'দুখানি অলস রাঙা কোমল চরণ' যখন ধরণীর কঠিন মাটি স্পর্শ করে, কবি তার মধ্যে 'শত লক্ষ কুসুমে'র স্পর্শানুভূতির বাসনায় হৃৎশতদল উন্মীলিত করে বলেন :

হোথা যে নিষ্ঠুর মাটি, শুষ্ক ধরাতল,—'
এসো গো হৃদয়ে এসো, ঝুরিছে হেথায়
লাজ-রক্ত লালসার রাঙা শতদল।

পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালাকে বুকে জড়িয়ে এই 'লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদলে'র উন্মীলন-নিমীলন-লীলা কবির অভিনব দাম্পত্যলীলারই কাব্যরূপ। প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে নারীদেহের রূপসীমায় জীবনের এই লীলারস আস্বাদনের আলম্বনস্বরূপিণী কবির কিশোরী-বধূরই এখানে বিজয়-বৈজয়ন্তী। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে'র প্রেমিক-কবির হৃদয়-বাসনা যুগল-শতদলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। সেখানে তাঁর প্রেয়সী-বধূর পাশেই রয়েছেন তাঁর শ্রেয়সী মানসলক্ষ্মী। 'পবিত্র প্রেম' সনেটটি তাঁরই উদ্দেশে নিবেদিত :

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া।
ম্লান করিয়ো না আর মলিন পরশে।
ওই দেখো তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া,
বাসনা-নিশ্বাস তব গরল বরষে।
জান না কি হৃদি মাঝে ফুটেছে যে ফুল,
ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর।
জান না কি সংসারের পাথার অকূল,
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার!
আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায় ;
সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা,
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়!
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস,
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ!

সহৃদয় কাব্যরসিককে নিশ্চয়ই এ কথা বিশ্লেষণ করে বলার প্রয়োজন নেই যে, এ কবিতা কিশোরী-বধূকে নিয়ে লেখা হতেই পারে না। কবিমানসে যাকে নিয়ে এ অনুভূতির জন্ম হয়েছে, তিনি হলেন তরুণ কবির মানসলক্ষ্মী—তাঁর 'নোতুন বৌঠান'—কাদম্বরী দেবী। দেবীরূপেই তিনি তরুণ কবির হৃদয়কমলাসনে স্থান পেয়েছেন; কিন্তু তাঁর মানবীমূর্তির প্রেরণা তখনও কবিমানসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রেম ও পূজা;—মানবী ও দেবীকে নিয়ে এই দ্বন্দ্ব তখনও তরুণ কবিচিত্তে নিত্য আন্দোলিত হচ্ছে। তাই দেবীর সান্নিধ্যে কবিপ্রেমিকের অস্বস্তির অন্ত নেই! ভক্তিসলিলে যার চিত্ত পরিশুদ্ধ হয় নি এমন দুরন্ত তরুণ 'কুচভর-নমিতাঙ্গী' লাবণ্যময়ী দেবীপ্রতিমার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে যে অস্বস্তি অনুভব করে, কবিচিত্তে সেই অস্বস্তিই এখানে পরিদৃশ্যমান। এ হল দেবীর পুণ্যস্পর্শে মানবসম্ভব নবযৌবনের হৃৎস্পন্দন!

তবু সমালোচকের দৃষ্টি এ কবিতার উৎস সম্পর্কে নিঃসংশয় নাও হতে পারে। কিন্তু কবিতাটির মধ্যেই আর একটি অভ্রান্ত প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে। আমরা পূর্বেই বলেছি, কাদম্বরী দেবীই ছিলেন প্রেরণারূপে কবির মানস-আকাশের ধ্রুবতারা। বিলাতপ্রবাসে পথভ্রান্ত কবিকিশোর একদিন তাঁরই উদ্দেশে বলেছিলেন, 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা; এ সমুদ্রে আর কভু হব নাকো পথহারা।' আলোচ্য কবিতাটির নবম ও একাদশ পংক্তির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখানেও সেই একই কল্পনা ক্রিয়াশীল :

আপনি উঠেছে ওই তব ধ্রুবতারা,

* * *

সাধ করে কে আজি রে হবে পথহারা।

ধ্রুবতারার এই ইঙ্গিত অনুসরণ করলেই এ কবিতার লক্ষ্য কে, সে বিষয়ে আর সংশয়ের লেশমাত্র অবকাশ থাকে না।

৮

কবির তরুণ যৌবনে তাঁর মানসলোকে দুই নারী আবির্ভূতা হয়েছিলেন। এই ছিল কবির নিয়তি। এই নিয়তির সঙ্গে প্রথম বোঝাপড়ার সংবাদ নিহিত রয়েছে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে। কিন্তু কবিমানসে এই 'দুই নারী' চেতনা সেখানেই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। কবির কল্পনালোকে তা আজীবন বিচিত্ররূপে বিলসিত হয়েছে। 'বলাকা'র ২৩ সংখ্যক কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে মনে পড়বে। সেখানে কবি বলেছেন :

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তারে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এই দুই নারীর একজন বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী, স্বর্গের অপ্সরী সে ; অন্যজন 'লক্ষ্মী সে কল্যাণী'—স্বর্গের ঈশ্বরী। একজন পুরুষের তপোভঙ্গ ক'রে 'উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরে' প্রাণমন

হরণ করে নিয়ে যায়। জীবনে তার দান 'বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে', 'রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে', 'নিদ্রাহীন যৌবনের গানে'। অন্যজন 'অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য-সুধায় মধুর'। সে পুরুষের চেতনাকে ফিরিয়ে আনে অশ্রুর শিশিরস্নাত বাসনার স্নিগ্ধতায়। জীবনে তার দান 'হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়'! 'জীবনমৃত্যুর পবিত্র সংগমতীর্থতীরে' সে চেতনাকে 'অনন্তের পূজার মন্দিরে' পৌঁছে দেয়। 'কড়ি ও কোমলে'র কবিমানসে এই দুই নারীরই প্রথম আবির্ভাব; একজনা বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী, অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী।

জীবনে এই 'দুই নারী'র সঙ্গে বোঝাপড়ার কথা গদ্যের ভাষায়ও প্রকাশ পেয়েছে 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়ের মুখে। অমিত রায়ের জীবনেও দুই নারী—লাবণ্য আর কেতকী। কেতকী মিত্রকে নিয়ে যখন সে ঘর বাঁধবার সংকল্প করেছে তখন যতিশংকরের সঙ্গে তার আলোচনাটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। বিয়ের সংবাদ সত্য কি না, যতিশংকরের এই প্রশ্নের উত্তরে অমিত বলছে :

"খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো বা ভুল বুঝবে।"

যতী হেসে বললে, "এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায়? বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা।"

"দেখো, যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌শ্‌নারিতে যে-কথার এক মানে বেঁধে দিই মানবজীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মত।"

যতী বললে, "অর্থাৎ তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়।"

"আমি বলছি, বিবাহের হাজারখানা মানে—মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।"

"তোমার বিশেষ মানেটাই বলো না।"

"সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা, তাহলেও আরেকটা কথায় গিয়ে পড়ব, ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরও বেশি জ্যান্ত।"

* * *

অমিত বললে, "অক্সিজেন একভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না। আবার অক্সিজেন আর-একভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার,—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না।"

* * *

"যে-ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ; যে ভালোবাসা বিশেষ ভাবে প্রতিদিনের সব কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।"

* * *

"একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ—আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্ট বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।"

"কিন্তু বিবাহে তোমার ওই সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না?"

"জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে কিন্তু ঘটে না। যে-মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো, যে তা না পায় দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সে-ও বড় কম সৌভাগ্য নয়!"

* * *

"কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই, কিন্তু সে যেন ঘড়ায় তোলা জল, প্রতিদিন তুলবে, প্রতিদিন ব্যবহার করবে। আর লাবণ্যের সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা, সে রইল দিঘি, সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।"[২১]

অমিতের এই 'দুই নারী'-তত্ত্ব,—হৃদয়ের এই আকাশ ও নীড়, এই দিঘির জল আর ঘড়ার জলের রূপক অমিতের কল্পনায় যেন সহজ-সত্যের সৌন্দর্যে নয়নাভিরাম! অমিত রোমান্সের রাজহংস। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তরুণ যৌবনে মর্ম-নিঙড়ানো রক্ত-মূল্য দিয়ে তবেই কবি এই সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন।

এই দুই-নারী-তত্ত্বের রূপক-ব্যাখ্যা করে এর স্বরূপ-নির্ণয় করা এখানে একান্ত প্রয়োজন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যশাস্ত্রকারগণের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। 'সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ'-রচয়িতা আচার্য ভোজরাজ নরনারীর প্রেম-সম্পর্ককে দুভাগে বিভক্ত করেছেন : একটি 'সম্প্রয়োগবিষয়া রতি', অন্যটি 'অসম্প্রয়োগবিষয়া রতি।' তাঁর মতে সম্প্রয়োগবিষয়া রতিরই রসনিষ্পত্তি আদি-রসে। আর যা 'অসম্প্রয়োগবিষয়া রতি সৈব প্রীতির্নিগদ্যতে।' অর্থাৎ যে প্রেমে দেহমিলন নিষিদ্ধ বা অসম্ভব সেই প্রেমকে তিনি বলেছেন প্রীতি। 'কাদম্বরী'-কাহিনীর পত্রলেখা-চন্দ্রাপীড়ের প্রণয়ই প্রীতির নিদর্শন হিসাবে উদাহৃত হয়েছে। য়ুরোপক্ষেত্রে প্লেটোও তাঁর 'ডায়লগে'র 'সিম্পোসিয়াম' খণ্ডে যে 'এরস'-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন সেখানেও এই দুই-নারী-তত্ত্বের বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে। গ্রীক পুরাণে 'এরস' [Eros] হচ্ছেন কামদেব,—The God of sensual passion. কিন্তু সেখানেও দুই এরসের সন্ধান পাওয়া যায়। দিব্য এরস আর দানবীয় এরস। দিব্য এরসের জননী আফ্রোদিতে য়ুরেনাসের অযোনিসম্ভবা দুহিতা, আর দানবীয় এরসের জননী [তাঁর নামও আফ্রোদিতে] জিউস ও দিওনের কন্যা। য়ুরেনাস-দুহিতা দিব্যাঙ্গনা; তাঁর সন্তানের মধ্যেও সেই ধর্ম সঞ্চারিত। প্লেটোর সিম্পোসিয়াম এই দিব্য-এরসেরই প্রশস্তি; এবং যাকে পরবর্তী যুগে প্লেটোনিক-প্রেম বলে আখ্যাত করা হয়েছে সেই প্রেম এই দিব্য এরসের

প্রেরণাতেই আস্বাদনীয় হয়ে ওঠে। ভোজরাজের ভাষায় যাকে বলা হয়েছে 'অসম্প্রয়োগবিষয়া রতি' তারই অনুশীলিত ও বিশুদ্ধিভূত রূপ হল প্লেটোনিক প্রেম। দানবীয় এরস সুন্দর-সঙ্গমে সন্তান-জননের প্রেরণা দেয়। আর দিব্য-এরস এনে দেয় চিরসুন্দরের সঙ্গ-সুধারসের সন্ধান। প্লেটো বলেছেন :

> The object which awakens this desirous love in all its forms is beauty, and beauty is eternal. In its crudest form, love for a beautiful person is really a passion to beget offspring by that person and so to attain, by the perpetuation of one's stock, the succedaneum for immortality which is all the body can achieve. A more spiritual form of the same craving for eternity is the aspiration to win immortal fame by combining with a kindred soul to give birth to sound institution and rules of life.
> But the goal still lies far ahead. When a man has followed the pilgrimage so far, he "suddenly descries" a Supreme Beauty which is the cause and source of all the beauties he has discerned so far. The true achievement of immortality is finally affected only by union with this.

প্লেটো-ব্যাখ্যাত এই সংগম-লিপ্সা ও আসঙ্গ-বাসনা, এই 'রতি' ও 'প্রীতি'ই দুই-নারী-তত্ত্বের মর্মমূলে বিরাজমান।[২২]

'কড়ি ও কোমলে'র কবিমানসে এই রতি-প্রীতির গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে এসে মিলিত হয়েছে করুণ রসের অশ্রু-নির্ঝর। সেদিন মহাকাল-নিক্ষিপ্ত সেই মৃত্যুশেল কবির মর্মস্থলে আমূল বিদ্ধ হয়েছিল। শেলবিদ্ধ বক্ষের রক্তক্ষরা বেদনা নিয়ে এসেছে কবি-জীবনে নিদ্রাহীন রাত। 'জীবনস্মৃতি'র "মৃত্যুশোক" অধ্যায়ে

কবি বলছেন; "মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই'-অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে।"[২৩] মরণের সেই বৃহৎ পটভূমিকার উপর জীবনের রূপ যেন সেদিন কবির প্রত্যক্ষগোচর হল। কবিচিত্তে সেই 'নাই-অন্ধকার' আর 'আছে-আলোকে'র দ্বন্দ্বের কথা কবি নিজেই 'মৃত্যু-শোকে'র শেষ অনুচ্ছেদে বলেছেন, "বাড়ির ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজের কোনও একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজপতাকা, তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপর আঁক-পাড়া কোনও একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার, সকালবেলায় যখন আমার সেই বাহিরে-পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে ; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদী গিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া উঠে, জীবন-লোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশিরসিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।"[২৪]

সেদিনকার তরুণ কবি জীবনের কাছে চেয়েছিলেন অমৃতের অধিকার, কিন্তু মৃত্যু তাঁর হাতে তুলে দিলে বিষের পাত্র। নীলকণ্ঠ কবি সেই বিষই শোধন করে অমৃতে রূপান্তরিত করলেন। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে কবিকণ্ঠের সেই বিষই কাব্যের অমৃত হয়ে উঠেছে। তাই দেখতে পাই, করুণরসের আসনে বসেছে আদিরসের করুণ-বিপ্রলম্ভ :

সে এল না এল তার মধুর মিলন,
বসন্তের গান হয়ে এল তার স্বর,
দৃষ্টি তার ফিরে এল—কোথা সে নয়ন ?
চুম্বন এসেছে তার—কোথা সে অধর ॥

এক প্রেমের মিলনানন্দে আর-এক প্রেমের বিচ্ছেদবেদনা ভুলে-থাকার এ এক অপূর্ব আস্বাদন ! কবিচিত্তে তাই একই সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদ-লীলা বিলসিত। কখনো 'সঙ্গে সৈব তথৈকা' ; কখনো 'ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে'। প্রিয়ার সন্নিকর্ষে থেকেও তাই 'বিশ্লেষ-ধিয়ার্তি'-জনিত প্রেমবৈচিত্ত্যের সুর ক্ষণে ক্ষণে বেজে উঠছে। আর সেজন্যেই দুর্দমনীয় মিলন-পিপাসার মর্মকোষেই বৈরাগ্য বাসা বেঁধে বসে আছে। তাই 'দেহের মিলন'-কামী কবি বলেন :

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।

*　　*　　*

তোমার নয়ন পানে ধাইছে নয়ন,
অধর মরিতে চায় তোমার অধরে।

কিন্তু পরক্ষণেই কবিচিত্ত হাহাকার করে উঠেছে :

এ মোহ ক-দিন থাকে, এ মায়া মিলায়,
কিছুতে পারে না আর বাঁধিয়া রাখিতে।
কোমল বাহুর ডোর ছিন্ন হয়ে যায়,
মদিরা উথলে নাকো মদির আঁখিতে।

এই বিষামৃতময় প্রেমই 'কড়ি ও কোমলে'র প্রেম। কবিমানসে একই সঙ্গে মিলন ও বিরহ, বাসনা ও বৈরাগ্য, অতৃপ্তি ও ঔদাস্য, আসক্তি ও মুমুক্ষা, জীবন ও মৃত্যু আর কখনো এমন গঙ্গা-যমুনা-

সঙ্গম রচনা করে নি। কবি-জীবনেও সুখদুঃখ ভালমন্দের এমন অগ্নিপরীক্ষার মুহূর্ত আর কখনো দেখা দেয় নি। কিন্তু কবির নবীন প্রতিভা অগ্নিস্নান করে নিয়তির সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। রবীন্দ্রপ্রতিভার নির্মল আত্মপ্রকাশ ঘটল 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে।

কবিমানসে বিলসিত সেদিনকার বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সঙ্গতির মধ্যেই আদর্শ সনেট বিরচিত হয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে, রবীন্দ্রজীবনে তখন নানাদিক থেকে বিভিন্নমুখী প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। 'জীবনস্মৃতি'তে কবি নিজেই বলেছেন, 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাগুলিতে আশুতোষ চৌধুরী 'ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল' দেখতে পেতেন। তা ছাড়া সনেটের কলাকৃতির দিক দিয়ে যে কবি ফরাসি সনেটকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন সে পরিচয় তাঁর বিচিত্র মিলবিন্যাসের মধ্যেই পরিদৃশ্যমান। কিন্তু 'কড়ি ও কোমলে' ফরাসি প্রভাবও গৌণ ; ইংলণ্ডের 'স্বদেশী সনেটে'র রীতি তখন বাংলা সাহিত্যে অনুকৃত হচ্ছে। তাই 'কড়ি ও কোমলে' শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতির ভঙ্গ-সনেটের প্রাদুর্ভাবও পরিলক্ষিত হয়। এমন কি বাংলা দেশের সে-যুগের অন্যতম সাহিত্যদেবতা বায়রনের 'ব্রাইড অব এবাইডসে'র অপ-প্রভাব থেকেও কবি মুক্ত থাকতে পারেন নি। তাঁর অজ্ঞাতসারেই বায়রনের দুটি পংক্তি—

Her graceful arms in meekness
Bending across her gently-budding breast

রবীন্দ্র-নায়িকার কৈশোর-লাবণ্য-রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে—

কোমল দুখানি বাহু শরমে লতায়ে
বিকশিত স্তন দুটি আগুলিয়া রয়।

[হৃদয়-আসন

কিন্তু এসব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ পেত্রার্কা-গোত্রের • আদর্শ সনেট-রচনায় তাঁর স্বাক্ষর উজ্জ্বল করে তুলেছেন। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেট-কলাকৃতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে "হৃদয়-আকাশ" সনেটটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে :

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।
দুখানি আঁখির পাতে কি রেখেছ ঢাকি
হাসিলে ফুটিয়া পড়ে উষার আভাস।
হৃদয় উড়িতে চায় হোথায় একাকী
আঁখি-তারকার দেশে করিবারে বাস।
ঐ গগনেতে চেয়ে উঠিয়াছে ডাকি
হোথায় হারাতে চায় এ গীত-উচ্ছ্বাস।
তোমার হৃদয়াকাশ অসীম বিজন—
বিমল নীলিমা তার শান্ত সুকুমার,
যদি নিয়ে যাই ওই শূন্য হয়ে পার
আমার দুখানি পাখা কনক-বরণ।
হৃদয় চাতক হয়ে চাবে অশ্রুধার,
হৃদয়-চকোর চাবে হাসির কিরণ।

দুই মিলের দুটি বিবৃত চতুষ্কে এই সনেটের অষ্টক-বন্ধ বিরচিত। ষট্‌ক-বন্ধেও দুটিমাত্র মিল! অষ্টক-ষট্‌কের মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধিতে ভাব 'আমি' থেকে 'তোমার' দিকে আবর্তিত হয়ে আদর্শ সনেটের কলা-রূপটিকে সার্থকতা দিয়েছে।

'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে কলাকৃতির বিচিত্র রূপায়ণ তাই বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সনেটগুচ্ছের আটান্নটি সনেটের মধ্যে ১৬টি শেক্‌স্‌পীয়রীয় রীতিতে বিরচিত। ছোটোফুল, হৃদয় আকাশ, তনু, কল্পনা-মধুপ, পূর্ণ মিলন, বন্দী, সন্ধ্যার বিদায়, এবং চিরদিন—৪, এই আটটি সনেট পেত্রার্কান। বাকি সনেটগুলি বিচিত্র-বিন্যাসে তিন থেকে সাত মিলের দ্বারা গঠিত। তিন মিলের সনেট দুটি;—অঞ্চলের বাতাস ও দেহের মিলন। চার মিলের রয়েছে তিনটি সনেট :—হাসি, সিন্ধুগর্ভ ও চিরদিন—৩; পাঁচ মিলের দশটি, ছ'মিলের বারোটি এবং সাত মিলের [শেকস্‌পীয়রীয় রীতি ছাড়া] চারটি। এই সনেটগুচ্ছে ত্রয়োদশ চরণে সম্পূর্ণ দুটি কবিতা আছে : রাত্রি এবং অস্তমান রবি। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে আশুতোষ চৌধুরী 'ফরাসি কোনো কোনো কবির ভাবের মিল' আবিষ্কার করেছিলেন। কলাকৃতির দিক দিয়েও ফরাসি কাব্যের স্তবকনির্মিতি এবং বিচিত্র মিলবিন্যাসের প্রভাব যে ওতে রয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফরাসি রঁদেল ও রঁদোর স্তবক প্রকার-ভেদে ত্রয়োদশ চরণে নির্মিত হয়। 'রাত্রি' এবং 'অস্তমান রবি'তে তাই অনুসৃত হয়েছে। ফরাসি শাঁ র‍্যয়্যাল-এর প্রতিটি স্তবক এগারো পংক্তির। তার মিলবিন্যাস হল কচকচততপপনপন। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মাভিমান' ও 'আত্ম-অপমান' এই দুটি সনেটের অষ্টক-বন্ধে শাঁ্যা র‍্যয়্যালের প্রথম আট চরণের মিলবিন্যাসকে গ্রহণ করেছেন। এই দুটি কবিতায়ও অষ্টক-বন্ধের মিলবিন্যাসের রীতি হল কচকচততপপ। ফরাসি বালাদ্‌ স্তবকের চরণসংখ্যা ও

মিলবিন্যাসের দিক দিয়ে দ্বিবিধ। একজাতীয় স্তবক আট চরণে, অন্যজাতীয় দশ চরণে। দশচরণের স্তবক-সমন্বিত বালাদের মিলবিন্যাস হল কচকচচতততপতপ ; অর্থাৎ দশ চরণে মোট চারটি মিল। কড়ি ও কোমলেরও একাধিক সনেট মিলের দিক দিয়ে দশ ও চার চরণে বিভক্ত ; যেমন 'মোহ'—মিলবিন্যাস কচকচ কচতপতপ। তেমনি 'গান-রচনা' : কচকচকতপতপত। 'গীতোচ্ছাস', 'বাহু' প্রভৃতি কবিতাও অনুরূপ। ফরাসি সনেটের একটি প্রকারভেদে অষ্টক-বন্ধের পরে ষট্‌কবন্ধ শুরু হয় একটি মিত্রাক্ষর যুগ্মকে। এই রীতি বাংলায় প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' গ্রন্থে অনুসৃত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে'র 'চরণ', 'হাসি' এবং 'চিরদিন'-এর তৃতীয় সনেটটির নবম ও দশম পংক্তিও মিত্রাক্ষর-যুগ্মক দিয়ে গড়া।

চরণের মাত্রা-সংখ্যার দিক দিয়েও 'কড়ি ও কোমলে'র পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিচিত্র প্রয়াস লক্ষণীয়। বেশির ভাগ সনেটেই চরণের মাত্রাসংখ্যা প্রচলিত পয়ারের ন্যায় চোদ্দ। কিন্তু ৮+৮, ৮+১০, এবং ১০+১০ মাত্রার চরণ নিয়েও রবীন্দ্রনাথ পরীক্ষা করেছেন। ৮+৮ মাত্রার চরণ দিয়ে একটি মাত্র সনেট আছে—'গানরচনা'। তার প্রথম চতুষ্ক হল :

> এ শুধু অলস মায়া, এ শুধু মেঘের খেলা,
> এ শুধু মনের সাধ বাতাসেতে বিসর্জন ;
> এ শুধু আপন মনে মালা গেঁথে ছিঁড়ে ফেলা,
> নিমিষের হাসিকান্না গান গেয়ে সমাপন।

মিলবিন্যাসের দিক দিয়ে এটি বিচিত্রবন্ধের সনেট ; ওতে আছে পাঁচটি মিল ; তাদের বিন্যাসরীতি হল ; কচকচকতপতপত পনপন। কিন্তু সনেট-চরণে ৮+৮ মাত্রা রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে একবারই

মাত্র ব্যবহার করেছেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছেন বাংলা ছন্দে অপূর্ণপদী পর্ব দিয়ে চরণ সমাপ্ত না হলে চরণ থেকে চরণান্তরে ছন্দঃস্পন্দ সাবলীল গতিভঙ্গি লাভ করে না। ১০+১০ মাত্রার চরণও 'কড়ি ও কোমলে'ই প্রথম ও শেষ বারের মত ব্যবহৃত হয়েছে। 'যৌবন স্বপ্ন', 'ক্ষণিক মিলন', 'সন্ধ্যার বিদায়'—এই তিনটি সনেটে চরণের এই দৈর্ঘ্য নিয়ে কবি পরীক্ষা করেছেন। কিন্তু বাংলা ছন্দে পর্বের স্বাভাবিক মাত্রাসীমা আট ; কাজেই ১০+১০ চরণের মধ্যভাগে, অর্থাৎ প্রথম দশ মাত্রার পরে, যে যতিপাত হয় ওটি আসলে পূর্ণ যতি। তাই ১০+১০ মাত্রার চরণ প্রকৃতপক্ষে দশাক্ষর দুটি চরণেরই যোগফল ; যেমন—

> আকাশের দুইদিক হতে : দুইখানি মেঘ এল ভেসে,
> দুইখানি দিশাহারা মেঘ :—কে জানে এসেছে কোথা হতে।
> সহসা থামিল থমকিয়া : আকাশের মাঝখানে এসে।
> দোঁহাপানে চাহিল দুজনে : চতুর্থীর চাঁদের আলোতে।

'ক্ষণিক মিলনে'র এই চতুষ্ক লিপিচিত্রে চার চরণেই সজ্জিত হয়েছে বটে, কিন্তু শ্রুতিমূলে ওতে আটটি চরণই পাওয়া যাবে। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ সনেটের চরণে এই মাত্রাসংখ্যা আর ব্যবহার করেন নি। কিন্তু ৮+১০ মাত্রার মহাপয়ারে দ্বিতীয় পর্বটি অতিপদী হওয়ায় ওতে ছন্দঃস্পন্দ অব্যাহতই থাকে ; তাই পরবর্তী যুগে সনেট-পংক্তির দৈর্ঘ্য হিসাবে অষ্টাদশাক্ষর চরণই অধিকতর ব্যবহার্য হয়েছে। প্রতি চরণে চারমাত্রা করে বেড়ে যাওয়ায় ওতে সনেটের শক্তি ও বহনক্ষমতাও বর্ধিত হয়েছে। 'কড়ি ও কোমলে'র 'রাত্রি' এবং 'চিরদিন' শীর্ষক সনেট-চতুষ্টয় অষ্টাদশাক্ষর। চরণের মাত্রাসংখ্যা এবং মিলবিন্যাসের বৈচিত্র্যসৃষ্টির দিক দিয়ে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছ উত্তরকালীন সম্ভাব্যতার এক আশ্চর্য

পথনির্দেশ। সনেটের কলাকৃতি নিয়ে অল্পসময়ের মধ্যে কবি যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন পরবর্তী কালে সনেটের রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টির দিক দিয়ে উত্তরসূরিবৃন্দ যেন সেই ইঙ্গিতই অনুসরণ করে চলেছেন। সার্থক সনেটরচনায় 'কড়ি ও কোমলে'র বৈচিত্র্যকে অতিক্রম করে যাওয়া কচিৎ সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু শুধু শিল্পায়নের দিক দিয়েই নয়, জীবনায়নের দিক দিয়েও 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছ রবীন্দ্রমানসের স্বরূপকে প্রথম সামগ্রিক ভাবে রসিকসমাজের কাছে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে। কবি নিজেও এই সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; তাই তিনি 'জীবনস্মৃতি'র উপান্ত অনুচ্ছেদে লিখছেন :

> বর্ষার দিনে কেবল ঘনঘটা এবং বর্ষণ। শরতের দিনে মেঘরৌদ্রের খেলা আছে কিন্তু তাহাই আকাশকে আবৃত করিয়া নাই, এদিকে খেতে খেতে ফসল ফলিয়া উঠিতেছে। তেমনি আমার কাব্যলোকে যখন বর্ষার দিন ছিল তখন কেবল ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ। তখন এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী। কিন্তু শরৎকালের কড়ি ও কোমলে কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নহে, সেখানে মাটিতে ফসল দেখা দিতেছে। এবার বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারের ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।[২৫]

অর্থাৎ, 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গানে'র 'ভাবাবেগের বাষ্প এবং বায়ু এবং বর্ষণ' আর 'এলোমেলো ছন্দ এবং অস্পষ্ট বাণী'র যুগ অতিক্রম করে 'কড়ি ও কোমলে'র যুগে আকাশ-মৃত্তিকার সংগমে রবীন্দ্রকাব্যলোকে 'খেতে খেতে ফসল ফলে উঠেছে।' এখন থেকে 'কেবলমাত্র আকাশে মেঘের রঙ্গ নিয়ে'ই আর কবির খেলা নয়, 'বাস্তব সংসারের সঙ্গে কারবারে' এখন 'কত ভাঙা গড়া, কত জয়পরাজয়, কত সংঘাত ও সম্মিলন!' আকাশের মেঘ-রৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রেখে 'মানবজীবনের বিচিত্র রসলীলাই'

কবিমানসে বিশেষ ভাবে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করবার এবং সকল দিক দিয়ে তাকে গ্রহণ করবার পরম পিপাসাই এখানে মুখ্য। 'মনের সঙ্গে মনের আপোস, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার বোঝাপড়া, কত বাঁকাচোরা বাধার ভিতর দিয়ে দেওয়া আর নেওয়া।' অর্থাৎ কল্পনারসের কিশোর কবি এখন মানবজীবন-রসের 'চিরপুরাতন বিরহমিলন-কথা'র কবি হয়ে উঠলেন। ঘরের ও পরের, অন্তরের ও বাইরের মেলামেলির মধ্য দিয়ে 'বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের আত্মনিবেদন' সত্য ও সার্থক হয়ে উঠল।

আমরা বলেছি, মানবজীবনের মহাসংগীত বহু বিপরীতকোটিক প্রাণচেতনার বিচিত্র দ্বন্দ্ব ও সঙ্গতির কড়ি ও কোমলে গাঁথা হয়ে রবীন্দ্র-মানসে চিরবিরাজমান ছিল। কবিমানসের সেই বিপরীত-কোটিকতাকে আমরা মুখ্যত পাঁচটি সূত্রে বিন্যস্ত করেছি: নিষ্ফলতা ও ঔদাস্য, প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনা, সীমা ও অসীম, খাঁচার পাখি ও বনের পাখি, জীবভাব ও বিশ্বভাব। 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের ভাবানুষঙ্গ বিশ্লেষণ করলেও এই সূত্র-পঞ্চকের সন্ধান পাওয়া যাবে। 'যৌবন-স্বপ্নে' কবি বলছেন :

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মত।

* * *

জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এসে, মরমের শরমে বিব্রত।

* * *

কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

এই 'যৌবন-স্বপ্ন', কবিমানসের এই বাসনা পরবর্তী সনেট 'ক্ষণিক

মিলনে'ই নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়েছে। ঔদাস্য-ভরে কবি তাই বলেন :

মেলে দোঁহে তবুও মেলে না তিলেক বিরহ রহে মাঝে,
চেনা বলে মিলিবারে চায়, অচেনা বলিয়া মরে লাজে।

'কল্পনা-মধুপ' কবিতায় কবিমানস 'লালসে অলস পাখা অলির মতন' কল্পমধুর পিপাসায় প্রতি প্রাতে মধুসন্ধানে বহির্গত হয়; আর দিনশেষে 'বিজনে সৌরভময়ী মধুময়ী মায়া'র কুহকে আত্মদান ক'রে ঘরে ফিরে এসে সেই স্বপ্ন-সৌরভেই তার সারাটা রজনী অতিবাহিত হয় :

রেণুমাখা পাখা লয়ে ঘরে ফিরে আসি,
আপন সৌরভে থাকি আপনি উদাসী।

কিন্তু এই স্বপ্নাভিসারও শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলতার বেদনায় কবিচিত্তকে বিহ্বল করে রাখে। 'কেন?' কবিতার ষট্‌ক-বন্ধে সেই বেদনার কথাই রয়েছে :

কেন কাছে ডাকে যদি মাঝে অন্তরাল,
কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
আজ হাতে তুলে নিয়ে ফেলে দিবে কাল,
এরি তরে এত তৃষ্ণা, এ কাহার মায়া?
মানব-হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা?

এই মর্মভেদী খেলায় কবিচিত্ত শুধু যে ক্রীড়নকমাত্রই হয়ে আছে এমন নয়, নিজের বাসনাকে নিয়েই জেগেছে তার অন্তহীন অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের একদিকে আছে 'সুখদুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ ভালবাসা'র আকর্ষণ, অন্যদিকে 'সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা'। 'কবিমানসে

এই প্রেমচেতনা ও সৌন্দর্যচেতনার দ্বন্দ্বটি ‘কড়ি ও কোমলে’র একাধিক সনেটে ভাষা পেয়েছে। ‘দেহের মিলন’-কামী তরুণ প্রেমিক জ্ঞানদাসের প্রতিধ্বনি তুলে তার প্রেমচেতনাকে ভাষা দিয়ে বলে :

> প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে,
> প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন।
> হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
> মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ ’পরে।

কবিতাটির অষ্টক-বন্ধ সমাপ্ত হয়েছে প্রিয়াকে ‘সর্বাঙ্গ দিয়ে দর্শন’ করার জন্যে তৃষিত প্রাণের কাতর ক্রন্দনে। কিন্তু ষট্‌ক-বন্ধের প্রারম্ভেই এই নিষ্ফল ক্রন্দনের ব্যর্থ পরিণাম ধরা পড়েছে :

> হৃদয় লুকানো আছে দেহের সায়রে,
> চিরদিন তীরে বসি করি গো ক্রন্দন।

‘হাসি’ কবিতার অষ্টক-বন্ধে তরুণীর ওষ্ঠাধরের উপমান হয়েছে নিসর্গ-সৌন্দর্য :

> দুটি অধরের রাঙা কিশলয়-পাতে
> হাসিটি রেখেছে ঢেকে কুঁড়ির মতন।

কিন্তু প্রবাস-বিপ্রলম্ভের অভিলাষটি ষট্‌ক-বন্ধে পৌঁছে দেহসৌন্দর্যের সম্ভোগ-স্বপ্নেই মগ্ন হয়েছে :

> সে হাসিটি কে আসিয়া করিবে চয়ন,
> লুব্ধ এই জগতের সবারে বঞ্চিয়া।
> তখন দুখানি হাসি মরিয়া বাঁচিয়া
> তুলিবে অমর করি একটি চুম্বন।

ওষ্ঠাধরের হাসির সৌন্দর্য এখানে ‘একটি চুম্বনে’ই সার্থকতা পেল!

'চরণ' কবিতায় কিন্তু প্রিয়ার 'তুখানি অলস রাঙা কোমল চরণে'র বন্দনায় শেষ পর্যন্ত কবিকণ্ঠে সৌন্দর্যেরই জয়ধ্বনি উঠেছে। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস সংরূঢ়রাগ শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি দিয়ে শ্রীরাধার গতি-ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন,

> যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চল চলই।
> তাঁহা তাঁহা থলকমল-দল খলই ॥

রবীন্দ্রনাথ শুধু স্থলকমলদলের স্খলনেই পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি ; তাঁর প্রেয়সীর চরণপাতে বসুন্ধরা শত বসন্তের স্মৃতি ফিরে পাচ্ছেন, শতলক্ষ কুসুমের স্পর্শস্বপ্ন জাগছে তাঁর মনে। প্রিয়ার তুখানি চরণকে সৌন্দর্যে সংগীতে সিঞ্চিত করে কবি বলছেন :

> শত বসন্তের যেন ফুটন্ত অশোক
> ঝরিয়া মিলিয়া গেছে তুটি রাঙা পায়।
> প্রভাতের প্রদোষের তুটি সূর্যলোক
> অস্ত গেছে যেন তুটি চরণছায়ায়।
> যৌবন-সংগীত পথে যেতেছে ছড়ায়ে,
> নূপুর কাঁদিয়া মরে চরণে জড়ায়ে।

এখানে সৌন্দর্য-চেতনাই মুখ্য। শেষপদে 'চরণে জড়ায়ে' নূপুরের ক্রন্দনে যে ব্যঞ্জনার সৃষ্টি হয়েছে তাও সৌন্দর্য-সম্ভোগ-তৃষারই বাণীরূপ। কিন্তু এতেও কবির অস্বস্তির অন্ত নেই। তাই তাঁর মনে হয়েছে, 'এ যেন রে অভিশপ্ত প্রেতের পিপাসা!' প্রেমকে আশ্রয় করেই হোক, আর সৌন্দর্যকে আশ্রয় করেই হোক্, এই পিপাসার হাত থেকেও কবিচিত্ত মুক্ত হতে চায়, কেননা :

> তুটি চরণেতে বেঁধে ফুলের শৃঙ্খল
> কেবল পথের পানে চেয়ে বসে থাকা।

মানব-জীবন যেন সকলি নিষ্ফল,
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা!

বাসনার খাঁচায় চরণে পুষ্প-শৃঙ্খল জড়িয়ে এই বন্দিদশা থেকে কবির প্রাণবিহঙ্গ তাই মুক্ত আকাশে বনের পাখির স্বাধীনতার জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। নিজেরই রচিত বাসনার পিঞ্জরে এই স্নেহ-মোহবন্ধনে জর্জরিত কবিচিত্ত হতাশার সঙ্গে বলে :

খাঁচার পাখির মত গান গেয়ে মরা,
এই কি মা আদি অন্ত মানব-জনমে?

মানবজন্মের মহত্তর মুক্তির স্বপ্ন তাই খাঁচার পাখির কাছে বনের পাখির আবেদন বহন করে আনে :

শ্যামল বিপুল কোলে আকাশ-অঞ্চলে
প্রকৃতি-জননী তারে রাখুন বাঁধিয়া।

খাঁচার পাখির জীবনে বনের পাখির এই গানই কবিচিত্তকে নীড়ের মোহময় বন্ধন থেকে আকাশের আলোকতীর্থে ডাক দিয়ে যায়। চিরন্তন যাত্রার পাথেয় পৃথিবীতে কুড়োতে গিয়ে তার জন্যেই নিজেকে 'বাসনার ফাঁদে' বেঁধে-রাখার তাৎপর্য কবিচিত্তে ধরা পড়ে :

শুষ্ক ধূলি তুলি শুধু সুধা-পিপাসায়,
প্রেম বলে পরিয়াছি মরণ-বন্ধন।

এই মরণ-বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্যে কবি তাঁর অন্তর-দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান—

বজ্রের আলোক দিয়ে ভাঙো অন্ধকার,
হৃদি যদি ভেঙে যায় সেও তবু ভালো,
যে গৃহে জানালা নাই সে ত কারাগার,
ভেঙে ফেল, আসিবেক স্বরগের আলো।

কবিমানসের এই আসক্তি-মুক্তি-লীলাই অবশেষে ব্যক্তি-পরিচ্ছেদের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে তাঁকে বিশ্বাত্মবোধে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। 'হৃদয় অরণ্য' পেরিয়ে বিশ্বভূমিতে 'নিষ্ক্রমণে'র এই কবিকাহিনী, সীমা থেকে অসীমে, জীবভাব থেকে বিশ্বভাবে আত্মবিকাশের এই নিগূঢ় রহস্যটি 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছে শুধু দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই নয়, সুন্দর ও সার্থক সঙ্গতির মধ্য দিয়েও কাব্যরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। 'অস্তাচলের পরপারে' কবিতাটিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের, সীমার সঙ্গে অসীমের মিলন-সাধনের স্বরূপটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নানাদিক দিয়েই এই সনেটটি তাৎপর্যমণ্ডিত, তাই সমগ্রভাবেই কবিতাটিকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। সন্ধ্যাসূর্যের উদ্দেশে কবি বলেছেন :

আমার এ গান তুমি যাও সাথে ক'রে
নূতন সাগরতীরে দিবসের পানে।
সায়াহ্নের কূল হতে যদি ঘুমঘোরে
এ গান উষার কোলে পশে কারো কানে,
সারারাত্রি নিশীথের সাগর বাহিয়া
স্বপনের পরপারে যদি ভেসে যায়;
প্রভাত-পাখিরা যবে উঠিবে গাহিয়া
আমার এ গান তারা যদি খুঁজে পায়।
গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত,
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নূতন
নবপ্রভাতের মাঝে শিশিরের মত?
সায়াহ্নের কুঁড়িগুলি আপনি টুটিয়া
প্রভাতে কি ফুল হয়ে উঠে না ফুটিয়া?

এই কবিতাটি পড়ে প্রথমেই 'পুষ্পাঞ্জলি'-'লিপিকা'র, 'সন্ধ্যা ও প্রভাতে'র কথা মনে পড়বে। সেখানে কবির প্রার্থনা ছিল,

'সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও।...এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক্।'[২৬] উদ্ধৃত সনেটটি এই একই ভাবানুষঙ্গের কাব্য-রূপ। গোধূলির তীরে বসে যে-অশ্রু ঝরেছে নবপ্রভাতের শিশির-বিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে তা সার্থক হয়ে উঠবে প্রশ্নচ্ছলে এই আশ্বাসই এখানেও অভিব্যঞ্জিত। ব্যক্তি-সীমায় যা বেদনার অশ্রুনির্ঝর বিশ্বের অসীমে তাই আনন্দের নিত্য-উৎস হয়ে দেখা দিয়েছে।

ব্যক্তি ও বিশ্ব, সীমা ও অসীমের এই মহত্তর মিলনের আশ্বাসের মধ্যেই 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছের উপসংহার রচিত হয়েছে। এই সনেটগুলির আদিতে রয়েছে 'যৌবন স্বপ্ন' আর 'ক্ষণিক মিলন'; এবং সর্বশেষে আছে 'চিরদিন' শীর্ষক চারটি সনেট। 'কড়ি ও কোমলে' 'স্তন' ও 'সত্য' শিরোনামায় দুটি যুগল-সনেট রয়েছে। কিন্তু চারটি সনেটে সমাপ্তব্য সনেট-পরম্পরার পরিচয় প্রথম পাওয়া গেল 'চিরদিন'-এর মধ্যে। এই সনেট-চতুষ্টয়ে কবিপ্রেমিকের আনন্দ-বেদনার সঙ্গে নিরবধি কালের পটভূমিতে অসীম বিশ্ব-জীবনের যোগসূত্রটি কবি আবিষ্কার করেছেন। তাই এই সনেট-চতুষ্টয়ের আরম্ভ কবির নবলব্ধ জীবনজিজ্ঞাসা দিয়ে :

> কোথা রাত্রি, কোথা দিন, কোথা ফুটে চন্দ্র সূর্য তারা,
> কে বা আসে কে বা যায়, কোথা বসে জীবনের মেলা,
> কে বা হাসে কে বা গায়, কোথা খেলে হৃদয়ের খেলা,
> কোথা পথ, কোথা গৃহ, কোথা পান্থ, কোথা পথহারা ?

এই অন্তহীন জিজ্ঞাসায় কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে, এত ভাঙাগড়া, এত আনাগোনা, এত গান এত তান, এত কান্না এত কলরব, সবই 'চিরদিনে'র 'গভীর অসীম গর্ভে নির্বাসিত নির্বাপিত' হবার জন্যেই কি পুঞ্জীভূত হচ্ছে ? এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ও জীবনের সবই

কি তা হলে কেবল মায়া কেবল মরীচিকামাত্র ? মর্ত্যজীবনের এই অনিত্য সুখদুঃখের তরঙ্গভঙ্গ কি অনন্তপার সিন্ধুসলিলে ক্ষণ-কালের অর্থহীন সফরীলীলা মাত্র ?—

বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন ?
সে কি এই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকার ?

এই জীবন-জিজ্ঞাসারই উত্তর পরিস্ফুট হয়েছে চতুর্থ সনেটে। এই উত্তরের মধ্যেই কবিপ্রেমিকের বাসনা বিশ্বসত্যের দার্শনিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হল। কবিদৃষ্টিতে সমুদ্ভাসিত এই বিশ্বজীবনসত্যেরই অবিস্মরণীয় বাণীরূপ হল অন্তিম সনেটটি। কবি বলছেন :

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ।
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
অসীমে উঠিছে প্রেম, শুধিবারে অসীমের ঋণ—
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন।
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীনহীন,
অসীমে জগতে এ কি পিরীতির আদান-প্রদান।
কাহারে পুজিছে ধরা শ্যামল যৌবন-উপহারে,
নিমেষে নিমেষে তাই ফিরে পায় নবীন যৌবন।
প্রেমে টেনে আনে প্রেম, সে প্রেমের পাথার কোথা রে ?
প্রাণ দিলে প্রাণ আসে,—কোথা সেই অনন্ত জীবন ?
ক্ষুদ্র আপনারে দিলে, কোথা পাই অসীম আপন,
সে কি ওই প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে !

বলাই বাহুল্য, এই অন্তিম জিজ্ঞাসার উত্তরটি যে 'প্রাণহীন প্রেমহীন অন্ধ অন্ধকারে'র গর্ভে নিহিত নয়, তা যে এই আলোঝলমল বিশ্ব-লোকের অসীম প্রেমের মধ্যেই পরিস্ফুট, সে প্রতীতি সহৃদয়-চিত্তে

নিঃসংশয় রূপেই সঞ্চারিত হয়েছে। এখানে এসেই কবি বুঝতে পেরেছেন, 'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা!' 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুচ্ছেই তাই কবি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণমানস জ্যোতির্ময় হয়ে উঠল। আমরা পূর্বে বলেছি, সনেটের অঞ্জলি সাজিয়েই কবি মধুসূদনের কাব্যসাধনার পূর্ণাহুতি হয়েছিল। সনেটের অঞ্জলি সাজিয়েই রবীন্দ্রনাথের স্বয়ংপ্রভ কবি-জীবনের যাত্রা হল শুরু।

১০

সনেটের আলোকে রবীন্দ্র-মানসরহস্যের উন্মীলন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-জীবনে পেত্রার্কার প্রভাব, কবির সেই অপূর্ব ত্রুবাদুর-প্রেমের স্বরূপ এবং সেই প্রেমের সাধনায় কবির সিদ্ধি ও তার পরিণতির কথা বলেই এ প্রসঙ্গের উপসংহার রচিত হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে, জীবনের সর্বপ্রেরণাস্বরূপিণী মানসসুন্দরীকে মানসমন্দিরে দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা ক'রে সেই আরাধ্যা দেবীকেই প্রিয়তমারূপে ধ্যান করা ত্রুবাদুর-প্রেমচর্যার মূলকথা। এও এক অভিনব প্রেমধর্ম! মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় মিস্টিকের প্রেম ছিল যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে বরবধূ সম্পর্ক রচনা করে বধূরূপে তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করা। খ্রীষ্টীয় মিস্টিক St. John of the Cross বলেছেন, "I will draw near to Thee in silence and will uncover Thy feet, that it may please Thee to unite me to Thyself, making my soul Thy bride! I will rejoice in nothing till I am in Thine arms."[২১] সুফী ধর্মের প্রেম-সাধনা বরবধূর সম্পর্ক নয়—প্রেমিক-প্রেমিকার সম্পর্ক। 'মাশুকে'র

সঙ্গে 'আসিকে'র 'আশনাই' সে প্রেমের মর্মকথা। বৈষ্ণব ভক্তের কান্তাপ্রেম বা মধুরা রতি হল ভগবানকে পরকীয়া প্রেমের নায়করূপে কল্পনা করে, সেই পর-পুরুষকেই জীবনের পরম-পুরুষ জেনে, তাঁর কাছে তাঁর আনন্দ-হ্লাদিনী প্রিয়তমারূপেই নিজেকে সমর্পণ করা। ত্রুবাদুর-প্রেম যেন বৈষ্ণব প্রেমের বিপরীত লীলা! বৈষ্ণব ভক্ত স্বয়ং রাধাভাবে ভাবিত, আর তাঁর উপাস্য ভগবান হলেন পুরুষপ্রবর শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ সেখানে আরাধক নারী [আরাধিকা-রাধিকা], আর আরাধ্য পুরুষ। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সাক্ষান্মন্মথমন্মথ। কিন্তু ত্রুবাদুর-প্রেমে আরাধ্যা দেবী হলেন প্রিয়তমা আর আরাধক তাঁর প্রেমিক। অর্থাৎ বৈষ্ণবের ক্ষেত্রে 'কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম', আর ত্রুবাদুরের ক্ষেত্রে যেন রাধা-প্রীতিই 'সর্বসাধ্যসার'।

আরাধ্য দেবতাকে প্রিয়তমা-রূপে ধ্যান করার প্রথম দীক্ষা অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন তাঁর কবিগুরু বিহারীলালের কাছে। 'সারদামঙ্গলে' সারদাই বিহারীলালের প্রিয়তমা। বিশ্বের প্রকাশ ও জ্যোতিস্বরূপিণী, করুণাময়ী বাগ্‌দেবীর প্রতি কবির বিশ্বভোলা প্রেমের দিব্যোন্মাদনাই 'সারদামঙ্গলে'র মর্মবাণী। ভারতসাহিত্যে বিহারীলালই প্রথম কবির পরমারাধ্যা দেবীকে প্রিয়তমারূপে সৃষ্টি করলেন। 'সারদামঙ্গলে'র সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন, "কখনো অভিমান কখনো বিরহ, কখনো আনন্দ কখনো বেদনা, কখনো ভর্ৎসনা কখনো স্তব। দেবী কবির প্রণয়িনীরূপে উদিত হইয়া বিচিত্র সুখদুঃখে শতধারে সংগীত উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিতেছেন। কবি কখনো তাঁহাকে পাইতেছেন, কখনো তাঁহাকে হারাইতেছেন।…কখনো তিনি অভিমানিনী, কখনো বিষাদিনী, কখনো আনন্দময়ী।…এইরূপ বিষাদ-বিরহ-সংশয়ের পর কবি, হিমালয়-শিখরে প্রণয়িনী দেবীর সহিত আনন্দমিলনের চিত্র আঁকিয়া গ্রন্থ

শেষ করিয়াছেন।...আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে প্রেমের সংগীত এরূপ সহস্রধার উৎসের মতো কোথাও উৎসারিত হয় নাই। এমন নির্মল সুন্দর ভাষা, এমন ভাবের আবেগ, কথার সহিত এমন সুরের মিশ্রণ আর কোথাও পাওয়া যায় না।"[২৮]

কাজেই দেবীকে প্রণয়িনী করে কাব্যসংসারে সেই প্রেম-প্রবাহকেই সহস্রধারে উৎসারিত করার রীতিকে বিহারীলালই বাংলা কাব্যে প্রথম প্রবর্তন করলেন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের মন্ত্রশিষ্য। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'অন্তর্যামী' কবিতায় তাঁর অন্তরতর 'জীবনদেবতা'র যে লীলারস আস্বাদন করেছেন তাও প্রেমসংগীতের ভাষাতেই উৎসারিত হয়েছে। মানসসুন্দরী, অন্তর্যামী, জীবনদেবতা, লীলাসঙ্গিনী—যে নামেই কবি তাঁকে ডাকুন না কেন, নানা নামে সেই একই নামকে তিনি বার বার ডেকেছেন। নানা প্রেমের মধ্যে সেই একই প্রেমকে তিনি আস্বাদন করেছেন। সেই দেবীই তাঁর প্রিয়তমা, সেই দেবীসূক্তই তাঁর জীবনের অনবদ্য প্রেমসংগীত।

'কড়ি ও কোমলে' কবির সেই দেবী-মানবী-সাধনা, হৃদয়ের সঙ্গে সেই অদ্ভুত সংগ্রামের পরিসমাপ্তি পরবর্তী কাব্য 'মানসী'র যুগেই ঘোষিত হয়েছে। 'মানসী'তেই কবির মানসলক্ষ্মী তাঁর হৃদয়-মন্দিরের কেলি-কুট্টিম থেকে রত্নবেদীতে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা হয়েছেন। 'মানসী'র "নিভৃত আশ্রম" সনেটে সেই দেবীপ্রতিষ্ঠারই বোধনমন্ত্র উচ্চারিত হল :

> সন্ধ্যায় একেলা বসি বিজন ভবনে,
> অনুপম জ্যোতির্ময়ী মাধুরী-মুরতি
> স্থাপন করিব যত্নে হৃদয়-আসনে।
> প্রেমের প্রদীপ লয়ে করিব আরতি।

রাখিয়া দুয়ার রুধি আপনার মনে,
তাহার আলোকে রব আপন ছায়ায়,
পাছে কেহ কুতূহলে কৌতুক-নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে এসে দেখে হেসে যায়।

ভ্রমর যেমন থাকে কমল-শয়নে,
সৌরভ-সদনে, কারো পথ নাহি চায়,
পদশব্দ নাহি গনে, কথা নাহি শোনে,
তেমনি হইব মগ্ন পবিত্র মায়ায়।
লোকালয় মাঝে থাকি রব তপোবনে,
একেলা থেকেও তবু রব সাথী সনে।

কিন্তু এই দেবীপ্রতিষ্ঠারও একটি ইতিহাস আছে। কামনামুক্ত নিষ্কলুষ প্রেমের পবিত্র সলিলে ভক্ত-প্রেমিকের আত্মশুদ্ধির ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ একটি রূপকের সাহায্যে সে ইতিহাস কাব্যচ্ছন্দে গ্রথিত করেছেন। মানসীর "সুরদাসের প্রার্থনা" কবিতায় সেই ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই সুরদাস। প্রথমে কবিতাটির নাম ছিল "আঁখির অপরাধ"। পেত্রার্কার একটি সনেটে দেখতে পাই কবির সঙ্গে তাঁর 'অপরাধী' চোখের বোঝাপড়া চলেছে। পেত্রার্কার sonette দু ভাগে বিভক্ত। 'Dalle Rime in Vita di Laura' অর্থাৎ লরার মৃত্যুর পূর্বে, আর 'Dalle Rime in Morte di Laura' অর্থাৎ 'লরার মৃত্যুর পরে'। প্রথম পর্যায়ের অষ্টপঞ্চাশৎ সনেটে [প্রথম পংক্তি Occhi, piangete ; accompagnate il core] কবি তাঁর 'অপরাধী চোখ'কে সম্বোধন করে বলছেন :

The lots, as seems to you, scarce equal fall
'Tween heart and eyes, for you, at first sight, were
Enamour'd of your common ill and shame.

[মেগ্রেগরের অনুবাদ

সুরদাসও তাঁর দেবীর কাছে তাঁর দু চোখ অন্ধ করে দেবার প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন :

জান কি আমি এ পাপ-আঁখি মেলি তোমারে দেখেছি চেয়ে,
গিয়েছিল মোর বিভোর বাসনা ওই মুখপানে ধেয়ে।
তুমি কি তখন পেরেছ জানিতে,
বিমল হৃদয়-আরশিখানিতে
চিহ্ন কিছু কি পড়েছিল এসে নিশ্বাসরেখাছায়া—
ধরার কুয়াশা ম্লান করে যথা আকাশ-উষার কায়া।
লজ্জা সহসা আসি অকারণে
বসনের মত রাঙা আবরণে
চাহিয়াছিল কি ঢাকিতে তোমায় লুব্ধ নয়ন হতে।
মোহচঞ্চল সে লালসা মম
কৃষ্ণবরণ ভ্রমরের সম
ফিরিতেছিল কি গুন্‌গুন্‌ কেঁদে তোমার দৃষ্টিপথে॥

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাতরশ্মিসম .
লও, বিঁধে দাও বাসনাসঘন এ কালো নয়ন মম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই, ফুটেছে মর্মতলে,
নির্বাণহীন অঙ্গারসম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
সেথা হতে তারে উপাড়িয়া লও জ্বালাময় দুটো চোখ,
তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক॥

* * *

তবে তাই হোক, হোয়ো না বিমুখ—দেবী, তাহে কি বা ক্ষতি,
হৃদয়-আকাশে থাক্‌ না জাগিয়া দেহহীন তব জ্যোতি।
বাসনামলিন আঁখিকলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়,
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়।
তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।

এ কবিতায় ভক্তপ্রেমিক সুরদাসের কণ্ঠে কবি বলছেন, 'তোমার লাগিয়া তিয়াষ যাহার সে আঁখি তোমারি হোক।' এবং 'পাপ-আঁখি'র দৃষ্টিতে 'মোহচঞ্চল সে লালসার' অবসান হলেই হৃদয়-অমরাবতীর অপ্সরী হবেন হৃদয়-নন্দনের ঈশ্বরী। তখন 'তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি।'

অন্তরে এই দেবীপ্রতিষ্ঠার বিচিত্র ইতিহাস অনুসরণ করলে দেখা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথের দেবীপ্রেম প্রথম পর্যায়ে পেত্রার্কার লরা-প্রেমেরই দোসর। উভয়ের ভাব ও ভাবনার ঐক্য নানা দিক দিয়েই পরিদৃশ্যমান। 'কড়ি ও কোমলে'র একটি সনেটে কবিমানসে তাঁর মানসলক্ষ্মীর সর্বগ্রাসী প্রেমের প্রাণান্তকর বন্ধনে কবির বন্দিদশার কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে:

দাও খুলে দাও সখী ওই বাহুপাশ,
চুম্বন-মদিরা আর করায়ো না পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস,
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বদ্ধ এ পরান।
কোথায় উষার আলো কোথায় আকাশ,
এ চির-পূর্ণিমা রাত্রি হ'ক অবসান।
আমারে ঢেকেছে তব মুক্ত কেশপাশ,
তোমার মাঝারে আমি নাহি দেখি ত্রাণ।
আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
পাতিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।
ঘুমঘোরে শূন্যপানে দেখি মুখ তুলি
শুধু অবিশ্রাম-হাসি একখানি চাঁদ,
স্বাধীন করিয়া দাও, বেঁধো না আমায়,
স্বাধীন হৃদয়খানি দিব তব পায়॥

[বন্দী,

পেত্রার্কার Pace non trovo, e non ho da far guerra—এই শীর্ষপংক্তিক সনেটেও একই দুর্বিষহ বন্দিদশার বেদনা :

I find no peace yet am not armed for war ;
I hope and yet I fear ; I freeze, I burn ;
On earth I lie, above the heavens I soar ;
I would embrace the world, yet all things spurn ;
And she doth hold me in a cell confined
Who neither makes me hers nor sets me free ,
Love will not kill, nor yet my cords unbind,
Nor wills I live, nor ends my misery.
I have no tongue, yet speak ; no eyes, yet see ,
I long to perish, yet I call for aid ;
I loathe myself, yet love with constancy,
Weeping I laugh and on affliction feed ;
And life and death I hold in equal hate,
Through you, my lady, comes this evil state.

[W. D. Foulke-এর অনুবাদ ।

উভয় কবির জীবনেই দেবীপ্রেমের সর্বগ্রাসী আকর্ষণই তাঁদের জীবনের নিয়তি। উভয়ের হৃদয়েই অসহ্য অনুরক্তি আক্ষেপানুরাগের রূপ নিয়েছে। পেত্রার্কার পঞ্চম কান্‌ৎসোনেতে পাই [শীর্ষ-পংক্তি : Nella Stagion che'l ciel rapido inchina]

Quando vede 'l pastor calare i raggi
Del gran pianeta al nido ov' egli alberga,
E 'nbrunir le contrade d'oriente,
Drizzasi in piede e co l'usata verga,
Lassando L'erba e le fontane e i faggi,
Move la schiera sua soavemente ;
Poi lontan da la gente
O casetta o spelunca
Di verdi fronde ingiunca :
Ivi senza pensier s'adagia e dorme.

Ahi, crudo Amor, ma tu allor piu m'informe
A seguir d'una fera che mi strugge
La voce e i passi e l'orme,
E lei non stringi, che s'appiatta e fugge.[১১]

রবীন্দ্রকাব্যেও সেই 'Crudo Amor' সেই নিষ্ঠুরা মোহিনীর উদ্দেশে একই আক্ষেপোক্তি :

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে, শেষে নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ?
জগতে সবারি আছে সংসারসীমার কাছে
কোনোখানে শেষ—
কেন আসে মর্মচ্ছেদি সকল সমাপ্তি ভেদি
তোমার আদেশ।
বিশ্বজোড়া অন্ধকার সকলেরি আপনার
একেলার স্থান—
কোথা হতে তারো মাঝে বিদ্যুতের মতো বাজে
তোমার আহ্বান ?

['অশেষ', 'কল্পনা'

পেত্রার্কার সঙ্গে অনুরূপ ভাবসাদৃশ্যই শুধু নয়, রবীন্দ্রকাব্যের অনেক রূপকল্পেরও [poetic imagery] আশ্চর্য মিল পরিলক্ষিত হবে। লরা পেত্রার্কার বাহুবন্ধনে কখনও ধরা দেন নি, আশ্লেষ-মিলনের প্রশ্নই ওঠে না ; এমন কি প্রিয়ার স্পর্শমাত্রও পেত্রার্কার ভাগ্যে ঘটে নি। দূর থেকেই তিনি পেত্রার্কার প্রেমকে উদ্বুদ্ধ ও জাগ্রত করেছেন। স্বভাবতই লরার চোখের মধ্যেই পেত্রার্কা তাঁর প্রেমের অনুরাগ-বিরাগ, আনন্দ-বিষাদের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ

করতেন। কবির অসংখ্য সনেটের আলম্বন লরার দুটি চোখ। সেই চোখের ভাষা, মর্ত্যলোকে সেই স্বর্গের দৃষ্টি ;—কত সনেট, কত কান্‌ৎসোনেতে পেত্রার্কা তার স্তবগান করেছেন! লরার দুটি চোখ 'Celestial lights! which lend a charm to life.' অন্যত্র বলেছেন :

> As, vex'd by the fierce wind,
> The weary sailor lifts at night his gaze
> To the twin lights which still our pole displays,
> So in the storms unkind
> Of love which I sustain, in those bright eyes
> My guiding light and only solace lies;

[মেগ্রেগরের অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথের 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা; এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা' এরই প্রতিধ্বনি বলে মনে হয় না কি? রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কাব্য-সঞ্চয়নগ্রন্থ 'সঞ্চয়িতা'য় 'সন্ধ্যাসংগীতে'র যে একটি মাত্র কবিতার অংশ কবি গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁর 'মানসলক্ষ্মী'র 'দৃষ্টি'ই উজ্জ্বল হয়ে আছে। লরার মৃত্যুর পরে পেত্রার্কা একটি কবিতায় লিখেছেন :

> Twin stars, lights of the lower sphere
> Which o'er my darkling path their radiance shed?

রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'বলাকা'র "ছবি" কবিতায় সার্থকতর ভঙ্গিতে বলেছেন :

> মোর চক্ষে এ নিখিলে
> দিকে দিকে তুমিই লিখিলে
> রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে আরেকটি রূপকল্প তাঁর ‘চিত্রা’ কাব্যগ্রন্থের “সিন্ধুপারে” কবিতার রূপক-রচনায় উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে অবগুণ্ঠনবতী একটি রমণী কৃষ্ণ অশ্বে আরোহণ করে কবিকে সিন্ধুপুলিনের স্বপ্নপ্রয়াণে পরিচালিত করেছেন। অবশেষে কবির কাছে যখন তিনি তাঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলেন তখন বিস্ময়বিহ্বল কবি দেখলেন এই অবগুণ্ঠনবতীই তাঁর জীবনদেবতা :

> সেই মধু মুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
> চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।

পেত্রার্কার লরাও সর্বদা গুণ্ঠনাবৃতা। সে-নিয়ে কবির দুঃখের শেষ ছিল না। ‘That envious veil is ne’er thrown by’ ; ‘And shall a veil thus rule my fate ?’

পেত্রার্কার আর একটি রূপকল্প রবীন্দ্রকাব্যে গৃহীত হয়েছে। সেটি হল ‘সোনার তরী’তে চ’ড়ে সমুদ্রযাত্রা। পেত্রার্কার চতুর্থ সেস্তিনার সঙ্গে [শীর্ষপংক্তি Chi e’ fermato di menar sua vita] রবীন্দ্রনাথের “নিরুদ্দেশ যাত্রা”র তুলনা করলেই নৌযাত্রার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পেত্রার্কার ১৫৬ সংখ্যক সনেটে শীতের মধ্যরাত্রিতে তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে নৌকাভ্রমণের যে অভিজ্ঞতা বর্ণিত আছে তাও রবীন্দ্রনাথকে কম প্রভাবিত করে নি।

কিন্তু এহ বাহ্য! পেত্রার্কার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যও অল্প নয়। প্রেমের পরিণতি-রচনার দিক থেকে সে পার্থক্য একেবারেই মৌলিক। আমরা প্রথম অধ্যায়ে পেত্রার্কা-লরা প্রসঙ্গে বলেছি যে, শেষ পর্যন্ত পেত্রার্কার প্রেম রক্ত-মাংসের মানুষেরই প্রেম। জীবনের অন্তিম লগ্নে ভগবৎ-সান্নিধ্যে এসে কবি তাঁর এই যৌবনাসক্তির জন্যে অনুশোচনাই প্রকাশ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভ-সনেটেই কবি বলছেন :

Ye, who may listen to each idle strain
Bearing these sighs, on which my heart was fed
In life's first morn, by youthful error led,

*   *   *

Of my past wanderings the sole fruit is shame,
And deep repentance, of the knowledge born
That all we value in this world is naught.

[ডেকারের অনুবাদ

রবীন্দ্রনাথ জীবনরসিক, তাঁর জীবনে এ অনুশোচনা, এ আত্মধিক্কার কল্পনাতীত। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেমও রবীন্দ্রনাথের প্রেম থেকে স্বতন্ত্র। দান্তের 'নবজীবনে'র মর্ত্যপ্রেয়সী পরিণত জীবনে তাঁর 'দিব্যসংগীতে'রই শিখারূপিণী স্বর্গদূতী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মানসলক্ষ্মী চিরদিন তাঁর মর্ত্য-জীবনোপলব্ধিরই চিরন্তন প্রেরণা!

পেত্রার্কার শেষজীবনে তাঁর অধ্যাত্মচেতনা, তাঁর ভগবদাসক্তিই তাঁর মানসলোকে মুখ্যস্থান অধিকার করেছিল। ১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি তারিখে তাঁর এক অনুরক্ত ভক্তকে লেখা এক পত্রে তিনি তাঁর কবিতাবলীকে 'নগণ্যবস্তু' এবং 'যৌবনের আমোদ' বলে উল্লেখ করেছেন। সেই ভক্ত যখন তাঁর কাব্যগ্রন্থ তাঁর কাছে চেয়েছেন তখন পেত্রার্কা বলছেন, 'একজন প্রবীণের পক্ষে এ জাতীয় বস্তু তোমার কাছে পাঠানো নিতান্তই লজ্জার বিষয়।' এই পত্রকে প্রবীণের পরিহাস-বিজল্পিত প্রাজ্ঞোক্তি বলেই গ্রহণ করা যেতে পারত, কিন্তু Epistola ad Posteros [Epistle to Posterity] গ্রন্থে পেত্রার্কা উত্তরপুরুষের উদ্দেশে বিরচিত পত্রে স্পষ্ট করেই বলেছেন :

Youth deceived me; manhood carried me away; but old age corrected me; and by experience taught me

thoroughly that truth which I had long before studied, namely, that youth and pleasure are vanities.

পেত্রার্কার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মুখ্য পার্থক্য এখানেই। রবীন্দ্রনাথ জীবনরসিক, তাঁর জীবনে এ অনুশোচনা এ আত্মধিক্কার কল্পনাতীত। বেয়াত্রিচের প্রতি দান্তের প্রেমও রবীন্দ্রনাথের প্রেম থেকে স্বতন্ত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৈশোর লগ্নে ‘দান্তে ও বেয়াত্রিচে’র প্রেমের প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ দান্তের ‘Vita Nuova’ বা ‘নবজীবন’ অভিনিবেশ সহকারেই পাঠ করেছিলেন বলে অনুমান করা যেতে পারে। আর তাঁর মত সুকুমার-মানসিকবৃত্তিসম্পন্ন কবির পক্ষে সেই কোমল প্রেমকাব্যের ভাব-সৌন্দর্য আহরণ করা নিতান্তই স্বাভাবিক ছিল। দান্তের ‘নবজীবন’ সম্পর্কে চার্লস এলিয়ট নর্টন বলেছেন,

…so long as there are lovers in the world and so long as lovers are poets, this first and tenderest love-story of modern literature will be read with appreciation and responsive sympathy.[৩০]

রবীন্দ্রনাথের নবীন যৌবনে দান্তের ‘নবজীবন’-এর প্রেম তরুণ কবির চিত্তরসায়ন হয়েছিল। কিন্তু দান্তের নবজীবনের মর্ত্যপ্রেয়সী পরিণত জীবনে তাঁর ‘দিব্যসংগীতে’র শিখারূপিণী স্বর্গদূতীতে পর্যবসিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের বেয়াত্রিচে তাঁর জীবনের অপরাহ্ন বেলাতেও এই মর্ত্যলোকের কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনা-সংগমে এই ‘মধুময় পৃথিবীর ধূলি’তেই তাঁর মানস-সঙ্গিনী ছিলেন। ‘সোনার তরী’-‘চিত্রা’র যুগে “অন্তর্যামী” কবিতায় কবি তাঁর এই নিত্যনূতন-লীলাকৌতুকময়ীর সঙ্গে জীবনের লীলারস-আস্বাদনের অমর সংগীত রচনা করেছেন। কবিজীবনে তাঁর জীবনদেবতার যে ‘পরম রহস্য’টুকু বলতে গিয়ে দ্বিধাভরে কবি ‘জীবনস্মৃতি’র লেখা বন্ধ

করে দিয়েছিলেন, সেই রহস্যকথাই আছে "অন্তর্যামী" কবিতায়। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে কবি তাঁর আত্মজীবনী বলতে গিয়ে তাঁর জীবনে এই অন্তর্যামীর লীলার কথাই বলেছেন। জীবনের অপরাহ্ণ-লগ্নে 'পূরবী' কাব্যগ্রন্থে তাঁরই 'আহ্বানে'র প্রতীক্ষা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে কবিচিত্তে :

দীপ চাহে তব শিখা, মৌনী বীণা ধেয়ায় তোমার
অঙ্গুলি-পরশ ;
তারায় তারায় খোঁজে তৃষ্ণায়-আতুর অন্ধকার
সঙ্গসুধারস ॥

'পূরবী'র "লীলাসঙ্গিনী" কবিতায় মৃত্যুর অন্ধকারেও তাঁরই আনন্দস্পর্শের প্রত্যাশা—'তিমিরে তোমার পরশ-লহরী দোলে, হে রসতরঙ্গিণী'। এই ভাবে কবির মানসলক্ষ্মী তাঁর মর্ত্যজীবনের অনিঃশেষ লীলার চিরবহমানা রসতরঙ্গিণী। তিনিই কবিজীবনের গভীরতম উপলব্ধির উৎস। সেইজন্যে মানসলক্ষ্মী সম্পর্কে কবিচেতনার বিবর্তন ও পরিণতির সংকেতেই কবিমানসের মর্মকোষের সত্যপরিচয় উদ্ঘাটিত হবে।

কবি পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তাঁর গীতিকাব্যের অন্তিম বিশ্লেষণে বলছেন :

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালবাসার অমৃত।

রবীন্দ্রনাথ সূর্যমণ্ডলের অগ্নিবিহঙ্গ। আলোকের ঝরনাধারায় অগ্নিস্নানই তাঁর স্বভাবধর্ম। কিন্তু এই অগ্নিবিহঙ্গ সৃষ্টির প্রথম রহস্য থেকে সৃষ্টির শেষরহস্যে, আলোকের প্রকাশ থেকে মানব-হৃদয়ের 'মহানভ-অঙ্গনে' ভালবাসার অমৃতলোকেই তার মুক্তপাখা

বিস্তার করে চলেছে। সেই জন্যেই দেখা যাচ্ছে, কবিজীবনের অন্তিম পর্যায়ে, একেবারে গোধূলি লগ্নে অমরাবতীর বাতায়নবর্তিনী জ্যোতির্ময়ী দেবীকে মর্ত্যমানবীরূপেই তিনি শেষবারের মত ধ্যান করেছেন। এবার 'সোনার তরী'তে চড়ে 'নিরুদ্দেশযাত্রা' নয়, গৃহ-নৌকা 'পদ্মা'য় চড়ে গঙ্গাবক্ষে পঁচাত্তর বৎসর বয়সে কবিজীবনে আবার ফিরে এসেছে চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগান-বাড়ির স্মৃতি। কবির মানসপটে ফিরে এসেছে 'গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ-বিকশিত পদ্মফুলে'র মত এক-একটি সুন্দর দিন। সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠেছে তাঁর মানসলক্ষ্মীর মানবীমূর্তি,—স্মৃতির অতল থেকে কবি ফিরে পেয়েছেন তাঁর নতুন বৌঠান কাদম্বরী দেবীকে। মনে পড়েছে বাল্যের সেই প্রাকৃত জীবনের লীলা। 'আকাশ প্রদীপে'র "শ্যামা" ও "কাঁচা আম" প্রভৃতি কবিতায় সেই লীলারস প্রাকৃত রূপেই আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। কবিমানসের এই অভিজ্ঞান দিয়েই নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, চিৎসত্ত পুরুষের 'আকাশের নির্মলতম মুক্তি' নয়, মৃৎসত্ত পুরুষের 'মর্ত্যের মধুরতম আসক্তি'ই রবীন্দ্রজীবনে অধিকতর সত্য ও সার্থক।

॥ উল্লেখ-পঞ্জি ॥

১ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা পত্র। চিঠিপত্র, ৫ম খণ্ড, পৃ° ১৫০-১৫১।

২ তদেব। পৃ° ১৩৩।

৩ জীবনস্মৃতি ; সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫০, পৃ° ১৫০।

৪ আধুনিক সাহিত্য, বিহারীলাল ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ° ৪১৬।

৫ মানুষের ধর্ম, পৃ° ২১-২৫, ৪৯।

৬ মানুষের ধর্ম, পরিশিষ্ট ; মানব সত্য ; পৃ° ৯৯-১০০।

৭ পূরবী, আশা।

৮ বলাকা, শাজাহান।

৯ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৩০-১৩১।

১০ বিবিধ প্রসঙ্গ, আত্মসংসর্গ; রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ° ৩৬২।

১১ তদেব। পৃ ৩৯২।

১২ তদেব। পৃ° ৩৯৩।

১৩ রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃ° ১০৫।

১৪ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৭২।

১৫ তদেব, পৃ° ১৬৮।

১৬ তদেব, পৃ° ১৭০।

১৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ° ৵০।

১৯ রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ° ১৫১।

২০ রবীন্দ্র-রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, পৃ° ১০৩।

২১ তদেব, দশম খণ্ড, পৃ° ৩৬৮-৩৭০।

২২ রবীন্দ্রনাথ দুই-নারী-তত্ত্বকে আরেক ভাবে প্রকাশ করেছেন, গৃহিণী ও হ্লাদিনী—এই দুই পর্যায়ে নারীর প্রাণধর্মকে বিভক্ত করে। 'মেয়েরা যেখানে গৃহিণী সেখানে বিশেষ গৃহেই তাদের অধিকারের সীমা, যেখানে তারা হ্লাদিনী সেখানে তারা সমস্ত বিশ্বের।' তিনি আরো বলেছেন, 'সৃষ্টিকার্যে যে দ্বৈত আছে তার মধ্যে একদিকে গ্রহণ আরেক দিকে দান। সংগীত ব্যাপারে সুরসমাবেশ থাকে স্থির, তার মধ্যে চঞ্চল তাল প্রবেশ ক'রে তাকে সক্রিয় ক'রে তোলে, তাকে মূর্তি দেয়, চরিত্র দেয়, সজীব করে। তেমনি জৈবসৃষ্টিকার্যে পুরুষের শক্তি অপেক্ষাকৃত গৌণ ভাবে স্ত্রীর সৃষ্টিশক্তিকে সক্রিয় করে তোলে। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের সত্তা শুধু কেবল দেহকে নিয়ে তো নয়! তাদের মনঃশরীর আছে, এই মনঃশরীরের প্রকৃতিতে সাধারণত যে একটি প্রভেদ আছে, তার সত্তা নির্ণয় না করেও তাকে বুঝতে বাধে না। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরকে যে প্রার্থনা করে, তার মধ্যে মনঃশরীরের এই আহ্বানটি বড় কম নয়। এখানে তাদের মধ্যে যে মিলন হয় সে মিলনেও সৃষ্টি-শক্তিকে জাগরূক করে। সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

ধর্মতন্ত্র গঠন, অর্থ-অর্জন, তত্ত্বান্বেষণ, জ্ঞান ও কর্মের যোগসাধন, ভাবকে রসকে রূপদান প্রভৃতি নানা উদ্যোগ নিয়ে মানব-সভ্যতাকে সৃষ্টি করে তোলা মুখ্যভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেছে। এই সৃষ্টিকার্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে প্রভাব সে হচ্ছে পুরুষের চিত্তকে গৌণভাবে সক্রিয় ক'রে তোলা। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা স্ত্রীপুরুষের মনোমিলনের এই রহস্যকে স্বীকার করেছেন তাই মেয়েদের বলেছেন শক্তি, অর্থাৎ জৈবসৃষ্টিতে পুরুষের যে-স্থান, মানসসৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের।'—তীর্থংকর, দিলীপকুমার রায়, পৃ° ১২৫, ১২৭।

২৩ জীবনস্মৃতি, পৃ° ১৬৪।

২৪ তদেব, পৃ° ১৬৫-১৬৬।

২৫ তদেব, পৃ° ১৭২।

২৬ লিপিকা, পৃ° ১৭-১৮।

২৭ দ্রষ্টব্য : প্রেমধর্ম, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম. এ., বি. এল., বেদান্তরত্ন ; পৃ° ২৭৫।

২৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী, নবম খণ্ড, পৃ° ৪২৫-৪৩২।

২৯ মেরিভিলের অনুবাদ :

You shepherd, when the mighty star of day
He sees descending to its western bed,
And the wide Orient all with shade embrown'd,
Takes his old crook from the fountain head,
Green mead, and beechen bower, pursues his way,
Calling, with welcome voice, his flocks around ;
Then far from human sound,
Some desert cave he strows
With leaves and verdant boughs.
And lays him down, without a thought, to sleep.
Ah, Cruel Love !—then dost thou bid me keep
My idle chase, the airy steps pursuing
Of her I ever weep,
Who flies me still, my endless toil renewing.

৩০ দ্রষ্টব্য : An Anthology of world poetry, edited by Mark Van Doren, পৃ° ৪৬২।